কাহিনী

শেখ আবদুল হাকিম

(আগাথা ক্রিস্টী)

শেখ আবদুল হাকিম

(আগাথা ক্রিস্টী)

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কামিনী

আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে
একখণ্ড সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

শেখ আবদুল হাকিম

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

ভূমিকা

খ্রীস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে, নীলনদের পশ্চিম তীরের মিশরীয় শহর থিবে-র পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী।

প্রাচীন মিশরে মন্দির এবং পুরোহিতকে সম্পত্তি দান করা ছিলো সাধারণ একটা ধর্মীয় রীতি।

এই সময়ের মিশরীয় কৃষি-পঞ্জিকা অনুসারে ত্রিশ দিনে এক মাস, চার মাস মেয়াদী মউশুম এবং তিন মউশুমে এক বছর ধরা হতো। এই বছর শুরু হতো নীলনদে প্লাবনের সূচনা থেকে। পাঠক-পাঠিকার ভুল বোঝার অবকাশ দুর করার জন্যে পরিচ্ছেদের শিরোনামে ওই সময়ের কৃষি-পঞ্জিকা ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—জলপ্লাবন, জুলাইয়ের শেষ থেকে নভেম্বরের শেষ ; শীত, নভেম্বরের শেষ থেকে মার্চের শেষ ; এবং গ্রীষ্ম, শেষ মার্চ থেকে শেষ জুলাই। সে-সময় ভাই-বোনে বিয়ের চল্ ছিলো। স্ত্রীকেও অনেক সময় বোন বলে সম্বোধন করা হতো।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কামিনী

শেখ আবদুল হাকিম

এক

জল প্লাবনের দ্বিতীয় মাস—বিশ তারিখ

চোখে বিষাদ, ভরাযৌবন নীলনদের দিকে তাকিয়ে আছে কামিনী।

একটু দূরে ওর দু'ভাই কথা বলছে, অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে ও। ইয়ামো আর সোবেক, আরো খানিক মাটি ফেলে বাঁধের দু'-একটা জায়গা উঁচু করার দরকার আছে কিনা তাই নিয়ে তর্ক করছে। বরাবরের মতো জোরালো, অভয় দেয়ার সুরে কথা বলছে সোবেক। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার চরিত্রেই নেই। যে-কোনো সমস্যাকে সহজ ভাবে, সাহসের সাথে নিতে পারে সে, কোনো কিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নয়। আর ইয়ামো ঠিক যেন তার উল্টোটা। ওর কণ্ঠস্বর নিচু, উদ্বিগ্ন, খেই হারানো। দুশ্চিন্তা তার মজ্জাগত, সব কিছুতেই তার সন্দেহ। সবাই যখন হাসি খুশি, দেখা যাবে ইয়ামো ঠিকই কোনো না কোনো ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগে কাতর হয়ে আছে। সে-ই পরিবারের বড় ছেলে, দক্ষিণের জমিদারীতে বাবা অনুপস্থিত থাকায় ক্ষেত-খামার আর বিষয়-আশয় দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব এখন বলতে গেলে তার ওপরই। সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করা তার স্বভাব, একটা কাজে হাত দিতে গিয়ে একবার এগোয় তো তিন বার পিছোয়,

কোথায় না জানি অপব্যয় হয়ে যায় এই ভয়ে তটস্থ থাকে সারাক্ষণ। শক্ত-সমর্থ, মোটাসোটা লোক, নড়তেচড়তে প্রচুর সময় নেয়—সোবেকের প্রাণচাঞ্চল্য বা আমুদে ভাব তার মধ্যে একেবারেই নেই।

সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে কামিনী, একইভাবে ওর এই দু'ভাই তর্ক করে আসছে। হঠাৎ করেই ব্যাপারটা তার মনে নিরাপত্তার একটা ভাব এনে দিলো। ভাগ্য আবার তাকে তার বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে। এখানের সব কিছুই পুরানো আর পরিচিত। সুখ যদি নাও থাকে, আছে স্বস্তি আর নিশ্চয়তা। পোড়া-কপালী একজন বিধবা এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে!

উচ্ছল, চকচকে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কামিনীর খালি বুকটা হু হু করে উঠলো। তার প্রেম, তার প্রাণপ্রিয় কাসিন মারা গেছে। স্বামীর সুদর্শন চেহারা, চওড়া কাঁধ ভেসে উঠলো চোখের সামনে, কানে বাজলো তার ভরাট গলার প্রাণখোলা হাসি। স্বর্গে দেবতা অসিরিস-এর কাছে চলে গেছে কাসিন, তার চোখের মাণিক কামিনীকে একা ফেলে। আট বছর একসাথে ঘর-সংসার করেছে তারা, ঘর করতে যাবার সময় বাচ্চা একটা মেয়ের চেয়ে একটু বড় ছিলো সে। এখন তার শরীরে ভরাযৌবন, বিধবা হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বাপের বাড়ি, সাথে কাসিনের সন্তান তানি।

বাপের বাড়ির পুরানো পরিবেশ এতো ভালো লাগছে, মনে হলো আপনজনদের ছেড়ে কখনো সে যেন কোথাও যায়নি। একটু পর-পরই অবশ্য মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, সে তো কোনো অপরাধ করেনি, তবু কেন তার জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হলো কাসিনকে! কিন্তু সে জানে, প্রকৃতির খেয়ালের বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করার নেই। এসব নিয়ে বেশি চিন্তা করলে নিজেকেই বরং

অকারণে শাস্তি দেয়া হবে। তারচেয়ে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করাই ভালো। ভুলে যেতে হবে হাসি-আনন্দে ভরা সেই আটটা বছর, ভুলে যেতে হবে কলজে ছেঁড়া শোক আর ব্যাথা।

নতুন করে বাঁচতে চায় কামিনী। ফিরে যেতে চায় বিয়ের আগের সেই পুরানো দিনগুলোয়। সওদাগর আর পুরোহিত বাবার একমাত্র আদুরে মেয়ে হিসেবে কাটিয়ে দিতে চায় জীবনের বাকি সময়টা—যার কোনো দুঃখ থাকবে না।

কিন্তু স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর, বিশেষ করে তা যদি মধুর হয়। আগে যেমন দেখতে পেতো, তেমনি নীলনদে কাসিনকে দেখতে পেলো কামিনী, পাল তোলা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে, রোদ লেগে চকচক করছে তার ঘামে ভেজা মুখ আর ফুলে ওঠা পেশী। কোলে তানিকে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছে কামিনী। স্বামীর হাসি আর হাত নাড়ার উত্তরে সে-ও হাসছে, হাত নাড়ছে।

চোখ বুজে দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো কামিনী। তারপর হঠাৎ করেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে এগোলো বাড়ির দিকে। এক পাল গাধাকে পাশ কাটিয়ে এলো সে, পিঠে ভার চাপিয়ে দিয়ে ওগুলোকে নদীর দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাহাড় সমান উঁচু কাটা শস্য নিয়ে লোকজন হিমশিম খাচ্ছে, তাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে বার-বাড়ি হয়ে ফটক পেরোলো, ঢুকে পড়লো উঠনে। এই উঠন কামিনীর খুব প্রিয়। মাঝখানে হাতে তৈরি একটা লেক, করবী আর জুঁই গাছ দিয়ে ঘেরা, চারদিকের পাড়ে ছায়া ফেলেছে সার সার ডুমুর গাছ। ছায়ায় বসে তানি আর বাড়ির অন্যান্য ছেলেপুলেরা খেলাধুলো করছে, তাদের তীক্ষ্ণ গলার হৈ-চৈ পরিষ্কার কানে বাজলো। কামিনী দেখলো, তার মেয়ে

কাঠের একটা সিংহ নিয়ে খেলছে, সুতো টানলে সেটা মুখ খোলে, আবার বন্ধ করে। নিজের অজান্তেই ফিক করে হেসে ফেললো সে। ছেলেবেলায় সে নিজেও এই খেলনা নিয়ে খেলেছে। স্বস্তি আর নিরাপদ বোধটা আবার ফিরে এলো মনে। 'আমি বাড়ি এসেছি···।' কিছুই বদলায়নি, সব সেই আগের মতোই আছে, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সে এখন আর ছেলেমানুষ নয়, তার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে তানি, আর সে নিজে এখন চারদেয়ালে বন্দিনী আর সব মায়েদের মতোই একজন।

বারান্দায় উঠে এলো কামিনী। খিলান আর থামগুলো উজ্জ্বল রঙে রাঙানো। বিশাল দরবার ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকালো একবার। পপি ফুল আঁকা মোটা পশমী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে, ঢাকা পড়ে আছে দেয়াল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মেয়ে মহলে চলে এলো সে।

চড়া গলা শুনে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো কামিনী। বাপের বাড়ির এই অতি পরিচিত হট্টগোল ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে দিলো মনে। হিমানী আর কেতী, ওদের যা কাজ, বরাবরের মতো তর্ক করছে। হিমানীর এই বাঁজখাই, কর্কশ পুরুষালি গলা ভোলবার নয়। বড় ভাই ইয়ামোর স্ত্রী হিমানী। তার এই বড় ভাবীটি তালগাছের মতো লম্বা, কিন্তু হাড্ডিসার নয়। যেমন গলার আওয়াজ, তেমনি চেহারাতেও একটা পুরুষালি ভাব আছে। প্রচলিত অর্থে তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু হিমানীর কাঠামো এবং গঠনের বিস্তার এমনিই যে তাকে যেমন কঠিন দেখায় তেমনি আকর্ষণীয়ও লাগে। তার গলা সবার চেয়ে সবসময় উঁচু। এমন অঢেল প্রাণপ্রাচুর্য আর কারো মধ্যে দেখেনি কামিনী, সারাক্ষণ কিছু না কিছু একটা করছেই সে।

নিত্য নতুন নিয়ম আর আইন তৈরিতে তার জুড়ি মেলা ভার, চাকর-বাকররা তাকে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে। সব কিছুতে দোষ আর গলদ খুঁজে বের করার অদ্ভুত একটা প্রবণতা রয়েছে তার মধ্যে। শুধু মেজাজ, গায়ের জোর, আর জেদ খাটিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে সে। তার কথাকে ভয় পায় না এমন কেউ এই পরিবারে নেই। বড় ভাই ইয়ামো তার এই রণরঙ্গিনী স্ত্রীকে নিয়ে রীতিমতো গর্ব করে। যদিও, হিমানী ইয়ামোকে মাঝে মধ্যে এমন শাসায় এবং ভেড়ার মতো চরায় যে কামিনীরও রাগ ধরে যায়। হাজার হোক পুরুষমানুষ, এতোটা সহ্য করা কি মানায়!

দম নেয়ার জন্যেই শুধু মাঝে মধ্যে দু'এক মুহূর্তের জন্যে থামছে হিমানী, তখনই শোনা যাচ্ছে কেতীর শান্ত, একগুঁয়ে গলা। তার এই মেজো ভাবীটি চওড়া আকৃতির, সাদামাটা চেহারার, সুদর্শন মেজদার স্ত্রী হিসেবে তাকে যেন ঠিক মানায় না। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ব্যাপারে তার কোনো রকম মাথাব্যথা নেই। দুই জা রোজই ঝগড়া করে। ঝগড়ার মধ্যে অল্প দু'একটা কথা বলে কেতী, কিন্তু যা বলে শান্ত, একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বারবার বলে। ভাবাবেগে তাকে কখনো কাতর হতে দেখা যায় না, কেউ তাকে কখনো রাগতে দেখেনি। কোনো ব্যাপারে তার নিজের দিকটা ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করতে রাজি নয় সে। ইয়ামোর মতো সোবেকও তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, নিজের অনেক গোপন ব্যাপারেও মন খুলে আলাপ করে স্ত্রীর সাথে। জানে, ছেলেমেয়েদের ভালোমন্দ নিয়ে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা এতোই ব্যস্ত থাকে কেতী, গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনলেও ভুলে যেতে দেরি করবে না।

'সরাসরি অপমান করা হয়েছে আমাকে, সেটাই চোখে আঙুল

দিয়ে দেখাতে চাইছি আমি,' হেঁড়ে গলায় বললো হিমানী। 'ইয়ামোর যদি ছুঁচোর সাহসও থাকে, সে এটা সহ্য করবে না। শ্বশুর নেই, এখন তাহলে কে এখানের কর্তা? ইয়ামো নয়? ইয়ামোর স্ত্রী হিসেবে ভালো মাদুর আর বালিশ বেছে নেয়ার প্রথম অধিকার আমারই। মুখ পোড়া কেলেভূত চাকরটার গায়ে আমি যদি গরম পানি না ঢেলে দিই রে। বজ্জতাটার উচিত ছিলো···।'

'ছি-ছি, লক্ষ্মী-মাণিক, পুতুলের চুল কেউ মুখে দেয় নাকি! এদিকে তাকাও, এই দেখো আমার হাতে মিষ্টি—কি মজা···।'

'কেতী, তোমাকেও বাপু একটা কথা না বলে পারছি না। কেমন ঘরের মেয়ে তুমি কে জানে। আমি না বড় জা? বাপ-মা তোমাকে আদব-কায়দা কিছুই কি শেখায়নি? এতো কথা বলছি, উত্তর তো দিচ্ছোই না, শুনছো না পর্যন্ত। তোমার ভাসুর আসুক···।'

চোখ তুলে একবার তাকালো কেতী। চেহারায় রাগ বা মন খারাপের ভাব, কিছুই নেই। শান্ত সুরে, যেন কিছুই হয়নি, বললো, 'নীল রঙের বালিশটা তো বরাবর আমারই ছিলো··দেখো, দেখো, আমার চখা কেমন হাঁটতে চেষ্টা করছে!'

'তুমি আসলে কাকের চেয়েও চালাক, কিন্তু এমন ভান করো যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানো না। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেবো। যদি ভেবে থাকো, আমার কথায় গুরুত্ব না দিলে পার পেয়ে যাবে, ভুল করছো। অধিকার আমি ছাড়বো না। এটা নিয়ে আমি স্কুলকালাম করবো।'

হালকা পায়ের আওয়াজ পেয়ে একটু চমকে উঠলো কামিনী। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো হেনেটকে। কানী বুড়ি ঠিক তার পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখেই বিরূপ হয়ে উঠলো

ওর মন। এক নম্বর কুটনী, পরিবারের প্রায় কেউই তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। সারা মুখে বসন্তের বিন্দু বিন্দু ফোঁটা, তার ওপর বয়সের ভাঁজগুলো মাকড়সার জাল বুনে রেখেছে। বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে হেনেট। একটা চোখ ঘষা কাঁচের মতো, ঘোলাটে, ঘুমোবার সময়ও চোখটা খোলা থাকে। সবচেয়ে অসুন্দর তার হাসি, হাসার সময় তার মুখের প্রতিটি রেখা আর ভাঁজ যেন নিজস্ব প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে ওঠে, কিলবিল করতে থাকে।

খসখসে গলা, ফিসফিস করে বললো, 'কামিনী লো, যদি ভেবে থাকিস বাপের বাড়ি ফিরে এসে শান্তি পাবি, ভুলে যা। হিমানীর এই গলা, এরচেয়ে নরক যন্ত্রণাও ভালো।'

কামিনী কথা বলছে না দেখে গলার স্বর আরো খাদে নামিয়ে সুর পাল্টালো হেনেট, 'তোর ভালোমানুষ বাপ আমাকে দু'বেলা অন্ন দেয়, সেইতো আমার সাত জন্মের ভাগ্য। এই বয়সেও তো খাটছি, তোদের সবার জন্যে জান দিচ্ছি, বিনিময়ে একটু ভালোবাসা চাই না, কেউ নাম করবে সে আশাও করি না। হ্যাঁ, থাকতো যদি তোর মা বেঁচে, আজ আমার এই কুকুরের দশা হতো না। বাঁদী বলে ধরার উপায় ছিলো? সবাই ভাবতো, আমরা দু'বোন।'

অস্বস্তি বোধ করছে কামিনী, কেটে পড়তে পারলে বাঁচে।

'নুন খেয়ে নুন হারাম করবে তেমন মেয়ে হেনেট নয়,' আবার শুরু হলো। 'মারা যাবার আগে তোর মা আমার দুটো হাত ধরে বলে গেল, আমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখিস, বোন। ওপর দিকে তাকিয়ে কেউ বলুক দেখি, দেখছি না? কার জন্যে কিনা করি আমি, অথচ কানী বুড়ি বলে গাল দেয় সবাই—দিক। ওপরঅলা সব দেখ-

ছেন।' এতো কথা বলেও কামিনীর তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না দেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হেনেট, কামিনীর বগলের নিচে দিয়ে স্যাঁৎ করে ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়লো সে। তার খসখসে গলা শোনা গেল আবার, 'বালিশের কথা যদি তুলিস, হিমানী, আমাকে তাহলে মুখ খুলতেই হয়। আমি এক বাপের মেয়ে, কারো হয়ে কিছু বলবো না। সোবেক বলেছিল···'

ওখান থেকে সরে এলো কামিনী। হেনেটের ওপর বিষিয়ে উঠেছে তার মন ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাধিয়ে দিয়ে মজা পায় বুড়ি। ফোড়ন কেটে পারিবারিক অশান্তির আগুন জ্বালানোয় তার জুড়ি নেই। এর কথা ওকে লাগাচ্ছে, ওর কথা তাকে, সারাদিন এই তার কাজ। কোথায় কি ঘটছে, সবই তার জানা। বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে হাঁটে, তার উপস্থিতি টেরও পায় না কেউ। একটাই চোখ, কিন্তু দৃষ্টি যেন ধারালো ক্ষুর, অন্তর পর্যন্ত দেখতে পায়। চেহারাতেই লেখা আছে, এই বুড়ির কাছে কিছুই বেশিক্ষণ গোপন করে রাখা সম্ভব নয়। গোপন কিছু একটা জানলে হয়, অমনি এর তার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস শুরু করবে। তার কথা শুনে কেউ রেগে ওঠে, কেউ ঈর্ষায় জ্বলে, কেউ অভিশাপ দেয় বা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ-সব দেখে দারুণ মজা পায় বুড়ি, আপন মনে হাসে।

বাড়িতে এমন কেউ নেই যে হেনেটকে বিদায় করে দেয়ার জন্যে ইমহে টেপকে ধরেনি, কিন্তু তাদের কারো কথা কানেই তোলেনি পুরোহিত। সেই সম্ভবত একমাত্র লোক যে হেনেটের ভক্ত। এবং বিনিময়ে হেনেট কর্তার প্রতি এতোই নিবেদিত প্রাণ, আর তার গুণগানে এমনই নির্লজ্জভাবে উচ্চকণ্ঠ যে অনেকের জন্যেই ব্যাপারটা

বিবমিষার উদ্রেক করে।

ওখান থেকে সরে এসে ছোটো একটা কামরার দিকে এগোলো কামিনী। খোলা দরজা দিয়ে কিশোরী দুই ক্রীতদাসীকে দেখা গেল, তাদের মাঝখানে বসে রয়েছে বুড়ি দাদী-মা, এশা। ওরা তাকে লিনেনের তৈরি জামা-কাপড় দেখাচ্ছে, দাঁতহীন মাড়ি বের করে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে দাদী-মা।

হ্যাঁ, সব সেই আগের মতোই আছে। মুখে দুষ্টামি ভরা হাসি, চুপিচাপি তাকিয়ে আছে কামিনী, ওরা কেউ তাকে দেখতে পায়নি। আকারে আগের চেয়েও যেন একটু ছোটো হয়েছে দাদী-মা, এইটুকুই যা পরিবর্তন। তাছাড়া গলার আওয়াজ, হাসি, হাত নাড়ার ভঙ্গি, কথা, এমন কি শব্দগুলো পর্যন্ত আট বছরে এতোটুকু বদলায়নি।

নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে এলো কামিনী। রান্নাঘরের খোলা দরজার সামনে এসে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলো। গনগনে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে ছাল ছাড়ানো হাঁস, ঝাঁঝালো মশলা মেশানো; তারই গন্ধ বাতাসে, জিভে পানি এসে যায়। ক্রীতদাসীরা কাজও করছে, হাসি-তামাশাতেও মেতে আছে। এক কোণে তরিতরকারী আর শাকসব্জির স্তূপ দেখা গেলো, কেটে-ছিলে রান্না করা হবে।

এগোতে গিয়েও পারলো না কামিনী। তার চোখ আধবোজা হয়ে এলো, যেন মাথা ধরেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, গোটা বাড়ির সমস্ত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এখান থেকে। হাতা-খুন্তি-চামচ নাড়ার আওয়াজ, বাঁদী-দাসীদের কলকল হাসি, দাদী-মার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, হিমানীর হেঁড়ে গলা, হেনেটের খোঁচা মারা বচন, একঘেয়ে সুরে কেতীর ফোড়ন—সব যেন চারদিক থেকে ছেঁকে

ধরলো ওকে। হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো, এই বাড়িতে নিরিবিলি শান্তি বলতে কিছু নেই, কোনো কালে ছিলোও না। বিচিত্র সব মেয়েমানুষ নিয়ে এটা একটা আশ্চর্য সংসার বটে। পরশ্রীকাতর মেয়েমানুষ! বদমেজাজী মেয়েমানুষ! অভিযোগ, ঝগড়া, গালমন্দ, প্রলাপ—চলছে তো চলছেই, কোনো থামাথামি নেই। অসহ্য!

ভেতর বাড়ি থেকে ছটফটিয়ে আবার বেরিয়ে এলো কামিনী। বাইরে গরম, কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই। মেজো ভাই সোবেককে মাঠ থেকে ফিরতে দেখলো ও। বড় ভাইকে দূরে দেখা গেল, সমাধিপ্রাঙ্গণের দিকে যাচ্ছে।

চুনাপাথরের পাহাড়, তার মাথায় সমাধিপ্রাঙ্গণ। সেদিকের পথ ধরলো কামিনী। মহান মেরিপাথার সমাধি ওটা, দেখা-শোনার দায়িত্ব কামিনীর পুরোহিত বাবা ইমহোটেপের ওপর। সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যা দান করা হয়েছে, গোটা জমিদারী আর জমিজমা তারই একটা অংশ মাত্র। বাবা কোথাও গেলে বড়দা ইয়ামোর ওপর সমাধি দেখাশোনার দায়িত্ব চাপে।

সরু, প্রায় খাড়া পাহাড়ী পথ। সাবধানে, ধীরে ধীরে উঠে এলো কামিনী। ইয়ামোর সাথে সমাধিপ্রাঙ্গণে মোহনকেও দেখা গেল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মোহন হলো বাবার প্রিয় সহকারী। বয়সের একটা পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তা খুব বেশি নয়। ইমহোটেপের বয়স যদি পঞ্চান্ন হয়, মোহনের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না। ইমহোটেপের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব মোহনকেই রাখতে হয়। বলি আর উপহার দেয়া হয় যে গুহায়, তার পাশেই ছোটো একটা পাথুরে গুহায় বসে রয়েছে ওরা দু'জন। মোহনের হাঁটুর ওপর বিছানো রয়েছে একটা প্যাপিরাস, ইয়ামো সেটার দিকে ঝুঁকে

পড়েছে।

ওকে দেখে দু'জনেই ওরা হাসলো। ওদের কাছাকাছি, ঠাণ্ডা ছায়ায় বসলো কামিনী। বড় ভাই ইয়ামোকে ভালো তো বাসেই, তার একজন ভক্তও সে। বড় আর মেজো ভাই যখন লায়েক হলো, কামিনী তখন ছোটো। বোধহয় সেজন্যেই ওরা কেউ স্ত্রী হিসেবে তাকে কামনা করেনি। বাবা ইমহোটেপ নিজে তার বোনকে নিয়ে ঘর করেছেন। বড় হবার পর কামিনী শুনেছে, বাবার নাকি ইচ্ছেও ছিলো, মেজো ভাই সোবেক কামিনীর সাথে ঘর করবে। কিন্তু ইয়ামো বা সোবেক, কেউই কামিনীর সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি। ওদের দু'জনের বিয়ে হয়ে যাবার পর পুরোহিত একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ছেলেরা অবিবাহিত থাকলে মেয়েকে নিয়ে চিন্তার কিছু থাকে না, কারণ আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘর-সংসার শুরু হবার আগে যদি কোনো অঘটন ঘটেই যায়, সেটা শুদ্ধ করে নেয়ার উপায় থাকে। কিন্তু কোনো বিবাহিত পুরুষ যদি তার আপন বোনের সাথে থাকতে চায়, সেটা হবে নিয়মবিরুদ্ধ। সাত-পাঁচ ভেবে ভালো একটা পাত্র দেখে কামিনীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল ইমহোটেপ।

সাবালিকা হবার পর সব কথা যখন জানতে পারলো কামিনী, মনে মনে খুশিই হয়েছিল। কাসিনকে নিয়ে পরম আনন্দে ছিলো সে। তার কোনো দুঃখ ছিলো না। কিন্তু খেয়ালের বশে মাঝে মধ্যে নিজের সাথে দুষ্টামি করতে ভালো লাগতো তার। সে ভাবতো, আমি বড় হবার পর যদি দেখতাম বড়দা আর মেজদা বিয়ে করেনি, স্বামী হিসেবে বড়দাকেই কামনা করতাম। বড়দা শান্ত, নিরুপদ্রব। তার ওপর নির্ভর করা যায়। কাউকে কোনোদিন রাগ করে না সে, চোখ রাঙায় না, সবাইকে ভালোবাসে। কামিনী বুঝতে পারে,

বড়দার মনটা খুব নরম।

কাসিন মারা গেছে, এই অবস্থায় আর কোনো মেয়ে হলে মনে মনে হিমানীর মৃত্যু কামনা করতো সে। কিন্তু ইয়ামোর ভক্ত হলেও, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো ইচ্ছে কামিনীর নেই। কাসিন বেঁচে থাকতে তাকে ভালোবেসেছিলো ও, কাসিন মারা গেলেও সে ভালোবাসা ম্লান হবার নয়। কামিনী আর কারো সাথে ঘর-সংসার করার কথা ভাবতেও পারে না। যদি পারতোও, হিমানীর মৃত্যু সে কখনোই কামনা করতো না। কারো খারাপ বা ক্ষতি চিন্তা করার জন্যে যে মানসিক শক্তি দরকার, কামিনীর তা নেই।

ইয়ামোও তার এই একমাত্র বোনটিকে ভালোবাসে—কামিনীর ধারণা, আর সবার চেয়ে একটু বেশিই বাসে।

আর মোহন, শুধু বলিষ্ঠ আর সুদর্শন নয়, তার যে এতো বয়স হয়েছে দেখে সেটা ধরারও উপায় নেই। সব দিক থেকেই এই লোক কামিনীর কাছে আশ্চর্য একটা বিস্ময়। মোহনের বেশির ভাগ কথাই ভালোমতো বুঝতে পারে না কামিনী। লোকটা লিখতে আর পড়তে জানে বলেই কি আর সবার চেয়ে এতো বেশি আলাদা? দূর-দুরান্তের অনেক দেশ ঘুরেছে মোহন, যৌবনের দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছে সাগর সেচে আর মরু চষে. ঘর-সংসার করার কথা ভাবার বোধহয় সময়ই পায়নি। কিংবা কোনো মেয়ে হয়তো কথা দিয়ে রাখেনি, কিন্তু তাকে ভুলতে পারেনি বলে একা একাই কাটিয়ে দিচ্ছে জীবনটা। তাকে দেখে কামিনী বুঝতে পারে, ওর কি যেন একটা দুঃখ আছে। চেহারা সব সময় প্রশান্ত, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, মাথাটা সারাক্ষণ তার কাজ করছে, কি যেন ভাবছে সে। লোকটার জন্যে মায়া হয় কামিনীর। কারো দুঃখ সইতে পারে না বলেই মাঝে মধ্যে

ভাবে, মোহনের দুঃখের কারণটা যদি জানতে পারতো, সেটা দূর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতো সে। মোহনের যে একটা দুঃখ আছে, সে-ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহই নেই।

এ-নিয়ে কাসিনের সাথেও তার কথা হয়েছিলো। দু'জন শলা করে একদিন ঠিক করেছিলো, পরের বার বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মোহনকে চেপে ধরবে কামিনী, সাথে কাসিনও থাকবে। ওরা জানতে চেষ্টা করবে, মোহনের এ-রকম জীবন যাপনের কারণ কি? কেন সে ঘর-সংসার করেনি? কি তার দুঃখ? কিন্তু সে সুযোগ আর এলো না। কামিনী বাড়ি ফিরলো বটে, কিন্তু সাথে তার কাসিন নেই।

এখন আর এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার উৎসাহ নেই কামিনীর।

যাদেরকে তার ভালো লাগে, মোহনও তাদের মধ্যে একজন। আর বন্ধুর বোন হিসেবে কামিনীকেও স্নেহ করে মোহন। ছোটো-বেলার কথা মনে আছে কামিনীর, মোহন তার খেলনা মেরামত করে দিতো।

মোহনের দৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য একটা গভীরতা আছে। তাকালে মনে হয়, অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আজও সেই দৃষ্টিতে তাকালো মোহন, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চেহারা। পরমুহূর্তে আবার ইয়া-মোর সাথে আলোচনায় মন দিলো সে।

নিচু গলায় কথা বলছে ওরা।

'তিয়াত্তর বস্তা বালি···।

'তারমানে দুশো ত্রিশ পালায় কাজ হয়েছে, বালি পাওয়া গেছে একশো বিশ বস্তা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু গাছের গুঁড়ি আর কাঠ বাবদ যে দাম পাওয়া গেছে

তাও যোগ করতে হবে। তেলের জন্যে…'

আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ইয়ামো। প্যাপিরাসের বাণ্ডিলটা মোহনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল সে। হাত বাড়িয়ে প্যাপিরাস ছুঁলো কামিনী, কৌতূহলের সাথে জানতে চাইলো, 'বাবার কাছ থেকে এলো বুঝি?'

মাথা ঝাঁকালো মোহন।

'কি বলেছে বাবা?'

প্যাপিরাসের ভাঁজ খুললো মোহন। আঁকিবুঁকি দাগে ভরা প্যাপিরাস, যার কোনো অর্থ জানা নেই কামিনীর। মৃদু একটু হেসে কামিনীর কোলের ওপর প্যাপিরাসটা ফেললো সে। কামিনী সেটার ভাঁজ খুললো। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো মোহন। প্যাপিরাসের লেখায় আঙুল রেখে পড়তে শুরু করলো সে।

'অধম পুরোহিত আমি ইমহোটেপ বলছি।

'আমার পরিবারের তোমরা সবাই হাজার হাজার বছর সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকো। হেরাক্লিওপোলিস-এর দেবতা, দেবতা হেরিশাফ, এবং আর সব দেবতা তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি অধম সন্তান, আমার মা এশাকে বলছি, কেমন কাটছে তোমার দিন, তুমি নিরাপদ আর সুস্থ তো? তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা সবাই নিরাপদ আর সুস্থ তো? আমার বড় ছেলে ইয়ামোকে জিজ্ঞেস করি, তুমি নিরাপদ আর সুস্থ তো? আমার জমি-জমার যতোটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করবে। জমির কাছ থেকে আদায় করো, পানির কাছ থেকে আদায় করো, কাজের ভেতর নাক পর্যন্ত ডুবে থাকো। দেখো বাছা, উৎপাদনে যদি পিছিয়ে না থাকো, তোমার জন্যে আমি দেবতা-দের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইবো…'

খিল খিল করে হেসে উঠলো কামিনী। 'বেচারা বড়দা। খেটে খেটে মরে গেলেও বাবা বলবে, আরো খাটো, আরো!'

মোহন পড়ে চলেছে, 'আমার ছোটো ছেলে আলার ব্যাপারে কারো কোনো অবহেলা আমি সহ্য করবো না। শুনছি, সে নাকি অসন্তুষ্ট। আরো দেখবে, হিমানী যেন হেনেটের ব্যাপারে নাক না গলায়। হেনেটকে কারো অপমান করা চলবে না। শণ আর তেল সম্পর্কে আমাকে সব কথা জানাতে ভুলবে না। আমার শস্য পাহারা দাও, আমার যা কিছু আছে সব পাহারা দাও। মনে রেখো, সব-কিছুর জন্যে তোমাকে দায়ী করবো আমি। আমার জমি যদি বন্যায় ভেসে যায়, তোমার আর সোবেকের কপালে খারাবি আছে…'

'বাবা একটুও বদলায়নি,' বললো কামিনী। 'তার ধারণা, সে না থাকলে কিছুই বোধ হয় দেখেশুনে রাখা হয় না।'

মোহন কোনো মন্তব্য না করে কামিনীর কোল থেকে প্যাপিরাস তুলে ভাঁজ করলো।

'আচ্ছা, সবাই কেন প্যাপিরাসে লিখতে শেখে না?' জানতে চাইলো কামিনী।

'সবার শেখার দরকার করে না।'

'তা হয়ত করে না, কিন্তু শিখলে খুব মজা হয় না কি?'

'তোমার বুঝি তাই ধারণা?' মোহন হাসছে।

'মোহনদা, তোমার অনেক কথাই আমি বুঝি না,' বললো কামিনী। এখন আর চেহারায় হাসি হাসি ভাবটা নেই। 'মাঝে মধ্যে মনে হয়, তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছো।' পাশে বসেছে মোহন, তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করছে সে। মিথ্যে অভিযোগ, ইচ্ছে করেই করেছে, দেখতে চায় মোহন কি বলে।

শুধু মুচকি একটু হাসলো মোহন, অভিযোগটাকে গুরুত্বই দিলো না। 'লেখা আর অংক সম্পর্কে আমি কি ভাবি, শুনবে কামিনী? একশো গাধার মাথা বা দশ বস্তা বালি গুণে লিখতে তেমন কোনো খাটনি নেই, খরচও কিছু না। কিন্তু প্যাপিরাসে লেখা এই সংখ্যা-গুলোই একসময় সত্য হয়ে উঠবে, কাজেই লেখক আর কেরাণীরা অবজ্ঞা আর শোষণ করতে শুরু করবে যারা শস্য ফলায় আর যারা পশুদের পেলে বড় করে তাদের। কিন্তু তবু জমি, ফসল আর পশু, এগুলোই আসলে সত্যি—প্যাপিরাসের গায়ে শুধুই কালির দাগ নয় এগুলো। কখনো যদি মিশর থেকে লেখক আর কেরাণীদের তাড়িয়ে দেয়া হয়, তবু মিশর বাঁচবে, কারণ জমি, ফসল আর পশু থেকেই যাবে। কিন্তু এমন যদি হয়, দিনে দিনে লেখকদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো, সবাই লেখক হয়ে গেল, তখন? কে তাহলে চাষবাস করবে? কে পালবে পশু? তখন আরো একটা সমস্যা দেখা দেবে। লিখতে জানলে সহজে কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না, তখন শুধু ঠকবে যারা লিখতে জানে না আর যাদের শক্তি কম।'

'এতো কথা আমার মাথায় ঢোকে না,' হেসে ফেলে বললো কামিনী। 'তুমি বুঝি এইসব নিয়েই সারাদিন চিন্তা করো?'

'চিন্তা করতে চাই, কিন্তু পারি না,' বললো মোহন। ম্লান দেখালো তাকে। 'ততো বুদ্ধি যদি থাকতো তাহলে তো কথাই ছিলো না। শুধু এইটুকু বুঝি, যারা লিখতে শিখবে তারা দিনকে করতে পারবে রাত, রাতকে করতে পারবে দিন। মিথ্যেটাকে সত্যি বলে চালানো তাদের জন্যে কোনো সমস্যাই হবে না।'

চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কামিনীর। 'তোমার এই কথাটা কিন্তু বুঝতে পেরেছি আমি।' ছেলেমানুষের মতো উৎফুল্ল হয়ে

উঠেছে সে। তুমি বলতে চাইছো, একজন প্যাপিরাসে লিখলো, তার কাছে দুশো বস্তা বালি আছে, কিন্তু তা যদি না থাকে, তাহলে ওই লেখার কোনো দাম নেই। কিন্তু লেখা হয়েছে, তাই লোকে মিথ্যে কথাটাই বিশ্বাস করবে।'

'হ্যাঁ, লেখার এমনই গুণ,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো মোহন।

'এসব থাক,' বললো কামিনী। 'আচ্ছা, তোমার কি মনে পড়ে, আমি যখন খুব ছোটো, তুমি আমার খেলনা মেরামত করে দিতে? একটা সিংহ ছিলো…'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে…'

'জানো, ওটা নিয়ে আমার তানি এখন খেলছে।' বলে হাসতে লাগলো কামিনী। তারপর বললো, 'কাসিন মারা যাবার পর খুব ভয় পেয়েছিলাম, জানো। কোথায় থাকবো, কে আমাকে দেখবে। বাড়িতে এসে দেখি, সব সেই আগের মতোই আছে, কিছুই বদলায়নি…।

'তোমার বুঝি তাই ধারণা? কিছু বদলায়নি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো মোহন।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কামিনী, হঠাৎ থমকে গেল। কপালে ক্ষীণ একটু চিন্তার রেখা নিয়ে মোহনের দিকে তাকালো সে। 'কি বদলেছে, মোহনদা?'

'তা আমি কি করে বলবো। তবে বদলানোই তো উচিত। এবং এই আট বছরে সবই বদলেছে…'

'না। আমি সব সেই আগের মতো দেখতে চাই…'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো মোহন। 'কিন্তু তুমি কি নিজে আর আগের মতো আছো, কামিনী?'

'আছিই তো! আর যদি না থাকি, খুব তাড়াতাড়ি আগের মতো হয়ে যাবো, তুমি দেখো।'

হেসে ফেললো মোহন। 'তাই কি কখনো হয়। কেউ কি পিছন দিকে যেতে পারে? ফেলে আসা দিনগুলোয় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কামিনী।'

'কিন্তু...' মোহনকে নিঃশব্দে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল কামিনী। তারপর জেদের সুরে শুরু করলো, 'কেন এ-কথা বলছো, জানি না। আমি তো দেখছি সবই সেই আগের মতো আছে। বড়দা গাধার খাটনি খাটছে, আর দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারে উদ্বেগে কাতর হচ্ছে, যেমন দেখে গিয়েছিলাম। হিমানী এখনো খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছে কেতীর সাথে। মেজো ভাইয়ের গলা কাটানো হাসি এসে অবধি শুনছি, সেই আগের মতোই। কিংবা হেনেটের কথা ধরো। বুড়ি বদলেছে, বলতে চাও? একবিন্দু না! তারপর ধরো...'

'তুমি বুঝছো না, কামিনী,' বললো মোহন। 'সবাই আমরা বদলেছি, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে সেটা ধরা পড়ছে না। এ-ধরনের পরিবর্তন, কামিনী, এক ধরনের পচন বলতে পারো। একটা পাকা ফলের কথা কল্পনা করো, কি সুন্দরই না দেখতে, কিন্তু ভেতরে তার পচন ধরেছে, বাইরে থেকে সেটা টের পাওয়া যায়? এখানের ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না কামিনী। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, চেহারায় বিস্ময়। 'এসব তুমি কি বলছো, মোহনদা? আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো কেন?'

'আমি নিজেও ভয় পাচ্ছি, কামিনী।'

'কিসের ভয়, মোহনদা ?' উঠে দাঁড়ালো কামিনী। মোহনের একটা হাত চেপে ধরলো। 'কাকে ভয় ? এসব কথা…'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিলো মোহন, এবার কামিনীর দিকে তাকালো সে, মৃদু হাসলো। 'কি বলেছি ভুলে যাও, কামিনী। ফসলে রোগ ধরেছে, সেই কথা ভাবছিলাম আমি।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো কামিনী। 'তাই বলো। আমি ভাবলাম কি না কি।'

দুই

জলপ্লাবনের তৃতীয় মাস—চার তারিখ

ইয়ামোর সাথে কথা বলছে হিমানী। সেই পুরুষালি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'তুমি একটা ভেড়া, ইয়ামো। একটা ছুঁচোর সাহসও নেই তোমার। তোমার বাবা একের পর এক হুকুম করে যাচ্ছে, আর তুমি গাধার খাটনি খেটে চলেছো। তোমার বাপের মতো একচোখা লোক আর বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। একবারও কি ভেবে দেখেছো, এতো সয়-সম্পত্তি কার কপালে জুটবে? কাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, কার দিকে তার বেশি টান?'

সাত চড়েও রা কাড়ে না ইয়ামো, শান্ত সুরে বললো, 'হ্যাঁ, আলাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে বাবা···।'

'শুধু মাথায় তুলছে?' খেঁকিয়ে উঠলো হিমানী। 'কেন, কানা নাকি, দেখছো না দিনকে দিন কেমন লোভী আর স্বার্থপর হয়ে উঠছে তোমার সৎ ভাইটি? এই আমি বলে রাখলাম, তোমাদের গলায় এক-দিন ওই পুঁচকে শয়তান ছুরি চালাবে। একটা কুটো পর্যন্ত নেড়ে খায় না, অথচ বায়না আর দাবির তার শেষ নেই। জানেই তো, বাবা তার পক্ষে। এখনো সময় আছে, বুঝলে, সোবেক আর তোমার সাব-

ধান হওয়া উচিত।'

কাঁধ ঝাঁকালো ইয়ামো। 'কি লাভ?'

তুমি একটা গর্দভ, ইয়ামো। তোমার মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই ভালো ছিলো। নিজের স্বার্থ তো পাগলও বোঝে, তুমি কেন বুঝতে চাও না! বাপ যা বলে সবেতেই হ্যাঁ-হ্যাঁ করো শুধু। তুমি একটা মানুষ নাকি!'

'হাজার হোক বাপ তো, তার সাথে আমি তো ঝগড়া করতে পারি না।'

'সেটা তোমার বাপ ভালো করেই জানে, সেই সুযোগটাই তো নেয় সে,' বললো হিমানী। 'জানে, তার এই বড় ছেলেটির মধ্যে পৌরুষ বলতে একেবারেই কিছু নেই, নিজের স্বার্থও বোঝে না, কাজেই সব ব্যাপারেই তোমাকে দায়ী করছে সে, আর তুমিও নিজেকে অপরাধী ভেবে আরো বেশি কাজ দেখাতে চাইছো। মানুষ তো দেখেও শেখে! চোখ নেই, সোবেক বাপের সাথে কিভাবে কথা বলে দেখতে পাও না? কাউকে ভয় করার বান্দা নয় সে, অন্যায় ভাবে তাকে দায়ী করা হলে তর্ক করতে ছাড়ে না।'

'কিন্তু এ কথা তো সত্যি, সোবেককে নয়, বাবা আমাকেই বিশ্বাস করে,' বললো ইয়ামো। 'সোবেকের ওপর বাবা কোনো দায়িত্ব দেয়? সবই তো আমার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, নয় কি?'

'আর সেজন্যেই এই সয়-সম্পত্তি আর বিষয়-আশয়ের ওপর তোমার একটা দাবি জন্মেছে। গায়ে খেটে, মাথা খাটিয়ে এতো বড় একটা জমিদারী টিকিয়ে রেখেছো, লাভের একটা অংশ তুমি চাইবে না কেন? সবই তো তুমি দেখাশোনা করছো, তোমার বাপ ক'দিনই বা এখানে থাকে? এমন কি পুরাহিতের দায়িত্ব পর্যন্ত তোমার ঘাড়ে চেপেছে।

সবই করছো, কিন্তু শুধু কর্তৃত্বটুকু তোমার নেই। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কতো বয়স হলো, খেয়াল আছে? নিজের বলে কিছু আর কবে হবে তোমার? এখনই সময়, লাভের একটা অংশ দাবি করো তুমি। আর কারো ওপর ভরসা করবে সে উপায় তোমার বাপের নেই…'

সন্দিহান দেখালো ইয়ামোকে। 'কিন্তু বাবাকে এ-কথা বলা যাবে না। বাবা রাজি হবে না।'

'রাজি তো হতে চাইবেই না,' বললো হিমানী। 'রাজি তাকে করাতে হবে। ইস্, আমি যদি পুরুষমানুষ হতাম রে! মাঝে মধ্যে মনে হয়, এমন ভেড়ার ঘর করার চেয়ে বিষ খাই।'

বিচলিত দেখালো ইয়ামোকে। 'এসব কি কথা! ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, একবার নাহয় কথাটা তুলে দেখবো…'

'শুধু তুললে হবে না,' চোখ রাঙালো হিমানী, 'জোর করতে হবে। ভয় দেখাতে হবে। আলা এখনো ছোটো, আর সোবেকের ওপর তোমার বাবার কোনো আস্থা নেই। তুমি ছাড়া কোনো গতি নেই তার। তুমি যদি শক্ত হতে পারো, তোমার দাবি না মেনে নিয়ে তার উপায় কি!'

'কিন্তু, আমি ছাড়াও আর একজন আছে,' বললো ইয়ামো। 'মোহন।'

'মোহনকে ভয় পাবার কোনো কারণই নেই। সে তো আর পরিবারের কেউ নয়। তোমার বাবা একচোখা হোক আর যাই হোক, নিজের ছেলেকে বাদ দিয়ে বাইরের কারো ওপর জমিদারী দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিতে পারবে না।'

মনটাকে শক্ত করলো ইয়ামো। বললো, 'ঠিক আছে, তাই হবে।

বাবাকে বলবো…'

'বলবে তো জানি,' বিড়বিড় করে উঠলো হিমানী, 'কিন্তু কিভাবে বলবে? মরদের মতো, নাকি ছুঁচোর মতো চিঁচিঁ করে?'

ছোটো ছেলে চখাকে নিয়ে খেলছিলো কেতী। বাচ্চাটা সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। খিল খিল করে হাসছিলো কেতী, সোবেককে বলছিলো, 'দেখো দেখো, একবারও পড়ে না…।' হঠাৎ তার খেয়াল হলো, তাদের দিকে মন নেই সোবেকের। 'কি হয়েছে গো? এতো কি চিন্তা করছো তুমি?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সোবেক। 'বাবা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমার ওপর তার কোনো আস্থা নেই। এটা আমি কতোদিন সহ্য করবো, বলো তো?'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখালো কেতীকে। 'ব্যাপারটা আমিও বুঝি। তা, কি করবে বলে ভাবছো?'

'মুশকিল হলো ইয়ামোকে নিয়ে,' বললো সোবেক। 'তার যদি একটু সাহস থাকতো, দু'জন একসাথে বাবার সাথে বসতাম, এর একটা ফয়সালা করা যেতো। কিন্তু সে এমনই ভীতু যে…'

'হ্যাঁ।'

'এবারে কি করলাম জানো? কাঠ দিয়ে তেল নিইনি, নিয়েছি শণ—আমাদের তাতে লাভই হয়েছে। কিন্তু দেখো, বাবা এসে বলবে কাজটা বোকামি হয়ে গেছে। আমি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যাই করি না কেন, বাবার সেটা পছন্দ হয় না। ঝুঁকি না নিলে যে ব্যবসায় ভালো করা যায় না, এই সহজ কথাটাকে তাকে বোঝায়। কিসের ব্যবসা কেমন যাবে, আমি আগে থেকে তা টের পাই। আমার সাহসও আছে, ঝুঁকি নিতে ভয় পাই না। আমার হাতে পুঁজি থাকলে, উন্নতি

করতে ছ'মাসও লাগবে না··· ।'

ছেলের ওপর চোখ রেখে কেতী বললো, 'আর কেউ না বুঝুক, আমি সেটা ভালো করেই বুঝি ।'

'এবার কিন্তু বাবার সাথে আমার তুমুল এক চোট হয়ে যাবে, লাইন ছাড়া একটা কথা বলে দেখুক না । ঠিক করেছি, এবার এলে বলবো, স্বাধীন ভাবে আমাকে কাজ করতে না দিলে আমি থাকবো না, চলে যাবো ।'

ছেলের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো কেতী, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার । চখা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলো । 'চলে যাবে ?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো কেতী । 'কোথায় চলে যাবে ?'

'যেখানে খুশি । প্রথমে রাজি করাবার চেষ্টা করবো, কিন্তু আমার দাবি মানা না হলে···'

'না, সোবেক,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো কেতী । 'আমি বলছি, না ।'

ভুরু কুঁচকে স্ত্রীর দিকে তাকালো সোবেক, যেন এই প্রথম তার উপস্থিতি টের পেয়েছে সে । 'তারমানে ?'

'এমন বোকামি কেউ করে নাকি ? চলে যাওয়ার মানে, দাবি ছেড়ে দেয়া । এতো বড় একটা জমিদারী, বছরে যা আয় তা দিয়ে এ-রকম আরো দশটা পরিবার চলতে পারে—এসবে তোমারও অধিকার আছে । তোমার বাপ বুড়ো হয়েছে, আর ক'দিন, তখন তো ভাগ-বাটোয়ারা হবেই ।'

'কিন্তু ।'

'শ্বশুর মরলে তোমার তিন ভাই সবকিছুর মালিক হবে,' বললো

কেতী। 'কিন্তু তার আগেই যদি চলে যাও, লাভ হবে ভাসুর আর দেওরের। তখন ফিরে এলেও নিজের ভাগ ওদের কাছ থেকে তুমি আদায় করতে পারবে না। আলা তো সব দখল করে বসার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছে, আমরা চলে গেলে তারই সবচেয়ে বেশি সুবিধে। ইয়ামোর স্বার্থবোধ অতোটা টনটনে না হলেও, তার বউয়ের কথা ভুলে যেয়ো না, হিমানী কেউটের চেয়েও মারাত্মক। একবার যদি বেরোও, জীবনে আর ঢুকতে পারবে না।'

ধীরে ধীরে সোবেকের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো। তারপর হেসে উঠলো সে। 'তোমার যে এতো বুদ্ধি, তা তো কোনোদিন বুঝিনি।'

'ভুলেও তোমার বাপের সাথে ঝগড়া করতে যেয়ো না, বুঝলে। তার মন যুগিয়ে চলো। ক'টা দিন একটু ধৈর্য ধরো।'

'কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবো? তারচেয়ে বাবাকে বলি, লাভের অংশ চাই আমি…।'

দ্রুত মাথা নাড়লো কেতী। 'ভুলেও ওই কাজটি করো না। তোমার বাবাকে আমি চিনি, লাভের অংশ কক্ষনো দেবে না। তোমরা সবাই তার ওপর নির্ভর করো, এটা ভাবতে তার খুব ভালো লাগে।'

'বাবাকে তুমি বিশেষ পছন্দ করো না, না?'

হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল কেতী। চখার দিকে ফিরে হাত বাড়ালো সে। 'এসো, মাণিক আমার, কোলে এসো…।'

কেতীর কালো মাথার দিকে বোকার মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সোবেক, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কেতীর আচরণ তার বোধগম্য হয়নি।

ছোটো নাতনিকে ডেকে আনিয়ে ধোলাই দিচ্ছে দাদী-মা এশা। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিচ্ছে আলা। চমৎকার স্বাস্থ্য তার, সুদর্শন। চেহারায় রাগ আর অসন্তোষের ভাব লেগেই আছে।

'এসব আমি কি শুনছি, আলা?' তীক্ষ্ণ গলা এশার, তাকিয়ে আছে কঠিন দৃষ্টিতে। যদিও চোখে আজকাল খুব কমই দেখতে পায় বুড়ি। এটা করবি না, ওটা করবি না, শুধু বসে বসে খাবি আর সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবি? কি পেয়েছিস তুই শুনি?'

'আমি কি আর ছোটো আছি নাকি, যে যা হুকুম করবে তাই শুনতে হবে আমাকে? ইয়ামো কে, সে কি এই জমিদারীর মালিক যে তার হুকুম মতো চলতে হবে আমাকে? কাজ আমি করতে পারি, কিন্তু তুমি ওদেরকে বলে দাও বিনিময়ে আমাকে ফসলের অংশ দিতে হবে।'

'বেয়াদপির একটা সীমা থাকা উচিত, আলা,' রাগে অস্থির দেখালো দাদী—মাকে। 'ইয়ামো কে মানে? সে তোর বড় ভাই। তোর বাপ তো তাকেই সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তার কথা শুনবি না তো কার কথা শুনবি? পুঁচকে ছোঁড়া কতো বড় সাহস তোর, ফসলের অংশ চাস। তোর বড় ভায়েরা শস্যের একটা দানা পর্যন্ত চাইতে সাহস পায়নি, আর তুই কিনা···।

'ইয়ামোর কথা যদি বলো,' তাচ্ছিল্যের সুরে বললো আলা, 'ও একটা হাঁদা। দিনে দিনে মোটা হচ্ছে আর বোকা হচ্ছে। সবাই জানে, তারচেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। আর সোবেকের কথা যদি বলো, ওর শুধু মুখেই ফটফট, হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা। কিন্তু কাজের বেলা দেখা যায়, যেটাতেই হাত দেয় সেটাতেই লোকসান দিয়ে বসে। বাবা তো সেজন্যেই ওকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না। চিঠিতে বাবা

কি লিখেছে জানো ? লিখেছে, আমার যে কাজটা পছন্দ সেটাই শুধু করবো আমি, কেউ আমাকে হুকুম করতে পারবে না।'

'তারমানে, কোনো কাজই তুই করবি না।'

'লিখছে, আমাকে আরো ভালো খেতে আর পরতে দিতে হবে। এসে যদি শোনে আমাকে অসন্তুষ্ট করা হয়েছে, কারো আর রক্ষে রাখবে না।' হাসতে লাগলো আলা। 'তুমিও জানো, বাবা আমাকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।'

'তুই যে বখে গেছিস, তোর বাপকে এবার সেটা জানাতে হবে,' বললো এশা।

নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগলো আলা। আদুরে গলায় বললো, 'না, দাদী-মা, বলো না। তোমার আর আমার, বাড়িতে আমাদের এই দু'জনের মাথাতেই যা একটু ঘিলু আছে। বাবা তোমার কথা মানে। তুমি বরং আমার দলেই থাকো…'

'কি বললি ? দল ?'

'এমন ভাব করছো, তুমি যেন কিছুই জানো না। জানো জানো, হেনেট তোমাকে সব বলে। বড় ভায়েরা অসন্তুষ্ট। হিমানী তো রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা লেগে আছে ইয়ামোর পিছনে, জমিদারীর অংশ চাইতে বলছে। সোবেক কাঠের বদলে তেল না নিয়ে নিয়েছে শণ, ঠকে একেবারে ভূত হয়ে গেছে। ধমক খাবার ভয়ে একটা বুদ্ধি এঁটেছে সে, বাবা এলেই জমিদারীর অংশ দাবি করবে। বাবাকে চমকে দিয়ে গা বাঁচাতে চাইবে সে।'

'এই বয়সেই তুই এতো কথা বুঝতে শিখেছিস… !'

'আর ক'দিন ? দু'বছর ? তারপরই তো বাবা আমাকে তার জমিদারীর অংশীদার করে নেবে,' বললো আলা, তারপর আশ্বাস দিলো,

'তাই বলে তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমাকে আমি এমন আরামে রাখবো যে '

'তোকে? ইমহোটেপ তোকে দেবে জমিদারীর অংশ? তুই না বাড়ির ছোটো ছেলে?'

'ছোটো বড়োর প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন বাবা সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসে। সবকিছুর মালিক বাবা, বাবা যদি আমাকে অংশীদার হিসেবে চায়, কারো কিছু বলার আছে?' ঠোঁট বাঁকা হাসি ফুটলো তার মুখে। 'বাবাকে কিভাবে মানাতে হয়, সে আমার জানা আছে।'

'তোর বাপ সম্পর্কে এই তাহলে তোর ধারণা? সে বোকা?'

নরম সুরে আলা বললো, 'তুমি অন্তত বোকা নও, দাদী মা। ভালো করেই জানো, মুখে যতো বড় বড় কথাই বলুক, বাবা আসলে সাংঘাতিক দুর্বল লোক···।

হঠাৎ চুপ করে গেল আলা। লক্ষ্য করলো, দাদী-মা মাথা তুলে তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফেরালো সে, দেখলো, তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কানী বুড়ি হেনেট।

'মালিক তাহলে দুর্বল লোক?' খসে খসে গলায় বললো হেনেট। সবজান্তার ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা দোলালো সে। 'কিন্তু কর্তা যদি শোনে এ-কথা?'

শরীর শক্ত হয়ে গেছে আলার। অপ্রতিভ একটু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'বললে তুমিই তাকে বলবে। কিন্তু মনে রেখো, বাড়িতে খেজুর নিয়ে এসে ভাগ করার জন্যে তোমার হাতেই সব তুলে দিই আমি। হেনেট, দোহাই লাগে, বলো না!'

কুঁজো শরীর নিয়ে দ্রুত এশার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হেনেট। 'আমি তো এ-বাড়ির দাসী, আমি কেন সব ব্যাপারে নাক গলাবো?

যাতে গোলমাল না বাধে, সেদিকেই আমার খেয়াল। যখন দেখি ক্ষতি হয়ে যাবে, শুধু তখনই আমি মুখ খুলি…'

নিজেকে সামলে নিয়েছে আলা। বললো, 'আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম, হেনেট। কেউ কিছু বলার আগে আমিই বাবাকে সব ব্যাখ্যা করবো। বাবা বুঝবে, এ-ধরনের মারাত্মক কথা আমার মুখ থেকে বেরুতে পারে না।' কটমট করে হেনেটের দিকে তাকালো সে, তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'বুদ্ধি আছে। সাহসও কম নয়। দিনে দিনে বেড়েও উঠছে তাল-গাছের মতো। একে নিয়ে কর্তার অনেক বড় আশা।'

'বুদ্ধি নয়, কুবুদ্ধি,' তীক্ষ্ণ সুরে বললো এশা। 'সবাইকে ঠকিয়ে বড় হবার মতলব ফাঁদছে। আমার ছেলেই এর জন্যে দায়ী। সে-ই তো ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে।'

'হ্যাঁ… মানে… কিন্তু, ছোটো ছেলে, একটু বেশি আদর তো করবেই…'

অন্যমনস্ক দেখালো এশাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো, 'হেনেট, আমি খুব চিন্তায় আছি।'

'চিন্তায় আছো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো হেনেট। কৌতূহল আর আগ্রহে জ্বলজ্বল করতে লাগলো তার একটি মাত্র চোখ।

আবার অনেকক্ষণ কথা বললো না এশা। তারপর জানতে চাইলো, 'ইয়ামো কি বাড়িতে আছে?'

'আসার সময় দেখলাম উঠনে রয়েছে।'

'যাও, গিয়ে বলো আমি তাকে ডাকছি।'

'কিন্তু তোমার চিন্তার কারণটা তো বললে না?' জানতে চাইলো হেনেট।

'তোমাকে যা করতে বলেছি, করো, হেনেট,' চেঁচিয়ে উঠলো এশা।

বিড়বিড় করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল হেনেট।

খবর পাবার সাথে সাথে দাদী-আম্মার ঘরে চলে এলো ইয়ামো। কোনো রকম ভূমিকা না করে এশা বললো, 'তোর বাপ আসছে। এদিকের সব ঠিকঠাক আছে তো?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ইয়ামোর। 'বাবা এসে সব দায়িত্ব বুঝে নিলে আমি বেঁচে যাই।'

'আমি কি জিজ্ঞেস করছি?' ধমকের সুরে বললো এশা। 'সব ঠিক আছে কিনা? কেনাবেচায় লাভ হয়েছে? বাঁধ ভেঙে পানি ঢোকেনি তো?'

'সব ঠিক আছে, দাদী-মা,' বললো ইয়ামো। 'বাবার নির্দেশ মতোই সব করেছি আমি।'

'সব যদি ঠিক থাকবে, আলা তাহলে অসন্তুষ্ট কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইয়ামো। 'এভাবে লাই দিয়ে যদি মাথায় তুলতে থাকে, বাবাও ওকে বেশিদিন সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আলাকে নষ্ট করা হচ্ছে, আর সেজন্যে একমাত্র বাবাই দায়ী।'

'এসব কথা তোর বাপের মুখের ওপর বলতে পারিস না?'

ম্লান চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকলো ইয়ামো।

দৃঢ় সুরে এশা বললো, 'কথাটা তুই তুলবি, আমি তোকে সমর্থন করবো। পারবি?'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইয়ামো, বললো, 'প্রায়ই দেখতে পাই, চারদিকে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। কিন্তু বাবা ফিরে এলেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়। তার কারণ,

যে-কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে তার। তার কথার ওপর কেউ কথা বলার লোক নেই। কিন্তু আমার ওপর যখন দায়িত্ব থাকে, তার হুকুম মতো কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়—কারণ, আমার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না, আমি শুধু তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করি।'

এশা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ইয়ামোকে।

ইয়ামো আবার বললো, 'এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না।'

এশা বললো, 'আদর্শ স্বামী বলতে যা বোঝায়, তুই তাই, ইয়ামো। বউয়ের পেট ভরাতে হবে, তাকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে হবে, তাকে ভালো কাপড় পরাতে হবে, তার শখ-সাধ মেটাতে হবে, মাথায় দেয়ার জন্যে তার সুগন্ধি তেল দরকার—নিয়ম মতো সবই তুই করছিস। সেজন্যে আমি খুশি, ইয়ামো। কিন্তু, ভাই, একটা ব্যাপারে আমি তোকে সাবধান থাকতে বলবো, তাতে তুই আমাকে খারাপ ভাবিস আর যাই ভাবিস—বউকে কখনো মাথায় চড়তে দিবি না। সে যেন তোকে ভেড়া বানাতে না পারে। কথাটা মনে রাখলে তোরই উপকার হবে।'

চেহারা লাল হয়ে উঠলো ইয়ামোর, ঘুরে দাঁড়ালো সে।

তিন

জল প্লাবনের তৃতীয় মাস—চোদ্দ তারিখ

চারদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সবখানে আয়োজনের ধুম। গোটা বাড়ি ঘষেমেজে ঝকঝকে তকতকে করা হয়েছে, উঠনে একটা গাছের পাতাও পড়ে নেই। হরেক রকম রুটি সেঁকা হয়েছে, সেগুলোর আকার-আকৃতি যেমন আলাদা, তেমনি স্বাদ-গন্ধও। রান্নাঘর থেকে এখন রসুন, পিয়াজ আর ঝাঁঝালো সব মশলার গন্ধ ভেসে আসছে, গনগনে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে ছাল ছাড়ানো হাঁস। বাড়ির মেয়েরা গলা ফাটাচ্ছে, বাঁদী-দাসী আর চাকরবাকররা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

সবখানে একটা চাপা গুঞ্জন, 'কর্তা···কর্তা আসছেন!'

দাসীদের সাথে কামিনীও হাত লাগিয়েছে কাজে, পদ্ম আর পপি ফুল দিয়ে মালা গাঁথছে সে। বাবা ফিরছেন, এই অনুভূতিটা আনন্দের একটা আলোড়ন তুলেছে তার মনে। শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর প্রথম তার মন খারাপ করে দেয় মোহন, কিন্তু এই ক'দিনে সে-সব ভুলে আবার স্বস্তি বোধ করছে সে। আবার নতুন করে

উপলব্ধি করছে, সে সেই আগের কামিনীই আছে। ইয়ামো, সোবেক, হিমানী, কেতী, হেনেট এবং অন্যান্যরা কেউ এতোটুকু বদলায়নি। সবাইকে সে ভালোবাসে, কেউ তাকে অবহেলা করে না।

খবর এসেছে, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছুবে ইমহোটেপ। নদীর তীরে একজনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, সওদাগরের জাহাজ দেখা গেলেই সবাইকে সে সুখবরটা জানাবে। কান পেতেই ছিলো সবাই, তবু ভারি গলার আওয়াজটা যখন পরিষ্কার ভেসে এলো, মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল বাড়ির প্রতিটি প্রাণী। পরমুহূর্তে যে যার কাজ ফেলে পড়িমরি করে ছুটলো। হাতের মালা ফেলে সবার সাথে ছুটলো কামিনীও। নদীর তীরে, নোঙর ফেলার ঘাটে ভিড় করলো সবাই। প্রজাদের নিয়ে আগেই পৌঁচেছে ইয়ামো আর সোবেক। প্রজারা বেশির ভাগই জেলে, চাষী আর দিনমজুর, সওদাগরের জাহাজ দেখে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলো তারা, ষাঁড়ের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো।

হ্যাঁ, বিশাল চৌকো পাল মাথায় নিয়ে একটা সওদাগরি জাহাজ আসছে বটে। দখিণা বাতাসে ফুলে আছে পাল। তার ঠিক পিছনেই আরো একটা জাহাজ দেখা গেল, পুরুষ আর মেয়েলোকের মাথা গিজগিজ করছে। প্রতিবারের মতো এবারও ইমহোটেপ মানুষ কিনে আনছে। ওই দ্বিতীয় জাহাজটাতেই থাকার কথা লাভের টাকা দিয়ে কেনা তৈজসপত্র, খাবারদাবার, আর শখের জিনিস-পত্র। খানিক পরই বাবাকে দেখতে পেলো কামিনী, সামনের জাহাজে একটা উঁচু বেদীতে বসে রয়েছে, হাতে পদ্ম ফুল। তার পাশে আরো একজনকে দেখা গেল। কামিনী অনুমান করলো, মেয়েটা নিশ্চই গায়িকা হবে। তার বাবা চিরকালই গান-বাজনার খুব ভক্ত।

নদীর তীরে উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। একদল গাইছে, কর্তা দীর্ঘজীবী হোন। আরেক দল গাইছে, হে মালিক, আমরা তোমার প্রশংসা করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তীরে ভিড়লো তরী, ঘাটে নামলো ইমহোটেপ। তার আপনজনেরা তাকে ঘিরে ধরলো, সবাই তার কুশল জানতে চায়। মাথা উঁচু করে, গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো ইমহোটেপ, চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। প্রজাদের উদ্দেশে হাত নাড়লো সে।

ভিড় ঠেলে আরো একটু সামনে এগোতে চেষ্টা করলো কামিনী। হঠাৎ একেবারে কাছ থেকে বাবাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলো সে। বাবা এতো রোগা হয়ে গেছে, চেনাই যায় না। মনটা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেল তার। বাবার বয়স হয়েছে, ভাবতে ভাবতে তার চোখ ছলছল করে উঠলো। লক্ষ্য করলো, দাঁড়াবার ভঙ্গি, তাকাবার ভঙ্গি, গাভীর্য ভরা হাসি ইত্যাদি দিয়ে লোককে মুগ্ধ করার চেষ্টা করলেও, খুব একটা সফল হচ্ছে না বাবা। চেহারায় তার সেই আগের ব্যক্তিত্ব আর নেই।

একে একে ছেলেদের আলিঙ্গন করছে ইমহোটেপ। ইয়ামোকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো সে, বললো, 'আমার বাধ্য ছেলে, তোমার ব্যাপারে আমি কখনো দুশ্চিন্তায় ভুগি না।' সোবেককে বুকে নিয়ে বললো, 'এটি যেন রাজপুত্র, দেবতারা নিজের হাতে গড়েছেন তোমাকে···দেখতে পাচ্ছি, মিটিমিটি মিষ্টি হাসিটা তোমার আরো সুন্দর হয়েছে।' আলাকে প্রথমে দু'হাতে ধরলো সে, গর্বের সাথে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর টেনে নিলো বুকে। ছোটো ছেলের মুখে, কপালে চুমো খেলো ইমহোটেপ। বললো, 'আমার বুকের ধন, আমার সোনা-মানিক। কতো বড়টি হয়েছো

তুমি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। তোমাকে আবার কাছে পেয়ে আমার বুকটা ভরে গেল।' এরপর এক পা এগিয়ে এসে একমাত্র মেয়েকে বুকে টেনে নিলো সে। 'কামিনী, আমার চোখের মণি! আবার তুই বাপের কাছে ফিরে এসেছিস, সেজন্যে দেবতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' এরপর বৌমাদের দিকে তাকালো ইমহোটেপ। বললো, 'হিমানী, কেতী তোমরাও আমার মেয়ে।···আর হেনেট, আমার বিশ্বস্ত হেনেট···'

নতজানু হয়ে প্রণাম করছে হেনেট, ইমহোটেপের হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে। তার দু'চোখে পানি, আনন্দের বন্যা।

'তুমি ভালো, হেনেট, সুখী?' জানতে চাইলো ইমহোটেপ। 'তোমাকে কষ্ট দিলে আমাকে অভিশাপ লাগবে, কেননা তুমি সবসময় নিঃস্বার্থভাবে আমার সেবা-যত্ন করেছো, কখনো আমার অমঙ্গল কামনা করোনি। তোমার মতো বিশ্বস্ত, অনুগত মানুষ আজকাল পাওয়া যায় না।' এরপর মোহনের দিকে তার চোখ পড়লো। 'আমার বিশ্বস্ত সহকারী, তুমি ভালো তো হে? আমার জমিজমার খবর কি? উৎপাদন কেমন হয়েছে? জানি জানি, ফসল এবার খুবই ভালো হয়েছে। ব্যবসাও নিশ্চই খারাপ করোনি তোমরা···'

তারপর, কুশলাদি বিনিময় শেষ হলে, একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলো ইমহোটেপ। 'আমার ছেলেমেয়ে আর শুভাকাঙ্ক্ষিরা, শোনো,' ভারি গলা, জোরালো ভাষা, চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে শুরু করলো সে। 'তোমাদের জন্যে একটা খবর আছে। আজ অনেক বছর হলো, তোমরা সবাই তো জানোই, আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। আমার বোন (ইয়ামো, সোবেক আর কামিনীর মা) আর আমার স্ত্রী (তোমার মা, আলা) অনেকদিন হলো আমাকে ছেড়ে

দেবতা অসিরিস-এর কাছে চলে গেছে। কাজেই, হিমানী আর কেতীকে বলছি, তোমাদের জন্যে নতুন একটা বোন নিয়ে এসেছি আমি, তাকে তোমরা আদর-যত্নে রাখবে। তার নাম নফরেত, সে আমার উপপত্নী, তাকে তোমরা আমার কথা মনে রেখে ভালোবাসবে। দক্ষিণের মেমফিস থেকে তাকে এনেছি আমি, এরপর আবার যখন আমি বাণিজ্যে যাবো, তোমাদের সাথেই থাকবে সে।' কথা শেষ করে পিছন থেকে হাত ধরে টেনে একটা মেয়েকে পাশে দাঁড় করালো ইমহোটেপ। ঘন, কালো, কোমর ছাড়ানো চুল মেয়েটার। পাকা আপেলের মতো গায়ের রঙ। চোখ দুটো বড় বড়, কিন্তু চারপাশটা কুঁচকে ছোটো ছোটো হয়ে আছে। অত্যন্ত অল্প বয়স, চেহারায় একগুঁয়েমি আর জেদ, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, দেমাকে মাটিতে যেন পা পড়ে না।

বুকে প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলো কামিনী। ভাবলো, আমার চেয়েও ছোটো একটা মেয়েকে বিয়ে করলো বাবা!

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে নফরেত, শুধু ক্ষীণ একটু তাচ্ছিল্য মাখা হাসিতে বাঁকা হয়ে আছে ঠোঁট। পরিবারের সবাই হঠাৎ এরকম একটা আঘাত পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, কারো মুখে কোনো কথা ফুটলো না। চেহারায় খানিকটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে জোরে জোরে কাশলো ইমহোটেপ, তারপর ধমকের সুরে বললো, 'কি হলো। আদব-কায়দা সব ভুলে গেলে? বাপের বিয়ে করা বউকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়, তাও কি তোমাদের শিখিয়ে দিতে হবে?'

ম্লান, বিষাদ মাখা চেহারা নিয়ে নফরেতকে অভ্যর্থনা জানালো সবাই, কিন্তু তাতে প্রাণের ছোঁয়া থাকলো না। ব্যাপারটা লক্ষ্য

করলেও, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো না ইমহোটেপ। বললো, 'এই তো চমৎকার! হিমানী, কেতী আর কামিনী, তোমরা নফরেতকে নিয়ে মেয়ে মহলে যাও, ওর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করো। বাক্স-পেটরা সব কোথায় নামানো হয়েছে?'

আগেই জাহাজ থেকে নামানো হয়েছে সব, সেগুলো এখন ইমহোটেপের সামনে আনা হলো। গোল ঢাকনি খুলে একটা বাক্স থেকে মণি-মুক্তো বসানো অলংকার বের করে দেখালো ইমহোটেপ। 'এগুলো সব তোমার, নফরেত। বাক্সে কাপড় চোপড় আছে। নিয়ে যাও, নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখো।' মেয়েরা রওনা হলো, বাক্সটা নিয়ে তাদের পিছু পিছু চললো দু'জন চাকর।

ছেলেদের দিকে ফিরলো ইমহোটেপ। 'আমার জমিদারীর খবর কি? সব কাজ ঠিকঠাক মতো হয়েছে তো?'

'নিচু যে জমিগুলো বাকাত-কে বর্গা দেয়া হয়েছিলো...'

ইয়ামোকে থামিয়ে দিয়ে ইমহোটেপ বললো, 'খুটিনাটি সব কথা এখুনি আমি শুনতে চাই না। মোটামুটি সব ভালো শুনলেই আমি খুশি। আজকের রাতটা উৎসবের রাত। কাল কোনো এক সময় মোহন আর তোমাকে নিয়ে ব্যবসার কথা আলোচনা করবো। এসো সোনা-মানিক, আমার হাত ধরো,' ছোটো ছেলে আলাকে বললো সে। 'চলো বাড়িতে উঠি। আরে, তুমি দেখছি লম্বায় বাপকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছো...'

হাড়ি পানা চেহারা নিয়ে বাপ আর ছোটো ভাইয়ের পিছু নিলো সোবেক, পাশে ইয়ামো। ইয়ামোর কানে কানে সে বললো, 'বাক্স ভর্তি গহনা, শুনলে তো? দক্ষিণের জমিদারীর সমস্ত আয় ওসব কিনতেই বেরিয়ে গেছে। ওই আয়ে আমাদেরও অংশ ছিলো, কিন্তু

কে পেলো দেখো!'

'চুপ!' ফিসফিস করে বললো ইয়ামো। 'বাবা শুনতে পাবে।'

'পেলো তো বয়েই গেল। তোমার মতো অতো ভয় করি না আমি।'

ইমহোটেপ বাড়িতে ঢুকতেই, তার ঘরে উদয় হলো হেনেট। মনিবের গোসলের আয়োজন করেছে সে। তার বসন্তের দাগে ভরা মুখে হাসি আর ধরে না। ক্ষীণ অস্বস্তির ভাবটুকু কাটিয়ে উঠে ইমহোটেপ জানতে চাইলো, 'সত্যি কথা বলবে, হেনেট। কেমন হয়েছে আমার পছন্দ?'

'আমি ভাগ্যবতী, মালিক,' বললো হেনেট, 'এখনো একটা চোখ আছে আমার। কে জানে ভুবন আলো করা এই রূপ দেখবো বলেই হয়তো আছে চোখটা। জীবন আমার সার্থক হলো, হুজুর। কি আহা মরি চুল, আর কি চোখ ঝলসানো গায়ের রঙ। যার চোখ আছে সেই স্বীকার করবে, আমার মালিকের উপযুক্ত মেয়েই ঘরে এসেছে। হুজুর, আপনার বোন স্বর্গ থেকে সবই দেখছে, ভারি খুশি হবে সে।'

'সত্যিই কি খুশি হবে?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো ইমহোটেপ।

'অনেকগুলো বছর তার শোকে পাগল হয়ে ছিলেন আপনি,' বললো হেনেট। 'জীবনটাকে মধুর করার জন্যে এতোদিন পর তার বোন হিসেবে আর একজনকে ঘরে এনেছেন, নিশ্চই খুশি হবে সে।'

'তোমার কথা শুনে ভালো লাগছে, হেনেট। তুমি তাকে ভালো করে চিনতে। আচ্ছা, মানে, বাড়ির মেয়েরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বলে মনে হয় তোমার? নফরেতকে জ্বালাবে না তো?'

'যদি জ্বালায়,' বললো হেনেট, 'নিজের পায়েই কুড়ুল মারবে ওরা। এ-বাড়ির প্রত্যেকেই তো আপনার দয়ার ওপর বেঁচে আছে।'

'এই জন্যেই তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে, হেনেট,' সন্তুষ্ট দেখালো ইমহোটেপকে। 'শুধু তোমার মুখ থেকেই সত্যি কথা শুনতে পাই।'

'নিজে থেকে কেউ কিছু করবে, সে মুরোদ ওদের কারুরই নেই। আপনিই ওদের খেতে পরতে দেন, অসুখ হলে চিকিৎসা করান, নিজের বাড়িতে থাকতে দেন। ওদেরকে পুষতে না হলে একশো উপপত্নী কিনতে পারতেন আপনি, অন্তত এই কথাটা ওদের বুঝতে হবে।'

'ঠিক।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ইমহোটেপ। 'কিন্তু মাঝে মধ্যে ভাবি, ওরা যে আমার কাছে ঋণী, এই সহজ সত্যটা ওরা কি বোঝে?'

'আপনার উচিত বুঝিয়ে দেয়া,' ফিসফিস করে বললো হেনেট। 'আমার কথা যদি বলেন, মালিক, আপনার ঋণ আমি এ-জন্মে আর শোধ করতে পারবো না। আপনি আমাকে অন্ন দেন, আশ্রয় দেন, সে-কথা আমি কখনো ভুলি না। কিন্তু ছেলেদের কথা যদি বলেন, ওদের কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। ওরা নিজেদেরকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখে, আসলে যে শুধু আপনার বুদ্ধি মতো কাজ করে ফসল ফলাচ্ছে, সেটা সব সময় মনে রাখে না।'

'আমি তো বরাবর বলে এসেছি, তোমার চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো হেনেট। 'সে জন্যেই তো আমি খারাপ, মালিক।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ইমহোটেপের। 'কি ব্যাপার, হেনেট? কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না-না, তা নয়—আসলে বড় সংসার তো, বিশ্রাম পাওয়া যায় না, রাত দিন খাটতে হয়। কিন্তু দুঃখ শুধু এইটুকু যে কেউ যদি একটা মিষ্টি কথা বলতো। একটু ভালোবাসা, একটু সহানুভূতি· তাতেই সবকিছু বদলে যায়।' একটা হাত দিয়ে কপাল চাপড়ালো বুড়ি। 'নসিবে নেই, কি আর করা।'

'আর কারো দরদে তোমার দরকার কি,' বললো ইমহোটেপ, 'আমি এ-বাড়ির কর্তা, আমি তো তোমার ভালো-মন্দ সব দেখছি। তোমাকে তো বলেইছি, এটা যদি আমার বাড়ি হয়, এটা তাহলে তোমারও বাড়ি।'

'আপনি দয়ালু, হুজুর!' বিনয়ে কুঁজো বুড়ি আরো নত হয়ে পড়লো। একটু থেমে আবার বললো সে, 'দাসীরা আপনার গোসলের জন্যে পানি গরম করেছে। ওরা আপনাকে গোসল করাবে, কাপড় পরাবে। তারপর, মালিক, আপনি একবার আপনার মায়ের সাথে দেখা করে আসবেন।'

'ও, হ্যাঁ,' হঠাৎ অপ্রস্তুত দেখালো ইমহোটেপকে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি নিজেই যাবো ভাবছিলাম।'

সবচেয়ে সুন্দর লিনেনের পোশাকটা পরেছে এশা। চোখে ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক, তাকিয়ে আছে ছেলের দিকে। 'তাহলে একা ফিরিসনি, কেমন?'

মায়ের সামনে চিরকাল অস্বস্তি বোধ করে এসেছে ইমহোটেপ। জানে, তার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর মায়ের তেমন আস্থা নেই। আজকের

ব্যাপারটা আরো নাজুক। নফরেতকে নিয়ে আসার আগে মায়ের অনুমতি চাওয়া উচিত ছিলো। কাজটা যে ভুল হয়ে গেছে তা নয়। অনুমতি চাইলে পাওয়া যেতো না, সেজন্যেই চায়নি সে। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। তুমি তাহলে শুনেছো?'

'সবাই তো এই একটা কথা নিয়েই আছে, শুনবো না কেন,' বললো এশা। 'খুবই নাকি কম বয়স?'

'আঠারো-উনিশ হবে, একেবারে খুকী নয়।'

হেসে উঠলো এশা, সে হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরলো। 'তোর বুঝি আরো কম বয়েসের মেয়ে হলে ভালো হতো? ছি, ছি! এমন বোকামি তুই করলি কি করে!'

'মানে?' গলা চড়াতে গিয়েও পারলো না ইমহোটেপ। 'নফরেতকে নিয়ে এসে আমি কি অন্যায় করেছি? বউ না থাকলে মানুষ কি বউ আনে না?'

'অন্যায় কি না জানি না,' বললো এশা, 'তবে, বোকামি তো বটেই। অবশ্য সব পুরুষমানুষই এক জাতের, শেষ বয়সেই তাদেরকে বোকামিতে পায়।'

'এর মধ্যে তুমি বোকামির কি দেখলে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'মেয়েটাকে নিয়ে আসায় এই বাড়ির পরিবেশ কি দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখেছিস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো এশা। 'ভেবেছিস, হিমানী আর কেতী ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে? ওরা এখন ওদের স্বামীর পিছনে লাগবে, অশান্তির আগুন জ্বালবে ইয়ামো আর সোবেকের মনে। তার পরিণতি কি হতে পারে, কল্পনা করতে পারিস?'

'আমার বিয়ে করার সাথে তাদের কি সম্পর্ক ?' রেগে উঠলেও, নিজেকে শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ইমহোটেপ। 'কোন্ অধিকারে তারা আপত্তি জানাবে ?'

'অধিকার ? না, অধিকার নেই। যতো গণ্ডগোল তো সেখানেই।'

উত্তেজিত ভাবে পায়চারী শুরু করলো ইমহোটেপ। 'এটা আমার নিজের বাড়ি, নিজের খুশি মতো এখানে কি আমি কিছুই করতে পারবো না ? ছেলে-বউদেরকে কে খাওয়ায়, কে পরায়, কার দয়ায় বেঁচে আছে ওরা ? রুটির প্রতিটি কণার জন্যে ওরা আমার কাছে ঋণী, সে-কথা ওরা ভুলে থাকে কি করে !'

'ওরা ঋণী, কথাটা বলতে খুব ভালো লাগে তোর, না ?'

'সত্যি কথা বলবো না কেন ? ওরা আমার খাচ্ছে, পরছে, কিন্তু বললেই দোষ ?'

'ওরা কাজও করে, ইমহোটেপ।'

পায়চারী থামিয়ে মায়ের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো ইমহোটেপ। 'তুমি কি চাও ওদেরকে আমি কুঁড়ে হতে উৎসাহ দিই ?'

'ওরা, বিশেষ করে ইয়ামো আর সোবেক, ওদের বয়স হয়েছে,' বললো এশা। 'এবার না হয় ওদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দে···।'

এশাকে থামিয়ে দিয়ে ইমহোটেপ বললো, 'নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেবো ? কাকে ? সোবেকের কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি আছে ? যাই করতে দেয়া হোক, লেজেগোবরে করে ছাড়ে। শুধু মুখে ফটফট, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। আগুপিছু কিছু না ভেবে হুট করে একটা কাজ করে বসে, তাতে লোকসান দিতে হয় আমাকে। আর ইয়ামো, স্বীকার করি, আমার খুব বাধ্য ও। কিন্তু মাথা মোটা, একটা নির্দেশ একশোবার না দিলে কি বলছি বুঝতে পারে না। ওরা যদি উপযুক্ত হতো,

আমাকে এতো খাটতে হয়? আমার বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই, শুধু ব্যবসার পিছনে ঘুরছি, অথচ বাড়ি ফিরে যে একটু শান্তি পাবো, তার উপায় নেই। এমন কি তুমি, আমার মা, তুমিও আমার পিছনে লেগেছো।'

'আমি তোর পিছনে লাগিনি,' শান্ত সুরে বললো এশা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি কৌতুক বোধ করছি। বাড়িতে এখন অনেক কিছুই ঘটবে, সে-সব উপভোগ করার জন্যে তৈরি হচ্ছি। তোকে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে, ইমহোটেপ। সেটা হলো, আগুন জ্বালানো খুব সহজ, কিন্তু দেরি হয়ে গেলে নেভানো বড় কঠিন। কথাটা মনে রাখিস, তোর উপকারই হবে।'

'আর কিছু বলবে?'

কথা না বলে হাত নেড়ে ছেলেকে বিদায় হতে বললো এশা।

চার

জল প্লাবনের তৃতীয় মাস– পনেরো তারিখ

সোবেকের কথা চুপচাপ শুনে গেল ইমহোটেপ। তার চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠলো, কপালের পাশে একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফালো। কাঠের বিনিময়ে তেল না নিয়ে শণ নিয়েছে, প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু শণের বিনিময় হার হঠাৎ করে পড়ে যাওয়ায় কিছু লোকসান যাবে, এই কথাগুলোই ব্যাখ্যা করে বলছিলো সোবেক। সে থামতেই বাঘের মতো হুংকার ছাড়লো ইমহোটেপ, 'আমার হুকুম অমান্য করা হলো কেন? আমি বলে গেছি তেল নিতে, মাতব্বরি করে শণ নেয়া হলো কেন। যতো সব অপদার্থ, আমি না থাকলে একটা কাজও…'

'কিন্তু লাভের সম্ভাবনা দেখলে ঝুঁকি নেবো না? ঝুঁকি নিলে লোকসান তো হতেই পারে। আমি যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই…'

'তোর মাথায় আছেটা কি যে তুই ভাববি?' গর্জে উঠলো ইমহোটেপ। 'তোর উচিত ছিলো আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, তাহলে আর এই লোকসানটা আমাকে দিতে হতো না।'

'সারা জীবন শুধু তোমার নির্দেশ মেনেই চলবো আমরা ?' ফোঁস করে উঠলো সোবেক। 'নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুই কি করতে পারবো না ? আমরা আর ছোটো নেই, এটা তোমাকে এবার বুঝতে হবে।'

রাগে ফেটে পড়লো ইমহোটেপ। 'আমার খাবি, আমার পরবি, আমার হুকুম শুনবি না তো কি ? বানের পানিতে সব ভেসে গেলে জাহাজ ভর্তি করে কে তোদের জন্যে খাবার আনে ? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কে তোদের জন্যে রাতদিন গাধার খাটুনি খাটে। কার এই জমিদারী ? কার দয়ায় বেঁচে আছিস তোরা ? এতো করছি, কৃতজ্ঞতা বোধ তো দূরের কথা, আবার মুখে মুখে তর্ক করে। বেয়াদপ, বেশরম !'

'খাওয়াচ্ছো, পরাচ্ছো, কিন্তু বিনিময়ে কেনা গোলামের মতো খাটিয়ে নিতেও ছাড়ছো না,' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো সোবেক। 'লোকসানের কথা যদি বলো, সমস্ত আয় কে ওড়াচ্ছে ?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইমহোটেপ। 'মানে ? কি বলতে চাস ?'

'বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বসলে,' বললো সোবেক, থরথর করে কাঁপছে সে, 'তার জন্যে গহনা আর কাপড়চোপড় কিনে সব খরচ করে এসে এখন আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ছো···'

'হারামখোর ! বজ্জাত !' মেজো ছেলের দিকে এগিয়ে এলো ইমহোটেপ। 'চড়িয়ে আমি তোর সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো। জানিস, এখুনি আমি তোকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলতে পারি ? জানিস, বলতে পারি, তুই আমার ছেলে নোস ?'

'চিৎকার করো না,' বললো সোবেক, এখন আর কাঁপছে না সে। তার চেহারায় দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞার ভাব। 'বুঝেশুনে কথা বলো।

তা না হলে, বলতে হবে না, আমি নিজেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। একটা কথা মনে রেখো, আমার যদি হাত-পা বাঁধা না থাকে, ব্যবসা করে ছ'মাসেই প্রচুর কামাতে পারি।'

শেষ মুহূর্তে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো ইমহোটেপ। কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর কথা শেষ হয়েছে?'

'এই মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই আমার,' গম্ভীর স্বরে বললো সোবেক।

'তাহলে আমাকে একটু দয়া কর, যা, গরু-মোষগুলো দেখ। কুড়েমি করার সময় নয় এটা।'

রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো সোবেক। বারান্দায়, একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো নফরেত, তাকে দেখতে পায়নি সোবেক। থামটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একটা আওয়াজ শুনতে পেলো সে, 'হুহ্।' ঝট্ করে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো, ঠোঁট বাঁকা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে নফরেত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সোবেক, রাগে লাল হয়ে উঠলো মুখ। দেখলো এখন আর হাসছে না নফরেত। আধবোজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারায় নগ্ন ঘৃণা। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়লো সোবেক। বিড়বিড় করে কি যেন বলে নিজের পথে এগোলো সে।

তার পিছন থেকে খিল খিল করে হেসে উঠলো নফরেত। হাসতে হাসতেই বসার কামরায় ঢুকলো সে। ইমহোটেপ এখন বড় ছেলেকে একচোট নিচ্ছে।

'আমি জানতে চাই, সোবেক এতো স্বাধীনতা পেলো কিভাবে? তুমি কেন তাকে বাধা দাওনি? তোমাকে আমি বারবার সাবধান করে দিইনি, আমার কোনো ক্ষতি হলে তোমাকেই আমি দায়ী করবো!'

মিনমিনে সুরে ইয়ামো বললো, 'আমার অসুবিধেগুলো তোমাকে বুঝতে হবে, বাবা। আমার হাতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে কাউকে কোনো কাজ করতে বাধা দিই।'

'ক্ষমতা নেই? কেন, তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়ে যাইনি?'

'দায়িত্ব এক জিনিস, আর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব আরেক জিনিস,' বললো ইয়ামো। দরদর করে ঘামছে সে। 'কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্দেশ দেবো আমি? আমার অধিকার কোথায়? তোমার সাথে আমারও যদি জমিজমা আর ফসলের মালিকানা থাকতো, যদি এমন হতো যে…'

নফরেতকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল ইয়ামো। একটা হাই তুললো নফরেত, হাতের পপি ফুলটা একটু একটু করে ছিঁড়ছে। 'চলো না গো,' এগিয়ে এসে ইমহোটেপের কাঁধে একটা হাত রাখলো সে, 'লেকের ধার থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। গরমে আমার গা একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেল। ওখানে তোমার জন্য ফলমূল আর আঙুরের রস রাখা আছে…'

'যাবো, যাচ্ছি, এই হয়ে এলো…'

'ওদের পিছনে সময় নষ্ট করে লাভ কি,' অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টিতে ইয়ামোর দিকে তাকিয়ে বললো নফরেত। 'হুকুম মানে না, বেয়াদপি করে, অধিকার চায়—তুমি বলেই এসব সহ্য করো!'

অস্বস্তি বোধ করলো ইমহোটেপ। তাড়াতাড়ি বললো, 'তুমি যাও, নফরেত, আমি আসছি।'

'না,' কোমল সুরে আবদার ধরলো নফরেত। ইমহোটেপের কাঁধ খামচে ধরলো সে। 'চলো, এখুনি যেতে হবে তোমাকে…।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ইমহোটেপ। নববধূর দিক থেকে চোখ ফেরাতে

পারলো না। কিন্তু ইয়ামোর উপস্থিতিও ভুলে থাকতে পারছে না।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বারোটা বাজতে যাচ্ছে আশংকা করে ইয়ামো দ্রুত বললো, 'আগে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলে নিই আমরা। আমার একটা দাবি আছে। আমি চাই…'

ইমহোটেপের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল নফরেত। তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলো সে, 'তোমার নিজের বাড়িতে এভাবে তুমি অপমানিত হও? আমার ধারণা ছিলো…'

ছেলের দিকে ফিরে ইমহোটেপ বললো, 'ঠিক আছে. আরেক সময় আলাপ করা যাবে।' বলে আর দাঁড়ালো না সে, নফরেতকে নিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওদের গমন পথের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে ইয়ামো, এই সময় আরেক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো হিমানী। হেঁড়ে গলায় জানতে চাইলো, 'নিশ্চই বলতে পারোনি? ভয়ে কেঁচো হয়ে ছিলে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ইয়ামো। বললো, 'ধৈর্য ধরো, হিমানী। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা ভালো না।'

দপ করে জ্বলে উঠলো হিমানী। 'এমন স্বামীর ঘর করার চেয়ে বিষ খেয়ে মরাও ভালো। বউয়ের কথা ভাবে না, ছেলেপুলেদের কথা ভাবে না. ভবিষ্যৎ বোঝে না, এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম! ইচ্ছে হয় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ি! ভেড়া, ভেড়া, তুমি একটা আস্ত ভেড়া! তোমার সাথে বিয়ে না দিয়ে বাপ আমাকে জ্যান্ত কবর দেয়নি কেন! আমার মাথা ছুঁয়ে কিরে খেলো, বললো, বাবা ফিরলে প্রথম দিনই কথাটা তুলবো। আর এখন বলছে, ধৈর্য ধরো। ছি, বাপকে এতো যার ভয় তার আত্মহত্যা করা উচিত…।

'শুধু শুধু না জেনে চেঁচিয়ো না তো,' শান্ত সুরে বললো ইয়ামো।

'কথাটা আমি তুলেছিলাম, কিন্তু নফরেত এসে পড়ায় আলোচনা এগোতে পারলো না···।'

'নফরেত? ও, বুঝেছি, ওই মাগীই তাহলে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে নিয়ে গেছে তোমার বাপকে! তা তোমার বাপই বা কেমন, ছেলের সাথে কথা শেষ না করে মাগীর পিছু পিছু ছুটলো!'

'ছুটবে না!' বললো ইয়ামো। 'অমন সুন্দরী বউ···'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত চাপলো হিমানী। 'লাগছেই যখন, ভালো করেই লাগুক।'

'তারমানে?'

হেসে উঠলো হিমানী। 'এসব আমাদের মেয়েলি ব্যাপার, তুমি বুঝবে না। আমার বা কেতীর নামে নফরেত শ্বশুরের কাছে অভিযোগ করবে সে-ভয় করো না। আমরা এমন কিছু করবো না, যাতে মাগী সে-সুযোগ পায়। কিন্তু ··' কথা শেষ না করে অর্থপূর্ণ একটু হাসলো সে।

'কিন্তু মানে?'

'তোমার বাপ তো আর সব সময় এখানে থাকবে না,' বললো হিমানী। 'তখন দেখবো, নফরেত কতো বাড় বাড়তে পারে।'

'হিমানী!'

জবাবে কর্কশ সুরে খিলখিল করে হেসে উঠলো হিমানী। হাসতে হাসতেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

লেকের ধারে, গাছের ছায়ায় বসে খেলাধুলো করছে ছেলেপুলেরা। ইয়ামোর দুই ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেগুলো মায়ের চেহারা পেয়েছে, মেয়েটা বাপের। সবচেয়ে বড়টার বয়স আট। সোবেকেরও তিন

ছেলে-মেয়ে, শেষেরটা ছেলে। বড় মেয়ের বয়স সাত। ওদের সাথে কামিনীর মেয়ে তানিও রয়েছে। ছুটোছুটি করে খেলছে ওরা, মহা-হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে।

কাছেই ছোটো একটা বাগান. বাগানের মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণ খোলা একটা কামরা। কামরাটা অনেক শখ করে তৈরি করেছে ইমহোটেপ, গরমের দিনে এখানে বসে হাওয়া খাবে বলে। আজ অনেকদিন পর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা, এই মুহূর্তে কামরার ভেতর খাটের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ইমহোটেপ, হাতে আঙুরের রস ভর্তি পাত্র। পাশেই, তার গা ঘেঁষে বসেছে নফরেত। বুড়ো স্বামীর পাকা চুল বেছে বের করছে সে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই সে অগ্নিদৃষ্টি হানছে লেকের দিকে, যেখানে খেলাধুলো করছে ছেলেমেয়েরা।

হঠাৎ ইমহোটেপের বুকে হাত বুলাতে শুরু করলো সে। বললো, 'তোমার পায়ে ঠাঁই পেয়েছি, এ আমার সাতজন্মের ভাগ্য, ইমহোটেপ। আমি তোমার কাছে চির ঋণী।' একটু থেমে জানতে চাইলো, 'তোমার এই ঋণ আমি শোধ করবো কিভাবে গো?'

হেসে উঠলো ইমহোটেপ। দু'ঢোক আঙুরের রস খেয়ে বললো, 'নাগালের মধ্যে তোমার এই রূপ আর তোমার এই যৌবন রয়েছে, কাজেই ঋণ শোধ করার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

লজ্জা পাবার ভান করে মুখে ওড়না চাপা দিলো নফরেত। তারপর ইমহোটেপের গাল টিপে দিয়ে বললো, 'তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার সেবা করবো, তোমার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবো তবেই যদি কিছুটা ঋণ শোধ হয়। এতে কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

ইমহোটেপ বললো, 'বেশ তো।'

'কিন্তু এ-বাড়ির অনেক ব্যাপারই আমার পছন্দ নয়...'

'কি রকম?'

নফরেত লেকের দিকে ইমহোটেপের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, 'যেমন দেখো, ওরা ওখানে গোলমাল করছে। ওদের মা-বাপের বোঝা উচিত, বাড়ির কর্তা বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে।'

'কি জানো, বাচ্চাকাচ্চারা ওখানেই বরাবর খেলাধুলো করে আসছে...'

নফরেত ইমহোটেপের বুক থেকে হাত তুলে নিলো। বললো, 'কিন্তু আমার স্বামীর আরাম-আয়েশের দিকে আমাকেই তো লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি যাই, ওদেরকে অন্য কোথাও গিয়ে খেলতে বলি।' ইমহোটেপের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে খাট থেকে নেমে পড়লো সে, বেরিয়ে এলো কামরা থেকে।

লেকের পানিতে একটা বল ফেলে খেলছে চখা, তার মা কেতীও ছেলের সাথে রয়েছে। নফরেত ওদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। 'এই যে, গরবিনী, বলি শুনছো?'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো কেতী।

'নাহয় অনেকগুলো বাচ্চা বিইয়েছো, তাই বলে কি এই বাড়ির মালিকানা পেয়ে গেছো?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলো নফরেত। 'হুঁশ নেই, বাড়ির কর্তা এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে? যাও, শয়তানগুলো-কে নিয়ে ভাগো এখান থেকে।'

কথা না বলে লেকের পাড় থেকে ছেলেকে নিয়ে উঠে এলো কেতী। ছেলের হাত ধরে হন হন করে এগোলো সে, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। সোজা বাগানে ঢুকে কামরার দিকে এগোলো। চাপা

গলার হাসি শুনে বুঝতে পারছে, পিছু পিছু নফরেতও আসছে।

শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়ালো কেতী। 'ছেলেমেয়েরা তো বরাবর ওখানেই খেলাধুলো করে আসছে, আপনি নিষেধ করেননি। আজ কেন নিষেধ করছেন?'

'কেন নিষেধ করছি, তোমাকে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ইমহোটেপ। 'আমার আরাম-আয়েশের দিকে তোমাদের কারো কোনো নজর নেই। অথচ তোমরা বেঁচেই আছো আমার দয়ায়। এবার অন্তত দেখেও শেখো একটু। নফরেত মাত্র ঢুকেছে বাড়িতে, কিন্তু আমার আরাম-আয়েশ ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই ওর।'

'আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে, কথাটা ওকে দিয়ে না বলিয়ে আপনি নিজে বললেই তো পারতেন,' বললো কেতী। 'ওরা যারা ওখানে খেলছে তাদের শরীরে আপনার রক্ত আছে, ওই মেয়েলোক-টার কথায় আপনি যদি ওদের বিরুদ্ধে চলে যান, সেটা আপনার ভুলই হবে।'

'কি, এতো বড় স্পর্ধা! আমাকে জ্ঞানদান করতে আসো তুমি!' বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসলো ইমহোটেপ। রাগে কাঁপছে সে। 'স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে আমার বিরুদ্ধে লাগা হয়েছে, না? অকৃতজ্ঞ, বেঈমান! এখনো সাবধান হও, তা না হলে তোমাদের আর পুষতে পারবো না বলে জানিয়ে দেবো। সোবেক ভয় দেখাচ্ছিল, চলে যাবে, তাই যাক না। বলে দিয়ো, তোমাকে আর ছেলে-মেয়ে-গুলোকেও যেন নিয়ে যায়। যাও, সরে যাও আমার সামনে থেকে। আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকলো কেতী, তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো সে। নফরেতকে পাশ কাটাবার সময় শান্ত, নিচু গলায় বললো সে, 'এর জন্যে তুমি দায়ী, নফরেত। আমি ভুলবো না।'

পাঁচ

জল প্লাবনের চতুর্থ মাস—পাঁচ তারিখ

আনুষ্ঠানিক আচারাদি শেষ করে পরম সন্তুষ্টির নিঃশ্বাস ফেললো ইমহোটেপ। রীতি মাফিক অনুষ্ঠানের প্রতিটি নিয়ম, খুটিনাটি সহ, নিখুঁত ভাবে পালন করা হলো। পুরোহিত হিসেবে ইমহোটেপ অমানুষিক খাটতে পারে। আচারাদি পালনে তার গাফলতি হয় না, আপোষ করতেও জানে না সে। তপর্ণ, অর্থাৎ মদ আর জলদান করতেই ঘণ্টাখানেক লেগে গেল তার। ধুপ জ্বাললো ঘটা করে। তারপর প্রথা অনুসারে সমাধিতে দান করলো পোশাক, অলংকার আর খাবারদাবার।

পাশের ঠাণ্ডা পাথুরে গুহায় খানিক বিশ্রাম নেয়ার পর আবার জমিদার এবং ব্যবসায়ী হয়ে উঠলো ইমহোটেপ। লোকজন সব বিদায় হয়েছে, রয়ে গেছে শুধু মোহন। তার সাথে ফসলের বিনিময় হার, তেলের মউজুদ, গরু-মোষের প্রজনন এবং ব্যবসায়িক আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। আধ ঘণ্টা পর সন্তুষ্টচিত্তে মাথা

ঝাঁকালো ইমহোটেপ। বললো, 'তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি আমার বিশ্বস্ত সহকারী, মোহন। তুমি না থাকলে কি যে করতাম, জানি না।'

মোহনের প্রশান্ত চেহারায় মৃদু একটু হাসি ফুটলো, সে কোনো মন্তব্য করলো না।

'এবার,' বললো ইমহোটেপ, 'পারিবারিক একটা সমস্যা। আলার অভিযোগ, তাকে নাকি অবহেলা করা হচ্ছে। সে চায় তাকে আমি কিছু ক্ষমতা দিই...'

'কিন্তু ও তো এখনো ছোটো।'

ইমহোটেপ বললো, 'হ্যাঁ। কিন্তু বয়সের তুলনায় কেউ যদি বেশি যোগ্যতা দেখায়, তার দিকে নজর ফেরাতে হয়। ও বলছে, ভায়েরা ওকে পাত্তা দেয় না। তারা নাকি ওর ওপর অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। ওর চোখে সোবেক হলো কথার রাজা, আর ইয়ামো ভীতুর ডিম—আমি ওর সাথে একমত। ও বলছে, ওদের চেয়ে দুরদৃষ্টি তার বেশি, ব্যবসার ব্যাপারে যে-সব কথা আগে-ভাগে বলেছিলো সব নাকি ফলে গেছে। তাহলে কেন তাকে কিছু কিছু দায়িত্ব আর কর্তৃত্ব দেয়া হবে না?'

সাথে সাথে কিছু বললো না মোহন। খানিক পর জিজ্ঞেস করলো, 'মন খুলে কথা বলতে পারি তো, ইমহোটেপ?'

'অবশ্যই।'

'তুমি যখন এখানে থাকো না,' বললো মোহন, 'তখন কাজ চালাবার জন্যে কোনো একজনের হাতে সত্যিকার কর্তৃত্ব থাকা দরকার।'

'আমার বাধ্য বলতে তুমি আর ইয়ামো, তোমাদেরকেই আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি...'

'তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা কাজ করি বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের হাতে থাকে না,' বললো মোহন। 'তোমার উচিত ছেলেদের কাউকে নিজের ক্ষমতার খানিকটা ছেড়ে দেয়া। ওদের কাউকে তুমি অংশীদার হিসেবেও নিতে পারো, পারো না?'

ইমহোটেপ যে রেগে উঠলো তা নয়, উঠে পায়চারী শুরু করলো সে। 'কার নাম প্রস্তাব করো তুমি? সোবেকের নেতৃত্ব দেয়ার গুণ আছে বটে, কিন্তু হাতে ক্ষমতা পেলে কাউকে সে মানবে না···এখনি সে আমার বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়। উঁহুঁ, তাকে আমি বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিতে পারি না।'

'আমি ইয়ামোর কথা ভাবছিলাম,' বললো মোহন। 'সেই তোমার বড় ছেলে। ভদ্র, নম্র, পরিশ্রমী···'

'সবই সত্যি, কিন্তু কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস তার নেই, কোনো কালে হবেও না। যে যা বলে তাই শোনে সে। নিজস্ব মতামত বলতে কখনো কিছু দিতে পারে না।' একটু থেমে প্রশ্ন করলো, 'আলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'এই বয়সের কারো হাতে কর্তৃত্ব দিলে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'

'হুঁ, তা সত্যি,' বললো ইমহোটেপ। 'ঠিক আছে, ভেবে দেখি। ইয়ামো ভালো ছেলে, তার ওপর আমার আস্থা আছে।'

'যাই করো, বুদ্ধি খাটিয়ে করো,' বললো মোহন।

ভুরু কুঁচকে তাকালো ইমহোটেপ। 'ঠিক কি ভাবছো বলো তো?'

'এইমাত্র বললাম, কম বয়েসী কাউকে ক্ষমতা দেয়া বিপজ্জনক।

কিন্তু খুব বেশি দেরি করে দেয়াটাও কম বিপজ্জনক নয়।'

'বুঝেছি। হুকুম মানতে মানতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে হুকুম দেয়াটা তার আর শেখা হবে না। ঠিক, তোমার কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইমহোটেপ। 'কি জানো, একটা পরিবারকে ঠিক রাখা একটা রাজ্য ঠিক রাখার চেয়েও কঠিন। বিশেষ করে মেয়েদেরকে শাসনে রাখা খুবই মুশকিল। হিমানীর মেজাজ·· মেজাজ তো নয়, গনগনে আগুন। আর কেতী আদব কায়দা জানে না, সব সময় মুখ হাঁড়ি করে আছে। আমি কিন্তু ওদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, নফরেতের পিছনে লাগা চলবে না। তাকে তার প্রাপ্য সম্মান, অধিকার সব দিতে হবে। বাড়ির কর্তা হিসেবে···'

গুহামুখের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল ইমহোটেপ। সরু পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে আসছে একজন ক্রীতদাস। কাছে এসে থামলো লোকটা, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'কর্তা, একটা জাহাজ এসেছে! কোহি নামে একজন কেরাণী মেম্ফিস থেকে খবর এনেছে।'

'সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা,' গুহামুখের দিকে পা বাড়িয়ে বললো ইমহোটেপ। 'যেখানে আমি নেই সেখানেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। নিশ্চই ওখানেও কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে।' তাড়াহুড়ো করে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো মোহন। চিন্তিত দেখালো তাকে।

ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে শুনেই সবার সাথে নদীর দিকে ছুটলো কামিনী। ওরা যখন পৌঁছুলো, মাত্র নোঙর ফেলেছে জাহাজ। সুদর্শন এক যুবককে ঘাটে নামতে দেখা গেল। তাকে দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো কামিনীর বুক। মনে হলো, মৃত্যুপুরী থেকে আবার তার

কাছে ফিরে এসেছে প্রাণপ্রিয় কাসিন। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙলো—না, এর বয়স আরো কম, কাসিনের চেয়ে একটু বেশিই হবে লম্বায়। ঘাটের মাথায় উঠে এসে যুবক তাদের জানালো, তার নাম কোহি, সে একজন কেরাণী, কর্তা ইমহোটেপের ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব দেখাশোনা করে, এসেছে মেম্ফিস থেকে। একজন ক্রীতদাসকে পাঠানো হলো ইমহোটেপকে খবর দেয়ার জন্যে, কোহিকে বাড়িতে নিয়ে এসে তার সামনে রাখা হলো খাবারদাবার আর মদ। খানিক পরই পৌঁছুলো ইমহোটেপ। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলো দু'জন।

আলোচনার বিষয়বস্তু মেয়ে মহলে পৌঁছুতে দেরি হলো না। হেনেটই জানালো সব। কোহি আসলে ইমহোটেপের দূর সম্পর্কের এক ভায়ের ছেলে, অনেকদিন থেকে ইমহোটেপের চাকরি করছে। মেম্ফিস থেকে ইমহোটেপ চলে আসার পর লাভ লোকসানের হিসাবে বড় ধরনের একটা ফাঁকি ধরা পড়ে তার চোখে। ব্যাপারটা এতোই মারাত্মক যে চিঠি লিখে জানানোর চেয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে জানানোটাই ভালো বলে মনে করেছে সে। শোনা গেল, ফাঁকিটা ধরতে পারায় ইমহোটেপ তার দারুণ প্রশংসা করেছে।

সিদ্ধান্ত হলো, কালবিলম্ব না করে রওনা হবে ইমহোটেপ। ইচ্ছে ছিলো আরো মাস দু'য়েক এখান থেকে নড়বে না, কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করার পর ঘরে আর বসে থাকতে পারে না সে।

বাড়ির সবাইকে দরবার ঘরে ডাকা হলো। কার কি কাজ না কাজ সব বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিতে শুরু করলো ইমহোটেপ। প্রত্যেকের অধিকার এবং ক্ষমতার একটা করে সীমারেখা টেনে দিতেও ভুল করলো না সে।

আলাকে বললো, 'তোমার যা বয়স, তাতে তুমি আলাদা ভাতা পেতে পারো না। ইয়ামোর কথামতো চলতে হবে তোমাকে। ইয়ামো আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর নির্দেশ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে। সোবেক, আর কোনো ঝুঁকি তুমি নেবে না।'

ইয়ামোকে বলা হলো, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। ঘুরে এসেই তোমাকে অংশীদার করে নেয়ার ব্যাপারে আবার আমরা কথা বলবো।'

ইয়ামো যে সাংঘাতিক খুশি হয়েছে সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

ইমহোটেপ বলে চললো, 'তুমি শুধু একটা ব্যাপারে নজর রাখবে, আমি না থাকলেও সব যেন ঠিকঠাক মতো চলে। নফরেতের ভালো-মন্দের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। ওকে কষ্ট দেয়া হলে, আমি সেটা জানতে পারবো। যে তাকে কষ্ট দেবে তার শাস্তি তো সে পাবেই, তোমাকেও রেহাই দেয়া হবে না। লক্ষ্য রাখবে, হিমানী যেন তার জিভটাকে সামলে রাখে। লক্ষ্য রাখবে, সোবেক যেন কেতীকে শাসন করে। কামিনী··· তাকেও নফরেতের সম্মান রেখে চলতে হবে। এরপর আমি হেনেটের কথা বলবো। হেনেট আমার স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সে শুধু বিশ্বস্ত নয়, আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষিও বটে। তার ওপর অন্যায় করা হলে আমি সেটা কোনো অবস্থাতেই সহ্য করবো না।'

'সবই তোমার কথা মতো করা হবে,' বললো ইয়ামো, 'কিন্তু হেনেট মাঝে মধ্যে এমন বিচ্ছিরী ভাষায় ঝগড়া শুরু করে···'

'ধ্যেৎ! মেয়েলোক মাত্রই ঝগড়াটে। হেনেটের চেয়ে ঝগড়াটে মেয়েলোকও এ-বাড়িতে আছে। এবার কোহির ব্যাপারে বলি।

মোহনকে সাহায্য করার জন্যে এখানে থাকছে সে।'

ইয়ামো, মোহন আর কোহিকে আরো কিছু নির্দেশ দিলো ইম-হোটেপ, সবই ব্যবসা সংক্রান্ত। যখন রওনা হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, নফরেতকে আড়ালে ডেকে আবার সে জানতে চাইলো, 'ভেবে দেখো, আমি থাকবো না, তোমার এখানে থাকতে খারাপ লাগবে না তো?'

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নেড়ে নফরেত বললো, 'নিজের ঘর-সংসার ফেলে কোথাও আমি যাবো না। তুমি তো আর বেশিদিন বাইরে থাকবে না।'

'তিন মাস...চারমাসও হয়ে যেতে পারে—কি করে বলি!'

'না,' হাসতে হাসতে বললো নফরেত। 'আমি থাকবো।'

'ইয়ামোকে কড়া হুকুম দিয়েছি, তোমাকে কষ্ট দেয়া হলে তাকে দায়ী করা হবে। তোমার আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, রোগ-শোক, সব সে দেখবে। তোমার ওপর অন্যায় করা হলে, সে যেই হোক, আমি তার গর্দান নেবো।'

'কিন্তু···কিন্তু তুমি বরং বলে যাও, কাকে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করবো।' নিচু গলায় জানতে চাইলো নফরেত। 'এমন এক-জন যে পরিবারের কেউ নয়।'

'মোহনকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, সে আমার বন্ধু এবং শুভা-কাঙ্ক্ষি।'

'সে যদিও পরিবারের কেউ নয়, কিন্তু পরিবারের একজনই হয়ে গেছে,' বললো নফরেত। 'আর কেউ নেই?'

'কোহি আছে। সে-ও একজন লেখক। তোমার কোনো অভিযোগ থাকলে, তাকে বলবে, সে আমাকে সব কথা চিঠি লিখে জানাবে।'

বললো ইমহোটেপ।

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকালো নফরেত। 'ভালোই হলো। কোহি মেম্ফিস থেকে এসেছে। আমার বাবাকে ভালো করে চেনে সে। এই পরিবারের দিকে তার কোনো রকম অন্যায় টান থাকবে না।'

'তাছাড়া,' বললো ইমহোটেপ, 'হেনেটও আছে। তাকেও তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো।'

'তাহলে,' আবদার ধরলো নফরেত, 'ডাকাও ওকে, আমার সামনে কথা বলো ওর সাথে।'

কর্তার ডাক পেয়েই ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো হেনেট। এসেই সে তার দুঃখের গীত গাইতে শুরু করে দিলো—কর্তা চলে যাচ্ছেন, বিচ্ছেদ বেদনায় তার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাকে থামিয়ে দিয়ে ইমহোটেপ বললো, 'হেনেট, তুমি তো জানো, নফরেত আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়…'

'মালিক,' ইমহোটেপের কথা কেড়ে নিয়ে হেনেট বললো, 'আপনার কাছে যে প্রিয়, আমার কাছেও সে প্রিয়, আমি তার কেনা বাঁদী।'

'নফরেতের ভালো করা হলে আমারও ভালো করা হবে,' বললো ইমহোটেপ। 'আমি চাই ওর সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখবে তুমি। ওর কথামতো চলবে।'

ঢুলু ঢুলু চোখে হেনেটের দিকে তাকিয়ে আছে নফরেত। হেনেটও এবার তার দিকে তাকালো। বললো, 'সুন্দরী লো, তোর রূপ আগুনের মতো, বিপদটা হলো সেখানেই। সেজন্যেই তো ওরা সবাই তোকে দেখতে পারে না—ঈর্ষায় জ্বলে। কিন্তু আমি যতোক্ষণ এ-বাড়িতে আছি, তোর কোনো চিন্তা নেই। ওরা কে কি বলে, কে কি করে, সব তোকে আমি বলে সাবধান করে দেবো। তুই আমার ওপর

ভরসা রাখতে পারিস।'

এরপর বেশ খানিকক্ষণ কথা না বলে, নফরেত আর হেনেট পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো।

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারিস,' আবার বললো হেনেট।

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় বললো নফরেত, 'বুঝেছি, হেনেট। বুঝতে পেরেছি।' তার ঠোঁটে বিড়ালের মতো বাঁকা একটু হাসি ফুটলো, সাথে সাথে মিলিয়েও গেল সেটা।

কর্কশ আওয়াজ করে গলা পরিষ্কার করলো ইমহোটেপ। 'তোমার তাহলে আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ থাকলো না, কি বলো, নফরেত?'

তীক্ষ্ণ একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। ওরা তিনজনই ঝট্ করে ফিরলো দরজার দিকে। দোরগোড়ায় জননীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চুপসে গেল ইমহোটেপ, যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

'আমার ছেলের বুদ্ধি দেখো।' বললো এশা, ঘরের ভেতর ঢুকলো সে।

ইমহোটেপ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'মোহনের সাথে কথা বলতে হবে, আর তো দেরি করতে পারি না!' বলে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। এশার ইঙ্গিত পেয়ে হেনেটকেও বেরিয়ে যেতে হলো।

নফরেতের সামনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধা এশা। 'কাজটা তুমি ভালো করছো না, নফরেত। ইমহোটেপের সাথে ঘুরে আসাই উচিত তোমার। শহরে মানুষ হয়েছো, এখানকার একঘেয়েমি তোমার ভালো লাগবে না।'

'আমাকে এসব কথা বলবেন না,' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো নফরেত। 'আপনার ছেলে চায় আমি এখানে থাকি।'

'তুমি জেদ ধরো, তাহলে সে তোমাকে রেখে যেতে পারবে না,' বললো বৃদ্ধা। 'ভালো-মন্দ আমি বুঝি বলেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ইমহোটেপের সাথে তুমিও চলে যাও।'

'এমন ভাবে কথা বলছেন,' বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো নফরেত, 'আপনি যেন আমার শত্রু।'

'শত্রু আমি কারো নই,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো বৃদ্ধা। 'বুঝতে পারছি, এখানে থেকে যাবার পিছনে তোমার কোনো উদ্দেশ্য আছে। কি জানি কি সেটা। ঠিক আছে, ভুগলে তোমাকেই ভুগতে হবে। কিন্তু সাবধান থেকো। নিজেকে সংযত রাখবে। আর, কাউকে বিশ্বাস করবে না।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল এশা।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো নফরেত। আধবোজা চোখ, ঠোঁটে হাসি। হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

ছয়

শীতের প্রথম মাস—চার তারিখ

রোজই একবার করে সমাধিপ্রাঙ্গণে আসা চাই কামিনীর। কখনো এখানে ইয়ামো আর মোহন থাকে, কখনো মোহন একা থাকে, আবার কোনো কোনো দিন কেউ থাকে না। এখানে এসে স্বস্তি আর শান্তি পায় ও, অনেকটা যেন নরক থেকে পালিয়ে আসতে পারার অনুভূতি হয়। সবচেয়ে ভালো লাগে মোহন যখন একা থাকে। তার প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে—হঠাৎ করে ওর উদয় হওয়াটাকে কৌতূহল ছাড়াই মৃদু হাসির সাথে মেনে নেয়া, ওর মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির ভাব এনে দেয়। পাথুরে গুহার মুখে, ছায়ার ভেতর হাঁটু ভাঁজ করে বসে ও, হাত দুটো সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাকিয়ে থাকে পাহাড়ের নিচে, যেখানে ঘন সবুজ হয়ে আছে ক্ষেতগুলো, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কানায় কানায় ভর্তি নীলনদ। দূরে পাহাড়, কোথাও ধূসর, কোথাও কালচে।

এই রকম একদিন এসেছে কামিনী, দেখলো, মোহন একা রয়েছে।

তাকে ও বললো, 'মোহনদা, আমার ভয় করছে···।'

মোহনের প্রশান্ত চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটলো। 'কিসের ভয়, কামিনী ?'

'বাড়ির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আমার একদম ভালো লাগছে না,' বললো কামিনী। 'নফরেত আসার পর···মানে, আগের সেই পরিবেশ আর নেই।' কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্যে একটু সময় নিলো ও। 'আমি ফিরে আসার পর দেখলাম, হিমানী আর কেতী সেই আগের মতোই ঝগড়া করছে বটে, কিন্তু সেটা সত্যিকার ঝগড়া ছিলো না। ওরা ব্যাপারটাকে উপভোগ করতো। সময় কাটানোর একটা উপায় ছিলো ওটা। যতোই ঝগড়া করুক, কেউ কারো বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ রাগ পুষে রাখতো না। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা তা নেই।'

'কি রকম ?'

'এখন ওরা যা করে, ক্ষতি করার জন্যেই করে,' বললো কামিনী। 'যা বলে, আঘাত দেয়ার জন্যেই বলে। কাল কি একটা ব্যাপারে বড় ভাবী এমন রাগাই রাগলো, মেজো ভাবীর হাতে সুঁই ঢুকিয়ে দিলো। দু'দিন আগে মেজো ভাবী কি করেছে জানো ? বড় ভাবীর পায়ের ওপর ফুটন্ত এক মগ পানি ঢেলে দিয়েছে।'

'হুঁ।'

'সারারাত বড় ভাবী গালমন্দ করে বড়দাকে,' বললো কামিনী। 'আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। বড়দার চেহারা কি হয়েছে, দেখেছো ?, মনে হয়, ঘাড়ে যেন ভূত সওয়ার হয়েছে। ওদিকে, মেজদা পর পর দু'রাত বাড়ি ফেরেনি, পাশের গ্রামে দুটো খারাপ মেয়ের সাথে ছিলো, ফিরলো বেহেড মাতাল হয়ে। তখন যদি তার মাতলামি

দেখতে তুমি।'

'এসব আমি জানি,' বললো মোহন। 'কিন্তু নফরেতকে তুমি দুষছো কেন?'

'যা কিছু ঘটছে,' বললো কামিনী, 'দেখা যাবে, হয় তার একটা মন্তব্য, না হয় তার একটু বিচ্ছিরী হাসিই সেজন্যে দায়ী। ভীষণ চালাক, সেই যে সবাইকে উসকে দিচ্ছে খেয়াল করে না থাকলে কারো চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়বে না। দেখা যাচ্ছে, কে কাকে কি বলেছে না বলেছে সবই তার জানা। আমার হেনেটকেই সন্দেহ হয়।'

'হতে পারে।' চিন্তিত হলো মোহন।

'হেনেটের কথা আর কি বলবো। আমাদের সবার জন্যে এতো করে সে, কিন্তু আমরা কেউ তার এই উপকার চাই না। বিড়ালের মতো হাঁটে, টেরও পাওয়া যায় না কখন ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাকে ভালো লাগে, সারাদিন তার সাথে ফিসফিস ফিসফিস। ভেবে পাই না মা এই মেয়েলোকটাকে এতো ভালোবাসতো কিভাবে!'

'জানছো তো শুধু হেনেটের মুখ থেকে,' বললো মোহন।

'কি করছে বুড়ি, শুনবে? নফরেতকে খাটে বসিয়ে রোজ দু'বেলা গরম পানি দিয়ে তার হাত ধুয়ে দিচ্ছে,' বললো কামিনী। 'বাবা তো বলেই গেছে, হেনেট তার খুব প্রিয়। সেই হেনেটের কাছ থেকে এ-রকম ভক্তি পেলে নফরেতই বা মাথায় চড়বে না কেন? ফিসফিস করে সারাদিন কথা বলছে ওরা। বাবার উচিত ছিলো নফরেতকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া। মেয়েটা মোটেও ভালো না…'

'ওই দেখো, আসছে ও…।'

ঘাড় ফেরালো কামিনী। দেখলো, সরু পাহাড়ী পথ ধরে ওদের দিকে উঠে আসছে নফরেত। আপনমনেই হাসছে সে, গুণগুণ করে

গান গাইছে। কাছাকাছি এসে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে কামিনীর চোখে চোখ রেখে হাসলো, সবজান্তার মতো নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো কয়েক বার। বললো, 'বুঝেছি, রোজ তাহলে এখানেই তোমার পালিয়ে আসা হয়।' কথাটা বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মোহনের দিকে একবার তাকালো সে। তারপর বললো, 'এই তাহলে তোমাদের সেই বিখ্যাত সমাধি!'

কামিনী কথা বললো না। মোহন বললো, 'হ্যাঁ।'

মোহনকে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো নফরেত। তার চোখ বড় বড়, কিন্তু সব সময় আধবোজা হয়ে আছে। 'সমাধি থেকে তুমি খুব লাভ পাও, তাই না? শুনেছি, হিসাবে আর ব্যবসায় তোমার মাথা নাকি দারুণ ভালো।'

নফরেতের হাসির মধ্যে ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ থাকলেও, গায়ে মাখলো না মোহন, বললো, 'আমরা সবাই লাভবান হই···মৃত্যু সব সময়ই কিছু এনে দেয়।'

নিজের চারদিকে দ্রুত আরেকবার তাকালো নফরেত। শিউরে উঠলো সে। উপহার আর বলি দেয়ার টেবিলের দিকে কয়েত মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো দৃষ্টি, বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। তার-পর হঠাৎ করেই চিৎকার করে বললো, 'মৃত্যুকে আমি ঘেন্না করি!'

'সেটা তোমার ভুল,' শান্ত সুরে বললো মোহন। 'আমাদের এই মিশরে সম্পদের প্রধান উৎসই তো মৃত্যু। মৃত্যুই তোমার গায়ের গহনা এনে দিয়েছে, নফরেত। মৃত্যু তোমাকে খাওয়ায়, তোমাকে পরায়।'

হতভম্ব হয়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে থাকলো নফরেত। 'তার-মানে?'

'কেন, তুমি জানো না, ইমহোটেপ একজন পুরোহিত ?' জিজ্ঞেস করলো মোহন। 'এখানে যতো জমি দেখছো, যতো পশু দেখছো, যতো কাঠ, বালি, আর শণ দেখছো সবই তো সমাধিতে দান করা…'

নফরেত যেন বোবা হয়ে গেছে।

'আমরা খুব অদ্ভুত মানুষ, আমরা মিশরীয়রা,' বললো মোহন। 'জীবনকে আমরা ভালোবাসি, আর তাই জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মৃত্যুকে সম্মান দেখাবার জন্যে প্রস্তুতি নেই। মিশরের সমস্ত সম্পদই তো ওখানে যায়—পিরামিডে বা সমাধিতে।'

'চুপ করো!' আতংকে নীল হয়ে গেছে নফরেতের ফর্সা চেহারা। 'এসব আমি শুনতে চাই না। মৃত্যুকে আমি ঘেন্না করি!'

'তার কারণ তুমি সত্যিকার একজন মিশরীয়,' শান্ত, নিচু গলায় বললো মোহন। 'কারণ জীবনকে তুমি ভালোবাসো। আর তাই, মাঝে মধ্যে তুমি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাও…'

'থামো!' ঘুরে দাঁড়ালো নফরেত, কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে, তারপর ফিরতি পথ ধরে হন হন করে এগোলো।

'চলে যাচ্ছে সেজন্যে আমি খুশি,' বললো কামিনী। 'তুমি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো।'

'হ্যাঁ…তুমি ভয় পাওনি তো, কামিনী ?'

'ন্না।' খানিকটা অনিশ্চিত দেখালো কামিনীকে। 'তবে কথাটা আগে কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি। মৃত্যুকে নিয়েই বাবার কারবার, আমাদের আয়ের একটা প্রধান উৎস মৃত্যু।'

'গোটা মিশরই মৃত্যু ভয়ে দমে আছে। কারণটা কি জানো, কামিনী ? আমাদের চোখ রয়েছে আমাদের শরীরে, মনে নয়।

এই জীবনটা, মৃত্যুর আগের জীবনটা, এটা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমরা, আর কিছু ধারণা করতে পারি না। আমরা যা জানি, শুধু তার ধারাবাহিকতাটা কল্পনা করতে পারি। সত্যিকার অর্থে দেবতার ওপর বিশ্বাস রাখি না…'

অবাক বিস্ময়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে থাকলো কামিনী। 'কি করে তুমি এ-কথা বলছো, মোহনদা! কেন, দেবতার সংখ্যা কি আমাদের কম? সবার নামও জানা নেই আমার। এই তো, কাল রাতেই আমরা আলোচনা করছিলাম, কে কোন্ দেবতার ভক্ত। মেজদা বললো, শাকমেতের ওপর তার সবচেয়ে বেশি আস্থা। আর মেজো ভাবী আপদে বিপদে শুধু মেসথান্তকে ডাকে। কোহির সবচেয়ে প্রিয় দেবতা টোথ। বাজপাখির মাথাওয়ালা দেবতা…কি যেন নাম…হোরাস, বড় ভাবী তাকেই সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে। আর বড়দা বললো, পাথা হলো সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেবতা, কারণ সেই তো সব সৃষ্টি করেছে। আমার অবশ্য ভালো লাগে ইসইস-কে। হেনেট পুজো করে স্থানীয় দেবতা 'আমুনকে। হেনেট বললো, দেবতারা নাকি বলেছেন, এক সময় আমুন-ই নাকি গোটা মিশরের সবচেয়ে বড় দেবতা হবেন। তারপর ধরো, অসিরসি আছে, রি আছে —ওদের সামনে মৃতদের হৃদয় মাপা হবে…।

দম নেয়ার জন্যে থামলো কামিনী। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মোহন। 'আচ্ছা, বলো তো, মানুষ আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য কি?'

'কেন, দেবতারা তো…জাদু!'

'তাই কি সব?'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মোহনদা…।'

'তুমি বলতে চাইছো, দেবতারা এমন মানুষ যারা অসম্ভব সব কাজ করতে পারেন, আর সাধারণ মানুষরা তা করতে পারে না বলে তারা দেবতা নয়, এই তো ?'

'এতো সব প্যাঁচানো কথা আমি বাপু বুঝি না···।' মোহনের দিকে ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর মুখ ঘুরিয়ে নিল কামিনী। উপত্যকার ওপর চোখ পড়তেই শরীর শক্ত হয়ে গেল তার। 'দেখো, দেখো! মেজদার সামনে কিভাবে দাঁড়িয়েছে নফরেত! এমন হাসছে, মনে হচ্ছে লুটিয়ে পড়বে।' হঠাৎ আঁতকে উঠলো সে। 'মাগো! না, কিছু না। মনে হচ্ছিলো, মেজদা বোধহয় নফরেতের গায়ে হাত তুলবে। এদিকেই আসছে মেজদা, কি হয়েছে শোনা যাবে।'

বজ্রসহ ঝড়ের মতো হাজির হলো সোবেক। ওদের দু'জনের সামনে থেমে ঝাল ঝাড়তে শুরু করলো সে, 'ওই নফরেত, ওকে আমি খুন করবো! বাবা এটা একটা কাজ করেছে, বংশ বিচার না করে বেজন্মা একটাকে ধরে আনলেই হলো।'

'কেন, কি বললো তোমাকে নফরেত ?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো মোহন।

'দেখা হলেই অপমান করছে আমাকে,' রাগে মাটিতে পা ঠুকলো সোবেক। 'পথ আগলে ধরে জানতে চাইলো, বসে বসে বাপেরটা আর কতোদিন খাবো আমি। জিজ্ঞেস করলো, বাবা যে আমাকে বিশ্বাস করে না সেটা আমি জানি কিনা। এ-সব কথা একটা বেজন্মা মেয়ের মুখে শুনলে মেজাজ ঠিক থাকে, বলো ?' চাতাল ধরে খানিকদূর এগোলো সে, একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো নিচের উপত্যকার দিকে। ঢাল বেয়ে পাথরটা নেমে যাচ্ছে, মনে হলো

আওয়াজটা তাকে এক ধরনের আনন্দ দিচ্ছে। এবার ঝুঁকে পড়ে আরো বড় একটা পাথর তুলে নিলো সে। পরমুহূর্তে পাথরের নিচে কুণ্ডলী পাকানো সাপটা হঠাৎ ফণা তুলতেই সভয়ে পিছিয়ে এলো। হিস হিস করে উঠলো সাপটা, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার সামনে বাড়ছে। কামিনী দেখলো, ওটা একটা কেউটে।

হাতের পাথরটাই সজোরে ছুঁড়ে মারলো সোবেক। ভাগ্য ভালো, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। সাপটা পড়ে যেতেই আবার একটা পাথর তুলে নিলো সোবেক। আহত সাপের মাথায় পাথর ঠুকতে লাগলো সে। সাপের মাথা থেঁতলে, ভর্তা হয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল নেই তার, প্রচণ্ড আক্রোশে বার বার পাথরটা সাপের ছাতু হয়ে ওঠা মাথায় ঠুকছে সে। তার চোখ কুঁচকে ছোটো ছোটো হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে ধারালো দাঁত, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে সে, বুঝতে পারলো না কামিনী।

'মেজদা থামো।' চেঁচিয়ে উঠলো কামিনী। 'কি করছো। ওটা মরে গেছে···।'

কামিনীর গলা শুনে হুঁশ ফিরলো সোবেকের। হাতের পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাসলো সে, বললো, 'দুনিয়ার বুক থেকে একটা বিষাক্ত সাপ কমলো।' হাসলো বটে, চেহারাটা এখনো তার হিংস্র দেখাচ্ছে। সেই চেহারা নিয়েই ঢালু পথ ধরে ফিরে চললো বাড়ির দিকে।

বিড়বিড় করে কামিনী বললো, 'মেজদা···মেজদা কিছু একটা দেখলেই সেটাকে খুন করার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে, আগেও লক্ষ্য করেছি।'

'হ্যাঁ।'

'সাপ বিপজ্জনক তা সত্যি, কিন্তু কোনো কোনোটা দেখতেও তো ভারি সুন্দর,' বললো কামিনী। 'এটার কথা না হয় আলাদা, কিন্তু কোনো সাপ পালাচ্ছে দেখলেও তাকে রেহাই দেয় না মেজদা। আমার মনে হয়, সাপ-ব্যাঙ মেরে আনন্দ পায় মেজদা।'

'আমার মনে পড়ে,' বললো মোহন, 'ওরা যখন ছোটো ছিলো, ইয়ামো আর সোবেক মারামারি করতো। সোবেক ছোটো বেলা থেকেই হিংস্র, ইয়ামো তার সাথে পারতো না। একটা দৃশ্য জীবনে কখনো ভুলবো না আমি। ইয়ামোকে মাটিতে ফেলে তার মাথায় একটা পাথর দিয়ে বারবার বাড়ি মারছিল সোবেক। আমি অনেকটা দূরে ছিলাম, পৌঁছুবার আগেই ইয়ামো মারা যেতো। ভাগ্যিস সেদিন তোমার মা ছিলো কাছে।' হঠাৎ চুপ করে গেল মোহন, তারপর আবার যখন কথা বললো সে, সেটা অন্য প্রসঙ্গে। 'তোমার মা কিন্তু ভারি-সুন্দরী ছিলো। তুমি ঠিক তার মতো দেখতে হয়েছো।'

'তাই বুঝি?' মনটা খুশি হয়ে উঠলো কামিনীর। তার সারা শরীরে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, 'বড়দা কি খুব চোট পেয়েছিল?'

'না। কিন্তু পরদিন সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সোবেক। সম্ভবত খারাপ কিছু পড়েছিল পেটে। কিন্তু তোমার মা বললো, প্রচণ্ড রাগ আর গরম রোদের জন্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও। গরমের দিন ছিলো সেটা।'

'হুঁ,' বললো কামিনী। 'মেজদা যখন রেগে যায়, তাকে সাম-

লানো কঠিন।' মরা সাপটার দিকে তাকালো সে। শিউরে উঠলো।

বাড়িতে ফিরে এসে কামিনী দেখলো, ফটকের কাছে হাতে প্যাপিরাস নিয়ে বসে রয়েছে কোহি। একটা গান গাইছে সে। চলার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলো ও।

'আমি মেম্ফিসে যাবো,' গাইছে কোহি, 'যাবো সত্য দেবতা পাথার কাছে। তাঁকে আমি বলবো, আজ রাতে তুমি আমাকে আমার বোন এনে দাও। তার চোখে থাকবে মায়া, মনে থাকবে মধু, গায়ে থাকবে সুগন্ধ। ভোর হয়ে যাবে, তবু আমি তার রূপ দেখে শেষ করতে পারবো না। আমি মেম্ফিসে যাবো…' মুখ তুলে কামিনীকে দেখলো কোহি, মিষ্টি একটু হাসলো। জানতে চাইলো, 'আমার গান তোমার কেমন লাগে, কামিনী ?'

'কিসের গান করো তুমি, কোহি ?' সুদর্শন কোহির দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা পাচ্ছে কামিনী।

'মেম্ফিস থেকে শিখেছি,' বললো কোহি। 'এটা একটা প্রেমের গান।' কামিনীর চোখে চোখ রেখে আবার সে গান ধরলো, 'গোলাপ রাঙা মুখ তার, মলম দিয়ে বশ মানানো চুল। হাসিতে তার মুক্তো ঝরে, দাঁতগুলো সব জমাট গরুর দুধ।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো কামিনী, বাতাসে চুল উড়িয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতর। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, একটুর জন্যে ধাক্কা খায়নি নফরেতের সাথে।

তেরছা চোখে কামিনীর আপাদমস্তক দেখে নিলো নফরেত। 'এতো ব্যস্ততা কিসের, শুনি ?'

নফরেত হাসছে না। তার চেহারায় একটু উত্তেজনা আর গাম্ভীর্য

লক্ষ্য করে অবাকই হলো কামিনী। দেখলো, নফরেতের হাত দুটো শরীরের পাশে টান টান হয়ে ঝুলে আছে, মুঠো করা। 'দুঃখিত, নফরেত। তোমাকে আমি দেখতে পাইনি। বাইরে থেকে এলাম তো, এদিকটা অন্ধকার…'

'তা, গান না শুনে চলে এলে যে বড়?' জানতে চাইলো নফরেত। 'প্রেমের গান, শুনতে ভালো লাগারই তো কথা।'

'আমার কি ভালো লাগে না লাগে তা জেনে তোমার কি দরকার।'

'বুঝি, বুঝি,' সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকালো নফরেত। 'ডুবে ডুবে পানি খাওয়া হচ্ছে। তা, ক'জনকে খেলাচ্ছো?'

'মানে?' কামিনীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

জবাব না দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো নফরেত। ওখানে আর দাঁড়ালো না কামিনী, নফরেতকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে এলো মেয়ে-মহলে। নফরেতের হাসি তাকে অনেকক্ষণ তাড়া করলেও, খানিক পরই মন আর কান দখল করে নিলো কোহি আর তার গান। তার চোখে চোখ রেখে গান করছে কোহি, দৃশ্যটা মনে পড়লেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে সারা শরীর। নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো কামিনী। চোখ বুজে কোহিকে দেখতে লাগলো।

সে-রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখলো কামিনী। দেখলো, একটা সাম্পানে চড়ে নদী পাড়ি দিচ্ছে সে আর কাসিন। সাম্পানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাসিন, তার শুধু মাথাটা দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ কাসিন ফিরলো তার দিকে। সে দেখলো, কোথায় কাসিন, ও তো কোহি। তারপর সাম্পানটা আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে মোচড় খেতে শুরু

করলো। প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে কামিনী দেখলো, ওরা এতোক্ষণ কোনো সাম্পানে নয়, দাঁড়িয়ে ছিলো একটা সাপের গায়ের ওপর। বিশাল সাপটা ফণা তুললো। সে দেখলো, সাপের মুখটা ঠিক যেন নফরেতের মুখ। 'নফরেত, নফরেত…' চিৎকার করতে লাগলো কামিনী। এই সময় ঘুম ভেঙে গেল তার।

সত্যি সত্যি চিৎকার করেনি কামিনী, ব্যাপারটা স্বপ্নের ভেতর নিঃশব্দে ঘটেছে। বিছানায় উঠে বসে হাঁপাতে লাগলো সে। হাঁফ ছাড়লো এই ভেবে যে ব্যাপারটা নেহাতই স্বপ্ন, সত্যি নয়। তারপর অকস্মাৎ সে উপলব্ধি করলো, সেদিন সাপটাকে মারার সময় মেজদা বিড়বিড় করে এই একটা শব্দই বারবার আওড়াচ্ছিল, 'নফরেত…নফরেত…'

সাত

শীতের প্রথম মাস—পাঁচ তারিখ

দুঃস্বপ্নটা দেখার পর বাকি রাতটুকু আর ভালো করে ঘুমাতে পারলো না কামিনী। দিনের আলো একটু ফুটতে না ফুটতে বিছানা ছাড়লো সে। বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে।

নীলনদের তীরে এসে দাঁড়ালো কামিনী। জেলেরা এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে, বড় একটা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে চলেছে তারা।

নদী, দিগন্তরেখা, আর নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কামিনীর মনে হলো, কি যেন চাইছে সে, প্রচণ্ডভাবে কিসের যেন একটা চাহিদা অনুভব করছে, কিন্তু জিনিসটা কি তা ঠিক ধরতে পারছে না। উল্লাসে, উত্তেজনায় নেচে উঠতে চাইছে তার অন্তর। বুঝলো, তার এই অনুভূতি, তার এই মনের অবস্থা শব্দ দিয়ে সনাক্ত করতে পারছে না সে। ভাবলো, সে কি কাসিনকে চায়? কিন্তু ও তো মারা গেছে, আর কখনো ফিরে আসবে না। তার কথা ভেবে লাভ কি তাহলে।

এই সময় কামিনী লক্ষ্য করলো, নদীর তীরে আরো একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিক এগোলো সে। দেখলো, দাঁড়িয়ে রয়েছে নফরেত। একদৃষ্টে জেলেদের নৌকোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

ধীরে ধীরে নফরেতের পাশে এসে দাঁড়ালো কামিনী। 'নৌকো-গুলো কি সুন্দর লাগে দেখতে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' কিন্তু কামিনীর দিকে ফিরেও তাকালো না নফরেত।

কামিনীর মনে হলো, নফরেত বড় নিঃসঙ্গ। সবাই তার বিরুদ্ধে, হেনেট ছাড়া কথা বলার লোক নেই তার। শহুরে মেয়ে, এখানকার একঘেয়ে পরিবেশ তার ভালো না লাগারই কথা। আরো মনে হলো, নফরেতের ওপর তারা সবাই অন্যায় করছে। নরম সুরে আবার জিজ্ঞেস করলো কামিনী, 'তুমি যেখান থেকে এসেছো, কেমন জায়গা সেটা, নফরেত?'

'মেম্ফিস খুব মজার জায়গা,' বললো নফরেত। 'আমার বাবা ওখানে একজন বড় ব্যবসায়ী। বাবা অনেক দেশে ঘুরে বেড়ায়, আমি তার সাথে সিরিয়াতেও গেছি। বাবার সাথে আমি অনেক চওড়া সাগরে বিরাট নৌকোয় চেপে অনেক অনেক দেশ দেখেছি।' তার হাসিতে গর্ব ফুটে উঠলো।

চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছে কামিনী। নফরেতের দুঃখ বুঝতে চায় সে। তার কাঁধে একটা হাত রখেলো আলতো করে। 'এখানে তোমার কেমন লাগছে, নফরেত?'

'ঘেন্না ধরে গেছে,' বললো নফরেত। 'কি আছে তোমাদের এখানে? বন্যা, ফসল আর মৃত্যু ছাড়া?'

এই বয়সে বুড়ো একটা লোকের ঘর করতে এসেছে বেচারি, ভাবলো কামিনী। নফরেতের জন্যে দুঃখ হলো ওর। সে লক্ষ্যই

করলো না, তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে নফরেত। দেখলো না, নফরেতের চেহারায় হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠছে। 'আমরা সবাই একটা ভুল করছি,' বললো কামিনী। তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। 'তোমাকে আমাদের আপন করে নেয়া উচিত ছিলো। আর সবার ভুল ভাঙতে হয়ত একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমি···'নফরেতের দিকে ফিরলো সে, 'তোমাকে সঙ্গ দিতে চাই···'

হঠাৎ চুপ করে গেল কামিনী, দেখলো, ধীরে ধীরে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো নফরেত। চাপা গলায় বললো, 'দরদ দেখাতে এসেছো?' পরমুহূর্তে দ্রুত ফিরলো সে কামিনীর দিকে। তার চোখে আগুন জ্বলছে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল কামিনী। 'ভেবেছো, আমি তোমাদের সাথে মেলামেশার জন্যে মরে যাচ্ছি? শোনো তাহলে, তোমরা আমার শত্রু, চিরকাল শত্রুই থাকবে। মনে রেখো, এটা আমার স্বামীর বাড়ি, আমার স্বামীর জমিদারী। এখানে আমার কারো সহানুভূতির দরকার নেই। আমিই এখানে কর্ত্রী। সময় আসুক, আমার কথায় তোমাদের সবাইকে উঠতে-বসতে হবে। যাও, আমার সামনে থেকে দূর হও!' কয়েক মুহূর্ত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সে, তারপর নিজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ধীর পায়ে নফরেতের পিছু নিলো কামিনী। আশ্চর্য, তার কথায় রাগ করেনি ও। ভাবলো, যার মনে এতো রাগ আর ঘৃণা, সে নিশ্চই অনেক দুঃখ আর কষ্টের মধ্যে আছে। সে উপলব্ধি করলো, নফরেত সুখী নয়।

উঠনে ঢুকলো নফরেত, এই সময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো কেতীর একটা ছেলে। পড়বি তো পড়, একেবারে নফরেতের সামনে

পড়ে গেল বাচ্চাটা। কামিনীকে কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ করে বাচ্চাটাকে দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলো নফরেত। ছিটকে শূন্যে উঠে পড়লো ছেলেটা, খানিকটা দূরে গিয়ে ধপাস করে পড়লো। চারদিকে নিস্তব্ধ। ছেলেটাও কাঁদছে না। ছুটে যখন কাছে এসে হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসলো কামিনী, অমনি দম ফিরে পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা।

'কাজটা তুমি ভালো করোনি, নফরেত,' ঘাড় ফিরিয়ে বললো কামিনী। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো সে। 'দেখো, ওর পায়ের আর কনুইয়ের চামড়া উঠে গেছে, রক্ত বেরুচ্ছে...'

বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠলো নফরেত। বললো, 'আপদগুলো যদি রক্ত ঝরে মরে যেতো, সবচেয়ে খুশি হতাম। ওদেরকে খাওয়াতেই তো আমার স্বামী ফতুর হয়ে যাচ্ছে। আমার ছেলেপুলে হলে, তারা কি খাবে?'

ছেলের কান্না শুনে কালবোশেখির মতো সবেগে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কেতী। ছেলেকে এক পলক দেখেই মারমুখো হয়ে নফরেতের দিকে তেড়ে গেল সে। 'খানকী মাগী! এতো বড় সাহস তোর! দাঁড়া, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন ...' ছুটে এসে হাত বাড়ালো কেতী, দশ আঙুলের নখ দিয়ে খামচে ধরলো নফরেতের মুখ। নফরেত কেতীর বুকে হাত রেখে ধাক্কা দিলো, সরে এলো কেতী। কিন্তু ততোক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। নফরেত মুখের বাঁ পাশে মোটা হয়ে ফুটে উঠেছে আঁচড়ের লাল দাগ। রক্তের একটা ধারা গড়াতে শুরু করেছে।

মুখে হাত বুলালো নফরেত। রক্তাক্ত আঙুলগুলো চোখের সামনে এনে দেখলো সে। রাগ নয়, ঘৃণা নয়, তার চেহারায় অদ্ভুত একটা

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

নফরেতের এই অদ্ভুত ভাব দেখে হতভম্ব হয়ে গেল কামিনী। কেন যেন ভীষণ ভয় লাগলো তার। ফিসফিস করে মেজো ভাবীকে বললো, 'কাজটা তুমি ভালো করোনি।'

'ভালো করেনি মানে?' হেসে উঠে বললো নফরেত। 'এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে?' কেতীর দিকে তাকালো সে। 'ধন্য-বাদ, কেতী।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

নিজের ঘরে বিছানার ওপর বসে আছে নফরেত। আধবোজা চোখ, বিড় বিড় করছে সারাক্ষণ। বাইরে হেনেটের গলা পাওয়া গেল, 'কি লো সুন্দরী, আমাকে তলব করেছিস কেন···' ঘরে ঢুকে যেন ভূত দেখলো হেনেট, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। পরমুহূর্তে ছুটে চলে এলো নফরেতের সামনে। 'একি লো! একি দশা হয়েছে তোর! কে···' নফরেতের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

স্মৃতি রোমন্থনের ভাব ফুটে উঠলো নফরেতের চেহারায়, হাসতে হাসতে বললো, 'কেতী। তোমাদের কেতী।'

ঘন ঘন মাথা নাড়তে শুরু করে জিভ দিয়ে বিদঘুটে সব আওয়াজ বের করতে লাগলো হেনেট, সহানভূতি জানাবার এটাই তার প্রিয় কায়দা। বললো, 'খুব খারাপ···আবার, খুব ভালো। কেতী নিজের পায়ে মুগুর মেরেছে, ঠিক?'

ঠোঁট টিপে হাসলো নফরেত। 'কানী বুড়ি, এই জন্যেই তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে। আমরা দু'জন একই রকম চিন্তা করি। তাহলে কোহিকে ডাকছো না কেন?'

'কোহিকে···কোহিকে···' চিন্তার রেখা মিলিয়ে গিয়ে হেনেটের চেহারায় হাসি ফুটলো। 'ও, বুঝেছি। যা করার কর্তাই করবে, এই তো ?'

গলা থেকে পাথর বসানো একটা মালা খুলে হেনেটের দিকে বাড়িয়ে দিলো নফরেত। 'এটা তোমাকে দিলাম, হেনেট। আর, হ্যাঁ, কোহির সাথে তুমিও আসবে। কি ঘটেছে, তোমরা দু'জন তার সাক্ষী।'

দামী মালাটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজলো বুড়ি। 'চিরকাল তোর বাঁদী হয়ে থাকবো লো···'

চেহারায় একটু অনিচ্ছার ভাব নিয়ে একটু পরই হাজির হলো কোহি। তার কপালে চিন্তার রেখা। জেরা করার সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো নফরেত, 'ইমহোটেপের নির্দেশ তোমার মনে আছে, কোহি ?'

'আছে।'

'ইমহোটেপ বলে গেছে, আমার কোনো অভিযোগ থাকলে, তুমি তাকে সেটা লিখে জানাবে।'

চুপ করে থাকলো কোহি।

'প্যাপিরাস আর কলম নাও,' বললো নফরেত। 'আমি বলে যাই, তুমি লেখো।' কোহি ইতস্তত করছে দেখে নফরেত ঝাঁঝের সাথে বললো আবার, 'নিজের চোখে যা দেখবে, তাই তোমাকে লিখতে বলছি—বানোয়াট কিছু তোমাকে লিখতে হবে না। আমি যে মিথ্যে কথা বলছি না, হেনেট তার সাক্ষী। এই চিঠি গোপনে পাঠাবে তুমি···'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কোহি বললো, 'কিন্তু ব্যাপারটা আমার

ঠিক…'

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো নফরেত। তারপর বললো, 'কামিনীর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কামিনী বোকা, সরল, দুর্বল, কিন্তু সে আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। এবার তুমি খুশি তো?'

'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম…'

'এতো ভাবাভাবির কি আছে বাপু?' হেনেট বললো। 'তোমাকে যা বলা হচ্ছে তুমি তাই করো। আজ যা ঘটেছে, কর্তাকে তা জানাতেই হবে। নফরেতের গায়ে হাত তোলা মানে কর্তার গায়ে হাত তোলা। তুমি লেখো, আমি সাক্ষী দিচ্ছি…'

'নফরেত, তুমি বরং মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা আরেকবার চিন্তা করে দেখো…' শুরু করলো কোহি।

নফরেত তাকে থামিয়ে দিলো। 'ও, তারমানে, তুমিও ওদের দলে? ঠিক আছে…'

'আমি কারো দলে নই,' বললো কোহি। 'আমি চাই…'

'তোমার চাওয়ায় কিছু এসে যায় না,' খেঁকিয়ে উঠলো নফরেত। 'আমি তোমার কর্তার স্ত্রী হুকুম করছি, লেখো। আর যদি আমার হুকুম না মানো, ইমহোটেপ আসুক, তোমার আমি বারোটা বাজাবো।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো নাকি?'

'একশোবার।'

পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো ওরা। তারপর মাথা নিচু করে নিলো কোহি। বললো, 'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে। যা বলবে লিখে দিচ্ছি। কিন্তু এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে, নফরেত। দেখো।'

'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছো নাকি?'

'না,' বললো কোহি। 'সাবধান করে দিচ্ছি।'

আট

শীতের দ্বিতীয় মাস—দশ তারিখ

চিঠিটা এলো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

মোহন পড়ছে। ইয়ামো, সোবেক আর আলা শুনছে। হতভম্ব, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে দেখালো ওদেরকে।

'আমি কি ইয়ামোকে বলিনি, নফরেতের কোনো ক্ষতি হলে, ওকে কোনো রকম কষ্ট দেয়া হলে তাকে দায়ী করা হবে? সবাই মিলে, ষড়যন্ত্র করে আমার বউয়ের গায়ে হাত তোলা হয়! ঠিক আছে, এর প্রতিশোধ আমি নিচ্ছি। এখন থেকে তোমরা আমার শত্রু, আমি তোমাদের শত্রু। তোমাদের সাথে এক বাড়িতে আমি আর বাস করবো না। তোমরা কেউ আর আমার ছেলে নও। ইয়ামো, তুমি আমার ছেলে নও। সোবেক, তুমি আমার ছেলে নও। আলা, তুমিও এখন থেকে আর আমার ছেলে নও। তোমরা সবাই আমার স্ত্রীকে অপমান করেছো, আঘাত করেছো। কোহি

আর হেনেট সাক্ষী। তোমাদের সবাইকে আমি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবো। এতোদিন তোমাদের ভরণপোষণ করেছি, এখন থেকে আর করবো না।'

একটু থেমে আবার শুরু করলো মোহন, 'আমি পুরোহিত ইমহোটেপ মোহনকে বলছি। কেমন কাটছে তোমার দিন, সুস্থ এবং নিরাপদ? তোমরা যারা আমার বিশ্বস্ত, আমার প্রতি অনুগত, কেমন কাটছে তোমাদের দিন, সুস্থ আর নিরাপদ? আমার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে, আমার মেয়ে কামিনীকে আমার স্নেহ জানাবে, আর হেনেটের প্রতি রইলো আমার অন্তরের অভিনন্দন। সহকারী মোহনকে বলছি, আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমিই সব দেখেশুনে রাখবে। একটা দলিল করার জন্যে তৈরি হও, যাতে লেখা থাকবে নফরেত আমার স্ত্রী হিসেবে আমার সমস্ত সম্পত্তি আর আয়ের অর্ধেক মালিক বলে ঘোষণা করা হলো। ইয়ামো আর সোবেক আমার কিছুই পাবে না, তাদেরকে আমি ভরণপোষণ দিতেও ইচ্ছুক নই। আলার ব্যাপারে বলছি, তাকে সতর্ক করে দাও, আমার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তাকেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

এরপর নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে থাকলো, কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। তারপর হঠাৎ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোবেক। 'কেউ ষড়যন্ত্র করে মিথ্যে অভিযোগ করেছে! আমরা কি এটা মেনে নেবো? এভাবে বাবা আমাদেরকে বঞ্চিত করতে পারে না! কোত্থেকে একটা মেয়ে এসে আমাদের সব কেড়ে নিয়ে যাবে…'

মৃদু কণ্ঠে মোহন বললো, 'শুনতে খারাপ লাগবে, কাজটা উচিতও

হবে না। কিন্তু আইন বলে, তোমাদের বাবা যদি ইচ্ছে করে, তোমাদেরকে বঞ্চিত করে সব সে তার স্ত্রীকে লিখে দিতে পারবে। তার যেমন খুশি দলিল তৈরি করতে পারে সে।'

'ওটা একটা ডাইনী, বাবাকে জাদু করেছে!'

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না ইয়ামোর, বিড়বিড় করে বললো সে, 'এ অবিশ্বাস্য···এ সত্যি হতে পারে না।'

'শালা বুড়ো পাগল হয়ে গেছে,' চিৎকার করে উঠলো আলা। 'আমাকেও কিনা বলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

মোহন গম্ভীর। বললো, 'খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তোমাদের বাবা, এখানে তাই লিখেছে। ততোদিনে তার রাগ হয়ত পড়ে যাবে। সত্যি সত্যি সবাইকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে বলে মনে হয় না।'

কর্কশ একটা হাসি শোনা গেলো। ঘাড় ফেরালো সবাই। দেখলো, মেয়ে-মহল থেকে বেরিয়ে এসে দরবার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমানী। 'অপেক্ষা করে দেখা হোক, এই তাহলে ঠিক করলে তোমরা, কেমন?'

নিচু, শান্ত গলায় জানতে চাইলো ইয়ামো, 'তাছাড়া আর কি করতে পারি আমরা?'

দাঁতে দাঁত ঘষলো হিমানী, তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তার চিৎকার বোধহয় নদীর কিনারা থেকেও শোনা যাবে 'ধিক তোমাদের, ধিক! একজনের শরীরেও রক্ত নেই, পচে পুঁজ হয়ে গেছে। এখানে বসে হা-হুতাস করার চেয়ে গলায় দড়ি দিতে পারো না? ইয়ামোর একটা ছুঁচোর সাহসও নেই, জানি—কিন্তু সোবেক, তুমি? বাড়িতে ছুরি নেই? ওই ঢ্যামনা মাগীর বুকের কোন্

জায়গটা ধুক ধুক করছে, তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো, তাহলেও ছুরিটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে না ?'

ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে থাকলো সবাই। তারপর কথা বললো ইয়ামো, 'বাবা তাহলে কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না, হিমানী।'

'ওরকম মনে হয়,' বললো হিমানী। 'মরা আর জ্যান্ত বউ, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। বউ মরে গেছে দেখলে তার মন আবার ছেলে-মেয়েদের দিকে ফিরবো। তাছাড়া, মাগী কিসে কিভাবে মরলো, সে জানবে কোত্থেকে! আমরা বলবো, একটা বিছে, একটা কাঁকড়া বিছে তাকে কামড়েছে। আমরা সবাই যদি একমত থাকি, এটা কোনো সমস্যাই নয়।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো ইয়ামো। চিন্তিত দেখালো তাকে। 'উঁহু'। বাবা জানবে। হেনেটই তাকে সব বলে দেবে!'

'তুমি একটা মেয়েমানুষেরও অধম!' বাড়ি কাঁপিয়ে তুললো হিমানী। 'নফরেতের চিকিৎসা হতে দেখে কানী বুড়ির জবান বন্ধ হয়ে যাবে না!'

'উঁহু',' মাথা নাড়লো ইয়ামো। 'এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না।'

প্রচণ্ড রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করলো হিমানী। 'মিনসে মর তুই, মর! গলায় দড়ি দে!' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে চলে গেল সে।

হিমানীর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল কেতী। এক পা সামনে বাড়লো সে। তার কণ্ঠস্বর গভীর, কাঁপা কাঁপা, 'হিমানী ঠিক কথাই বলেছে। তাকে পুরুষমানুষ বললে তবু মানায়, কিন্তু তোমরা মেয়ে-মানুষেরও অধম। ভাশুরকে বলছি, এই পরিস্থিতিতে চুপ করে বসে

থাকাটা কি উচিত হচ্ছে? সোবেক, তোমাকে জিজ্ঞেস করি, বাড়ি থেকে বের করে দিলে ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়াবে কি? আমাকে রাখবে কোথায়?'

'দেখা যাক না কি হয়…' শুরু করলো সোবেক।

তাকে থামিয়ে দিয়ে কেতী বললো, 'দেখার আর কিছু বাকি আছে? তোমার বাপকে তুমি চেনো না? এই বুড়ো বয়সে কচি বউ পেলে আর সব পুরুষের যা হয়, তারও তাই হয়েছে—তোমরা সবাই তার চোখের কাঁটা হয়ে গেছো। হিমানী যা বললো, সেটা ছাড়া আর পথ নেই।' দম নেয়ার জন্যে একটু থামলো সে। বোঝাই যাচ্ছে, তোমাদের কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।'

'তুমি যাচ্ছো?' হতভম্ব দেখালো সোবেককে। 'কোথায় যাচ্ছো?'

জবাব না দিয়ে দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কেতী। সে চলে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোবেক। একটু একটু কাঁপছে সে। 'শাকমেতের কিরে, কেতী ঠিক বলেছে। বসে বসে কথা বলবো আর মাথা নাড়বো, তা হতে পারে না। এখুনি এর একটা বিহিত করতে হবে। আমি যাই, দেখি, কতো বাড় বেড়েছে…।' দরজার দিকে ছুটলো সে।

পিছন থেকে বাধা দিলো মোহন। 'সোবেক। সোবেক মাথা গরম করো না।'

দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো সোবেক, মুহূর্তের জন্যে। তার সুদর্শন চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে, চোখে খুনের নেশা। 'মাথা গরম করছি না। যা করবো, ঠাণ্ডা মাথায়, সবার ভালোর জন্যেই করবো।' দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে দিশেহারার মতো এদিক ওদিক তাকালো কামিনী। বুকের ভেতরটা তার ধড়াস ধড়াস করছে, একটা ঢোক গিললো সে। অপম মনে বিড় বিড় করছে, 'নফরেত পালাও···নফরেত ওরা তোমাকে খুন করতে আসছে···।'

বাড়ির ভেতর থেকে ওদের গলা ভেসে আসছে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে কামিনী। ইয়ামো আর মোহন তর্ক জুড়ে দিয়েছে, তাদের গলাকে ছাপিয়ে উঠছে আলার চিৎকার, 'নফরেত আমাকে দেখে মুখ ভেঙচায়, বলে, আমি নাকি তিনজনের খাবার একা খাই! দাসীদের হুকুম করেছে, তারা আমার কাপড় ধুতে পারবে না। জাদু করে আমার দিক থেকে বাবাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ও। কিন্তু এই বাড়িতে যদি কোনো পুরুষমানুষ থেকে থাকে তো সে আমি! আমি এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো!'

ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে এলো আলা, কামিনীর সাথে ধাক্কা খেলো। খপ্ করে তার শার্টের আস্তিন চেপে ধরলো কামিনী। 'আলা শোন, কোথায় যাচ্ছিস, ভাই?'

'নফরেতকে খুঁজতে। তার মুখ ভেঙচানো আমি বের করবো!'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, একটু শান্ত হ! বুঝতে চেষ্টা কর···'

'বুঝতে চেষ্টা করবো। তুই দিদি ওদেরই মতো...সাবধানী, ভয়েই অস্থির। ছেড়ে দে আমাকে...' ঝাঁকি দিয়ে শার্টের আস্তিন ছাড়িয়ে নিলো সে। 'নফরেত কোথায়? কোথায় সেই ডাইনী?'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো কুঁজো বুড়ি হেনেট। তার একটা মাত্র চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। ফিসফিস করে বললো সে, 'কি জানি কি আছে কপালে! মালিক এসেই বা বলবে কি!'

'নফরেত কোথায়? কোথায় সেই ডাইনী?' হেনেটের দিকে ছুটে

গেল আলা।

চিৎকার করলো কামিনী, 'বলো না!' কিন্তু ইতিমধ্যে জবাব দিতে শুরু করেছে হেনেট।

'খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যেন গেল। বোধহয় শণ ক্ষেতের দিকে...'

পিছন দিকে যাবার জন্যে বাড়ির ভেতর ঢুকলো আলা। তার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ একটু পরই মিলিয়ে গেল। রাগের সাথে হেনেটের দিকে তাকালো কামিনী। 'কেন বললে তুমি?'

নিজের কপালে হাত দিয়ে চটাস করে চাপড় মারলো হেনেট। 'ওলো, এটাই তো আমার দুঃখ। কেউ তোরা আমাকে বিশ্বাস করিস না। কিন্তু হেনেট যা করে বুঝে শুনেই করে। শণ ক্ষেতে যাক না আলা, সেখানে নফরেতকে পেলে তো!'

'নফরেত তাহলে কোথায়?'

'এখানে—মালিকের হাওয়াখানায়, কোহির সাথে আছে।'

লেকের ওপর দিয়ে হাওয়াখানার দিকে তাকালো কামিনী।

হেনেট আবার কথা বললো, এবার সুর করে, টেনে লম্বা করা উচ্চারণে, 'কো-হি-র সা-থে লো, -বু-ঝতে পা-র লি?'

কিন্তু লেকের পাড় ধরে এরই মধ্যে এগোতে শুরু করেছে কামিনী। হাওয়াখানায় ঢুকে সে দেখলো, দূরের এক কোণে নফরেত আর কোহি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে এগোতে দেখে ওরা ঘুরলো।

হন হন করে হেঁটে এসে হাঁপিয়ে গেছে কামিনী, রুদ্ধশ্বাসে বললো সে, 'নফরেত, তোমাকে আমি সাবধান করে দিতে এলাম। ওরা তোমার ক্ষতি করতে চাইছে। তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো...'

ঘৃণা মেশানো হাসি ফুটলো নফরেতের মুখে। 'ও, কুকুরগুলো

বুঝি ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে ?'

'রাগে আগুন হয়ে আছে ওরা,' দ্রুত বললো কামিনী। 'এখন যদি ওদের কারো সামনে পড়ে যাও তুমি···'

মাথা নাড়লো নফরেত। 'আমার যে ক্ষতি করবে এখনো সে মার পেট থেকে বেরোয়নি। কে সে, আসতে বলো তাকে। আমার স্বামী ওদেরকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে আমি ওদের গর্দান নিতে বলবো। হুঁহ্, আমার সাথে লাগতে আসে। চালাকিতে ওরা আমার সাথে পারবে ? বলে দাও, আমি খেলাচ্ছি, ওরা খেলছে—এটা আমার খেলা।'

'ও, এসব তাহলে তোমারই কাজ,' ফিসফিস করে বললো কামিনী। 'তুমিই তাহলে বাবাকে ক্ষেপিয়েছো! কিন্তু নফরেত, তোমার কি মরার ভয় নেই ? যখন পাপ-পুণ্যের হিসেব হবে, জবাব দেবে কি ?'

'ওরে আমার পুণ্যবতী রে!' কামিনীকে ভেঙচাতে গিয়ে নফরেতের দাঁত, মাড়ি, জিভ সব বেরিয়ে পড়লো। 'তোমার বাপের কাছে তোমার নামে কোনো অভিযোগ করিনি, কোহিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। এখন চিন্তা করছি, সেটা কি আমার ভুল হয়েছে!' হন হন করে বেরিয়ে গেল নফরেত।

'ও,' কোহির দিকে ফিরলো কামিনী। 'তুমিই তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে এসব করতে সাহায্য করছো ওকে ?'

অস্থির দেখালো কোহিকে, ব্যাকুল সুরে বললো, 'আমার ওপর রাগ করো না, কামিনী। আমার কোনো দোষ নেই, বিশ্বাস করো। আমি শুধু তোমার বাবার হুকুম পালন করেছি। তাকে লিখতে নফরেত আমাকে বাধ্য করেছে।'

'হ্যাঁ, বুঝি,' ধীরে ধীরে বললো কামিনী। 'তোমার কিছু করার

ছিলো না।'

'বিশ্বাস করো, তোমার বিরুদ্ধে একটা কথাও লিখিনি আমি...'

'তা না লিখলেই বা কি,' বললো কামিনী। 'আমি আমার কথা ভাবছি না...'

'প্রমাণ, সাক্ষী এ-সব পেয়েই লিখেছি আমি,' বললো কোহি। 'একটাও মিথ্যে লিখিনি আমি...'

'নফরেত বোকা নয়, প্রমাণ আর সাক্ষী জোগাড় না করে তোমাকে দিয়ে কিছু লেখাবার কথা ভাবেনি সে।'

'হ্যাঁ,' গলা খাদে নামিয়ে বললো কোহি। 'ওর মাথায় শুধু শয়তানী বুদ্ধি।'

চোখে কৌতুহল নিয়ে কোহির দিকে ফিরলো কামিনী। 'নফরেতকে তুমি অনেক আগে থেকে চেনো। মেম্ফিস থেকেই, তাই না?'

'ভালো করে চিনতাম না। ওর কথা শুনতাম, এই পর্যন্ত। লোকে বলতো ওর খুব গর্ব, বড় বড় আশা করে, কাউকে পাত্তা দেয় না। খুব হিংসুটে, ক্ষমা করতে জানে না।'

হঠাৎ মাথা ঝাঁকালো কামিনী, যেন হতাশা মুক্ত হতে চাইছে। 'বাবা আমাদের সবাইকে বঞ্চিত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। রাগের মাথায় বলছে বটে, কিন্তু এসব সত্যি না। ফিরে এসে সবাইকে বাবা মাফ করে দেবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বললো কোহি। 'তোমার বাবা যাতে আরো রাগে, সে ব্যবস্থা অবশ্যই করবে নফরেত। তুমি দেখো। ভুলো না, ও সুন্দরী...'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলো কামিনী, 'ও সুন্দরী।' ঘুরে

দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোলো সে, নফরেত সুন্দরী এই কথাটা কোহির মুখ থেকে শুনে কেন যেন মন খারাপ হয়ে গেছে তার।

বাচ্চাদের সাথে খেলে বিকেলটা কাটিয়ে দিলো কামিনী। প্রথমে ওরা তাকে দলে নিতে চায়নি, বুদ্ধি করে ওদের মতোই ছেলেমানুষ হয়ে গেল সে, মেয়ে পুতুলের বিয়ে দেয়ার সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো, তারপর আর কোনো অসুবিধে হয়নি। সময়টা কিভাবে গেল টেরই পেলো না সে, মনের কোণে অস্পষ্ট ব্যথাটাও হালকা হয়ে এলো। সূর্য ডুবু ডুবু, এই সময় সিধে হয়ে দাঁড়ালো সে, টেনে-টুনে ঠিক করলো পরনের কাপড়, চুলগুলো এক করে মস্ত একটা খোঁপা বাঁধলো। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে, হিমানী আর কেতী আজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোয়নি কেন? এমন তো কোনোদিন হয় না। সন্ধ্যে পর্যন্ত ওরা তো যার যার ছেলেমেয়ে নিয়ে লেকের ধারেই কাটায়।

উঠন থেকে অনেক আগেই চলে গেছে কোহি। ধীর পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলো কামিনী। বারান্দায় কেউ নেই, দরবারে কেউ নেই, এমন কি বসার ঘরেও কাউকে দেখলো না। মেয়ে মহলে চলে এলো সে, দেখলো, দাদী-আম্মা এশা তার বিছানার এক কোণে বসে ঝিমাচ্ছে, আর তার অল্প-বয়েসী বাঁদী মেয়েটা লিনেনের কাপড়চোপড় ভাঁজ করে জড়ো করছে এক জায়গায়। হেঁশেলেও একবার উঁকি দিলো কামিনী, ক্রীতদাসীরা রাতের রান্নাবান্নায় ব্যস্ত, তাই আর কাউকে দেখলো না সে।

শুধু যে অবাক হলো তা নয়, কৌতূহলও জাগলো কামিনীর মনে —সবাই গেল কোথায়?

মোহন সম্ভবত সমাধিতে গেছে। বড়দা ইয়ামো তার সাথে যেতে পারে, কিংবা হয়তো ক্ষেতে কাজ করছে। সোবেক আর আলা হয় গরু-মোষ দেখাশোনা করছে নয়তো শস্য তোলার তদারকিতে ব্যস্ত। কিন্তু ভাবীরা কোথায়—হিমানী আর কেতী? আর, নফরেত?

নফরেতের কামরার সামনে থামলো কামিনী। ঘরের বাতাস সুগন্ধে ভারি হয়ে আছে। কামিনী জানে, এই বিশেষ সুগন্ধ বাড়িতে একা শুধু নফরেতই ব্যবহার করে। দোর-গোড়া থেকে বিছানা, বালিশ, আয়নার সামনে ছোটো একটা অলংকারের বাক্স, ব্রেসলেট, লিনেন, কাপড়চোপড় সবই আছে, কিন্তু নফরেত নেই।

কোথায় সে?

বাড়ির খিড়কি দরজার দিকে এগোলো কামিনী। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো হেনেট, কামিনী তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। 'ওরা সব কোথায়, জানো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি খেটে খাই, বুঝলি। হাওয়া খেয়ে বেড়াবার মতো সময় নেই।'

তারমানে, কামিনী ধরে নিলো, কেউ হাওয়া খেতে গেছে। হয়তো বড়দার পিছু পিছু সমাধিপ্রাঙ্গণের দিকে গেছে হিমানী, স্বামীকে আরো উত্তেজিত করার জন্যে। কিন্তু কেতী, সে কোথায়? নিজের ছেলেমেয়েদের ছেড়ে বেশিক্ষণ সরে থাকার মেয়ে তো নয় সে।

একটা অমঙ্গল আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠলো কামিনীর। নফরেত কোথায়?

'নফরেত?' বুড়ি যেন কামিনীর মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারলো। 'সে তো অনেক আগে সমাধির দিকে গেল দেখলাম। দাঁতহীন মাড়ি বের করে খক খক বিচ্ছিরী শব্দে হাসলো সে। 'মোহ-

নের সাথে ওর জমবে ভালো। দু'জনের বুদ্ধির ধার আছে।' হঠাৎ কামিনীর কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনলো সে, তার একটা মাত্র চোখে উত্তেজনার ঝিলিক। 'কেতী যেদিন ওকে মারলো, ও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। দেখলাম, মুখে রক্ত গড়াচ্ছে। আমাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়ে কোহিকে দিয়ে চিঠি লেখালো। সাক্ষী দেবো না, কি করে বলি, বল? তোর মায়ের কথা ভাব, বেচারি আমাকে…'

বুড়িকে পাশ কাটিয়ে এগোলো কামিনী, দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এলো নিস্তেজ সোনালি রোদে। পাহাড়ের খাড়া গায়ের পাশে গভীর ছায়া, চারদিক গোধুলি লগ্নের প্রশান্তি। পাহাড়ী পথ ধরে হন হন করে এগোলো কামিনী। অজানা আশংকায় বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। এখন তার মোহনদাকে দরকার। কোনো বিপদে পড়লে বা ভয় পেলে মোহনদাই তাকে সাহায্য আর অভয় দিতে পারে। মোহন-দা এই পাহাড়ের মতো—অটল, নিরেট, আর নিরাপদ।

এক সময় প্রায় দৌড়ুতে শুরু করলো কামিনী। তারপর হঠাৎ করেই হিমানীকে দেখতে পেলো সে, তার দিকেই এগিয়ে আসছে। হিমানী তাহলে সত্যিই সমাধির ওদিকে গিয়েছিলো?

কিন্তু হিমানী ওভাবে হাঁটছে কেন? একবার এদিক কাত হচ্ছে, আরেকবার ওদিক কাত হচ্ছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। ও কি চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না?'

'হিমানী, কি হয়েছে, তুমি অসুস্থ?'

দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক তাকালো হিমানী, জবাব দিলো ভাঙা, কর্কশ সুরে, 'না, না—আমি তো ঠিকই আছি!'

'একি চেহারা হয়েছে তোমার! মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছো? কিছু ঘটেছে, হিমানী?'

'ঘটেছে? কি ঘটবে? কিছু ঘটেনি!'

'কোথায় ছিলে তুমি?'

'সমাধিতে···কিন্তু ইয়ামোকে ওখানে পেলাম না। কেউ নেই ওখানে।'

তবু একদৃষ্টে বড় ভাবীর দিকে তাকিয়ে থাকলো কামিনী। তার মনে হলো, একটা কথাও সত্যি বলছে না হিমানী। আশ্চর্য বদলে গেছে মানুষটা—কোথায় তার সেই চোটপাট আর রগচটা ভাব! এ তো একটা সন্ত্রস্ত, কোণঠাসা বিড়াল।

'ফিরে চলো, কামিনী,' বললো হিমানী। 'চলো, বাড়ি ফিরে যাই।'

'না, আমি ওপরে উঠবো,' বললো কামিনী।

'বললাম না, ওখানে কেউ নেই।'

'ওখানে বসে নদী দেখবো···'

'দুর, এটা একটা সময় হলো! চলো···।' হিমানীর হাত কামিনীর একটা কব্জি চেপে ধরলো।

মোচড় দিয়ে কব্জিটা ছাড়িয়ে নিলো কামিনী। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। একটু কঠোর শোনালো তার গলা, 'আমাকে বাধা দিয়ো না, বড় ভাবী।'

'না।' হাঁপাচ্ছে হিমানী। 'ফিরে চলো। আমার সাথে ফিরে চলো।'

এক রকম গায়ের জোরেই হিমানীকে পাশ কাটালো কামিনী, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে এগোলো···ছুটলো। সমাধিপ্রাঙ্গণে কিছু একটা ঘটেছে, নিশ্চই ঘটেছে, ভাবলো সে। ওর মন বলছে, কিছু একটা আছে ওখানে···।

পাহাড়ের মাথায় উঠতে হলো না, তার আগেই জিনিসটা দেখতে পেলো কামিনী। পাহাড়ের ঘন ছায়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়ালো সে। একটুও অবাক হয়নি, যেন এটা দেখবে বলেই আশা করেছিল।

আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে নফরেত, মোচড় খাওয়া শরীর, হাড়গোড় ভাঙা। তার চোখ খোলা, কিন্তু কোনোদিন তাকিয়ে নেই।

ঝুঁকে পড়ে নফরেতের ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট ঘাড়ে একবার হাত ছোঁয়ালো কামিনী, সিধে হয়ে তাকিয়ে থাকলো লাশটার দিকে। পিছনে হিমানী এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি।

'নিশ্চই পড়ে গেছে,' বললো হিমানী। 'বোধহয় পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে হাঁটছিল, পা হড়কে···।'

হ্যাঁ, তাই হবে, ভাবলো কামিনী। কিনারা থেকে পা পিছলে পড়েছে, তারপর পাথরে বাড়ি খেতে খেতে নেমে এসেছে এখানে।

'হয়তো সাপ-টাপ দেখতে পেয়েছিল,' বললো হিমানী। 'আঁতকে ওঠায় পা পিছলে যায়।' মাথার ওপর, পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালো সে। 'ওদিকে প্রায়ই তো সাপ দেখা যায়, ফাটল থেকে বেরিয়ে এসে পথের ওপর রোদ পোহায়।'

সাপ।

সাপের কথা উঠতেই সোবেকের কথা মনে পড়ে গেল কামিনীর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য। হাতে পাথর আর চোখে আক্রোশ নিয়ে একটা সাপের দিকে তাকিয়ে আছে সোবেক। পাথরটা ছুঁড়ে দিলো সে। সাপটা আহত হলো। আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে সাপটার মাথায় মারলো সে, বারবার। থেঁতলে গেল সাপের

মাথা, মারা গেল, কিন্তু সোবেক থামছে না, তার গলা থেকে অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে. 'নফরেত···নফরেত···।'

মাথাটা ঘুরে গেল কামিনীর। তাহলে কি সোবেকই নফরেত-কে···?

মোহনের গলা পেলো সে, পরম স্বস্তি বোধ করলো হঠাৎ।

কি ব্যাপার?'

ঘাড় ফেরালো কামিনী। মোহন আসছে, সাথে বড়দা ইয়ামো। হিমানী ব্যাকুল সুরে ব্যাখ্যা করছে সব—পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে গেছে নফরেতের···।

সব শুনে ইয়ামো বললো, 'ও বোধহয় আমাদের খোঁজেই এদিকে এসেছিল কিন্তু আমি আর মোহন খালের ওদিকে সেচের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম। তা প্রায় ঘন্টাখানেক ওদিকে ছিলাম আমরা। ফিরে আসছি, দেখি তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো।'

কামিনী কথা বললো, নিজের গলা নিজের কাছেই অচেনা লাগলো, সোবেক! সোবেক কোথায়?'

ঝট্ করে কামিনীর দিকে ফিরলো মোহন।

'সোবেক? একটু বিস্মিত দেখালো ইয়ামোকে। 'বিকেলে তো ওকে আমি দেখিনি। রাগ করে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর আর দেখিনি তাকে।

কিন্তু মোহন তাকিয়ে আছে কামিনীর দিকে। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার চোখে তাকালো কামিনী। কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, তারপর চোখ নামিয়ে লাশের দিকে তাকালো মোহন কামিনী জানে কি ভাবছে মোহন।

নাকী সুরে প্রশ্ন রেখে বিড়বিড় করে উঠলো মোহন, 'সোবেক?'

'নন্না!' কামিনী শুনতে পেলো, কিন্তু নিজের গলা চিনতে পারলো না এবারও। 'না-না!'

'পাহাড় থেকে পড়ে গেছে ও,' ব্যগ্র কণ্ঠে বললো হিমানী। 'পথটা একেবারে সরু, পা পিছলে…'

'নিশ্চই তাই,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো মোহন। কামিনীর দিকে তাকালো সে। কামিনী ভাবলো, মোহন কথাটা বিশ্বাস করে না। ও আর আমি আসল কথাটা জানি, শুধু আমরা দু'জন।

'হতে পারে, হয়তো পড়ে গিয়েই…' গলার ভেতর বেধে গেল কথা, শেষ করতে পারলো না কামিনী।

'তা না হয়েই যায় না,' বললো ইয়ামো। 'পড়ে গিয়েই মারা গেছে নফরেত।'

নয়

শীতের চতুর্থ মাস—ছয় তারিখ

মা এশার সামনে বসে আছে ইমহোটেপ। গম্ভীর চেহারা। বললো, 'ওরা সবাই একই কথা বলছে।'

'সুবিধেই হলো।'

'কি বললে? সুবিধে?' মনে মনে চটে উঠলো ইমহোটেপ।

'মাঝে মধ্যে এমন উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করো তুমি।'

ছেলের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলো বুড়ি। 'আমি যা বলি বুঝে শুনেই বলি, বাবা।'

'ওরা সত্যি কথা বলছে কিনা, আমাকে বুঝতে হবে।' জেদের সুরে বললো ইমহোটেপ।

'তুই যেন সত্য দেবতা, সবার মনের কথা বুঝতে পারবি।'

'সত্যিই কি এটা একটা দুর্ঘটনা?' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো ইমহোটেপ। 'রাগ করে ওদেরকে আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম, আর ঠিক তার পরই মারা গেল নফরেত। বাড়ির সবাই নিশ্চই আমার আর নফরেতের ওপর খুব ক্ষেপে ছিলো...'

'স্বাভাবিক, ক্ষেপবেই তো। এখান থেকেও ওদের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছি আমি। আচ্ছা, সত্যিই কি তুই...?'

'বললাম না, রাগ করে বলেছিলাম। তবে, খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছিল ওরা।'

'তারমানে স্রেফ ভয় দেখাবার জন্যে...?'

'এখন আর ওসব কথা তুলে লাভ কি, মা।'

'হুঁ, বুঝেছি। আসলে কি করতে হবে বুঝতে পারিসনি, তোর যা স্বভাব, বরাবরের মতো লেজেগোবরে করে ফেলেছিলি।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো ইমহোটেপ। 'আমি শুধু জানতে চাই ওরা কেউ...ওরা কেউ নফরেতের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কিনা।'

'যদি কেউ দায়ী হয়?' বাঁকা চোখে তাকালো এশা। 'তাহলে? কি করবি তুই?'

'জানি না।'

'কাজেই ওরা সবাই যখন একই কথা বলছে, সেটাকে ভাগ্যই বলতে হয়। কেউ অন্য রকম কিছু আভাস তো দেয়নি, নাকি দিয়েছে ?'

'না।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছিস না কেন, ব্যাপারটা চুকে গেছে ?' একটু থেমে আবার বললো এশা, 'আমি তো তোকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, নফরেতকে তুই সাথে করে নিয়ে যা।'

ঝট্ করে মুখ তুললো ইমহোটেপ। 'তারমানে তোমার বিশ্বাস···?'

'চোখে আজকাল ভালো দেখতে পাই না, নড়াচড়ার শক্তি আর নেই আমার,' বললো এশা। 'যে যা বলে শুনি, কিন্তু সবার যাতে মঙ্গল সেটা বিশ্বাস করি। হেনেটকে তুই নিশ্চই জেরা করেছিস, তাই না ? সে কি বলে ?'

'আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছে সে।'

'আর কিছু না, শুধু দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছে ? তার ধারালো জিভ থেকে আর কিছু খসেনি ?'

চুপ করে থাকলো ইমহোটেপ। জানে, বাড়ির কেউ হেনেটকে দেখতে পারে না।

'তাহলে তো তুই নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারিস, ব্যাপারটা চুকে গেছে। আরো অনেক সমস্যা আছে, সে-সব ব্যাপারে মাথা ঘামা।'

'হ্যাঁ, সমস্যার কোনো শেষ নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ইমহোটেপ। 'বড় ঘরে ইয়ামো অপেক্ষা করছে, জরুরী অনেকগুলো বিষয়ে কথা বলবে। তুমি ঠিকই বলেছো, মা, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না···।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ব্যঙ্গাত্মক একটু হাসি ফুটলো এশার ঠোঁটে। কিন্তু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাসিটা। উদ্বিগ্ন দেখালো তাকে। গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো সে।

কোহিকে সাথে নিয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল ইয়ামো ইমহোটেপ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সব ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো সে। সুগন্ধ রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যারা লাশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে, সেই এমবাম আর মড়াপোঁতাদের সাথে আছে মোহন, তাদের কাজ তদারক করছে।

নফরেতের মৃত্যু সংবাদ পাবার পর দেশে ফিরতে কয়েক হপ্তা লেগে গেছে ইমহোটেপের, তবে সৎকারের আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। একদিন লবণ জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল লাশ, তারপর তেল মাখিয়ে, লবণ দিয়ে ঘষে নিয়ে সময়মতো ব্যাণ্ডেজে মুড়ে তোলা হয়েছে কফিনে

পাথুরে একটা গুহা বেছে রাখা হয়েছে, ইমহোটেপ মারা গেলে সেখানেই তাকে কবর দেয়া হবে। নফরতের জন্যে তার পাশের একটা গুহা বাছাই করেছে ইয়ামো।

খুঁটিনাটি সব শোনার পর ইমহোটেপ বললো, বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা করে রেখেছো, সেজন্যে আমি খুশি, ইয়ামো। বোঝাই যাচ্ছে, তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।'

অপ্রত্যাশিত প্রশংসা শুনে মুখের চেহারা একটু বদলালো ইয়ামোর।

'কিন্তু আই পি আর মণ্ট, এমবামার হিসেবে খুবই নাম করা ওদের সম্মানীও অনেক বেশি। তাছাড়া, কাজের জন্যে এটা-সেটা

এমন অনেক দামী জিনিস চায় ওরা যেগুলো না হলেও চলে, কিংবা কম দামের হলেও কোনো ক্ষতি নেই। ক্যানপিক জারটার কথাই ধরো, ওটা অতো দামী না হলেও চলতো। এ-ধরনের বাজে খরচের কোনো মানে হয় না। আমার মনে হয়, মোটামুটি নাম করা কাউকে আনলে খরচ অনেক কমতো।'

'তুমি ছিলে না,' বললো ইয়ামো, 'কাজেই সব ব্যাপারে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। নফরেত তোমার স্ত্রীই শুধু ছিলো না, সম্পর্কে আমাদের মা-ও তো, তাই···।'

'জানি, বাবা, জানি,' বললো ইমহোটেপ। 'আমি যাতে রাগ না করি তার জন্যেই সেরা লোক, সেরা জিনিসের ব্যবস্থা করেছো তুমি।' তার চেহারা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'কিন্তু তোমার ওই কথাটা ঠিক না। নফরেতকে আমি ভালোবাসতাম ঠিক, কিন্তু তাকে আমার স্ত্রীর মর্যাদা কখনো দিইনি। কাজেই তোমাদের মা ছিলো, এ-ধারণাটা ঠিক না। আমার রক্ষিতা ছিলো সে, তার বেশি কিছু না।' খানিক বিরতি নিলো সে। 'মাদুলি আর উপঢৌকন বাবদ যে খরচ ধরা হয়েছে, আমরা তা কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনবো। তুমি বরং জিনিস-পত্রের তালিকাটা একবার পড়ো, দেখি কি কি বাদ দেয়া যায়···।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে লেকের ধারে এলো কেতী। ছুটোছুটি করে খেলছে ছেলেমেয়েরা, মায়েরা তাদের ওপর খেয়াল রাখছে। বড় জা হিমানীর দিকে তাকালো কেতী, বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, হিমানী। মরা আর জ্যান্ত বউ, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।'

মুখ তুলে তাকালো হিমানী। চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, যেন কিছু

দেখছে না। তার মুখে কোনো কথা জোগালো না।

'কি বলতে চাও, কেতী?' তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

'খুড়ি, বউ না—রক্ষিতা!' বলে খিলখিল করে হেসে উঠলো কেতী। 'জ্যান্ত মানুষের পছন্দ অপছন্দ আছে, আছে না? কিন্তু মরা মানুষের? নফরেতের কথাই ধরো। বেঁচে ছিলো, তখন কিছুই তার পছন্দ হতো না। স্বামীর রক্ত-মাংসকে পর্যন্ত ঘেন্না করতো। আর এখন? আমাদের শ্বশুর এখন কবর দেয়ার খরচ কিভাবে কমানো যায়, তাই নিয়ে ব্যস্ত। ঠিকই তো, মরা একটা রক্ষিতার পিছনে বাজে খরচ করে কি লাভ! তাই বলছি, তুমি ঠিকই বলেছিলে, হিমানী।'

'কি বলেছিলাম!' বিড়বিড় করে উঠলো হিমানী। 'ভুলে গেছি সব।'

'সেটাই ভালো,' সায় দিয়ে বললো কেতী। 'আমিও সব ভুলে গেছি। বোধহয় কামিনীও কিছু মনে রাখেনি, কি বলো, কামিনী?'

কথা না বলে কেতীর দিকে তাকিয়ে থাকলো কামিনী। কেতীর কথা বলার ঢঙে এমন কিছু রয়েছে, প্রচ্ছন্ন একটা হুমকির সুর, ভালো লাগলো না তার। এতোদিন ভেবে এসেছে, কেতী আসলে বোকা, মোটামুটি সরল, কারো সাতে-পাঁচে বিশেষ থাকে না। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, কেতী আর হিমানী পরস্পরের সাথে জায়গা বদল করেছে। রণ-রঙ্গিনী হিমানীর সেই দাপট আর নেই, কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে সে। আর শান্ত, শান্তিপ্রিয় কেতীর হাবভাবে পরিষ্কার ফুটে উঠছে কর্তৃত্ব, যেন হিমানীকে কোণঠাসা করার মধ্যেই তার যতো আনন্দ।

কিন্তু মানুষ তো আসলে কখনো বদলায় না, নাকি বদলায়?

ভাবতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠলো কামিনীর কাছে। গত কয়েক হপ্তা ধরেই এসব লক্ষ্য করছে সে। সত্যি ওরা দু'জনেই কি বদলেছে, নাকি একজন বদলে যাওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে আরেকজনের ওপর? কেতী কি সত্যি দজ্জাল, হিংস্র আর ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে? নাকি হঠাৎ করে হিমানী একেবারে নেতিয়ে পড়ায় অমন মনে হচ্ছে?

হিমানী যে বদলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সেই কর্কশ, পুরুষালি, ঝগড়াটে গলা আর শুনতে পাওয়া যায় না। আগের মতো মাটি কাঁপিয়ে, দুপদাপ শব্দ করে হাঁটে না সে। একটু যেন কুঁজো হয়ে গেছে, হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব। কে জানে কোথায় গেল তার সেই দাপট আর আত্মবিশ্বাস। প্রথম প্রথম কামিনী মনে করেছিল নফরেত মারা যাওয়ায় ধাক্কা খেয়েছে হিমানী, তাই এমন করছে। কিন্তু সে-ধাক্কা এতো দিনে সামলে ওঠার কথা হিমানীর। তা না, দিনে দিনে আরো যেন খারাপের দিকে যাচ্ছে সে। কামিনী লক্ষ্য করেছে, নফরেতের নাম উঠলেই শিউরে ওঠে হিমানী, আতংকিত চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। ইয়ামোও স্ত্রীর এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন। এতোদিন স্ত্রীই তাকে শাসন করে এসেছে, উঠতে বসতে শাসিয়েছে, নির্বিরোধী ইয়ামো শান্ত ভাবে মেনে নিয়েছে সব। কিন্তু এখন তার আচরণে আশ্চর্য একটা কঠোর, দৃঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। হিমানী আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, কেতী আর ইয়ামো সেটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে, অনেকটা যেন এই রকম মনে হয়।

তবে এ-কথা ঠিক যে হিমানীর এই পরিবর্তন পরিবারের জন্যে ভালোই হয়েছে, আগের সেই রোজকার অশান্তি আর নেই। কিন্তু

তবু ব্যাপারটাকে ঠিক যেন মেনে নিতে পারছে না কামিনী। কেমন যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ খচ করে বেঁধে তার মনে।

হঠাৎ করেই, প্রায় চমকে উঠে, লক্ষ্য করলো কামিনী, তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কেতী। মনে হলো, এই মাত্র যা বলেছে সে, তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে কেতী। কামিনী কথা বলছে না দেখে আবার কথাটা বললো সে, 'কি, ঠিক বলিনি, কামিনী? সব ভুলে যাওনি তুমি? নাকি মনে রেখেছো?'

হঠাৎ করেই মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো কামিনীর। কি তার মনে আছে আর কি তার মনে নেই সেটা জোর করে কেউ তার মুখ থেকে বের করতে পারবে না। কেউ তাকে কিছু ভুলে যেতে বললো, আর সে ভুলে গেল, এ হতে পারে না। ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখে কেতীর দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না।

'বাড়ির মেয়েদের,' বললো কেতী, 'এক থাকতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ তাদের সবার স্বার্থ এক।'

দ্রুত মাথা নাড়লো কামিনী। ভাবলো, আমি আর কারো মতো নই, তাই আমার স্বার্থও আর কারো মতো নয়। আমি কামিনী, আমার আলাদা একটা বোধ আছে। মুখে বললো, 'ব্যাপারটা কি এতোই সহজ?'

'কামিনী। তুমি কি বিপদ ডেকে আনতে চাও?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলো কেতী।

'না। বিপদ মানে? ঠিক কি বলতে চাও তুমি?'

'সেদিন বড় ঘরে যে যা বলেছে, সব ভুলে যাওয়াই ভালো। তা

না হলে বিপদ হতে পারে।'

হেসে উঠলো কামিনী। 'তুমি একটা বোকা, কেতী। দাসী-বাঁদী,-দাদী-আম্মা—কারো শুনতে বাকি ছিলো? যা ঘটেছে তা ঘটেনি ভান করে কি লাভ, বলো?'

'সেদিন আমরা যা বলেছি, রাগের মাথায় বলেছি,' ভোঁতা গলায় বললো হিমানী। 'সত্যি সত্যি কারো কোনো ক্ষতি করার জন্যে বলিনি।' কেতীর দিকে ফিরলো সে। 'এ বিষয়ে আর কিছু না বললেই ভালো হয়, কেতী। কামিনী যদি গোলমাল পাকাতে চায়, পাকাক।'

'গোলমাল পাকাবার মেয়ে যে আমি নই তা তোমরা ভালো করেই জানো,' বললো কামিনী। 'কিন্তু আমার কথা হলো, ভান করবো কেন।'

'ভান করবে এই জন্যে যে,' বললো কেতী, 'সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। তোমাকে তানির কথা ভাবতে হবে।'

'আমার তানি ভালোই আছে।'

'আমরা সবাই ভালো আছি—কারণ, নফরেত বেঁচে নেই।' কেতীর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

হাসিটা লক্ষ্য করলো কামিনী। ভেবে আশ্চর্য হলো, একজন মানুষ মারা যাওয়ায় আরেকজন মানুষ এতো খুশি হয় কিভাবে। হোক না সে শত্রু!

সবাই চলে যাওয়ার পরও লেকের ধারে চুপচাপ বসে থাকলো কামিনী। সূর্য দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে, এই সময় দূর থেকে কামিনীকে দেখতে পেয়ে তার পাশে এসে বসলো মোহন। 'এরপর বাইরে বসে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে তোমার, কামিনী।'

ভারি, ভরাট কণ্ঠস্বর, শোনার সাথে সাথে সারা শরীরে একটা স্বস্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ে। এই একজনকেই নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে কামিনী। মুখে একটা প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে ফিরলো সে। 'আচ্ছা, বাড়ির মেয়েদের কি সবাইকে এক থাকতেই হবে ?'

'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন, ব্যাপার কি, কামিনী ?'

'কেতী বলছিল। হিমানীরও সেই কথা। আমাদের নাকি সবাই-কে এক থাকতে হবে…'

'কিন্তু তুমি শুধু নিজের কথা ভাবতে চাইছো ?'

'না, তা নয়! কিভাবে যে বুঝিয়ে বলি! মোহনদা, এরা সবাই কেমন যেন বদলে গেছে! এর আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হিমানী…একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সাত চড়েও রা কাড়ে না। কে এই হিমানী, একে তো আমি চিনি না। রাতারাতি একজন মানুষ এতোটা বদলায় কিভাবে ?'

'রাতারাতি নয়।'

'আর কেতী…চিরকাল দেখে এলাম ভীতুর ডিম, শান্ত, কারো সাতে-পাঁচে থাকে না—আজ হঠাৎ করে সে-ই কিনা আমাদের সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে! জানো, মেজদা পর্যন্ত কেতীকে ভয় পেতে শুরু করেছে। এমনকি বড়দাও বদলে গেছে—চিন্তা করতে পারো, সে-ও আজকাল হুকুম করে! হুকুম পালন করা না হলে রেগে আগুন হয়ে যায়!'

'আর এসব দেখে তুমি বুঝি খুব ঘাবড়ে গেছো ?'

'যাবো না!'

'আচ্ছা, তুমি জানো, প্রতিটি সমাধিতে একটা করে চোরা দরজা থাকে ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো মোহন।

অবাক হয়ে তাকালো কামিনী। 'জানি।'

'মানুষের ভেতরটাও সেরকম, বুঝলে। তারা ওই রকম একটা দরজা তৈরি করে—প্রতারণা করার জন্যে। যারা নিজেদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন তারা মিথ্যে আত্মবিশ্বাস, জোর, আর কর্তৃত্ব দিয়ে তৈরি করে দরজাটা—তারপর এক সময় ওগুলোকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারা ভাবে, ওরা বুঝি ওরকম-ই। কিন্তু ওই দরজার ওপারে, কামিনী, শুধুই কঠিন পাথর···আর তাই, বাস্তব যখন এসে সত্যের পালক দিয়ে ওদেরকে স্পর্শ করে, তখন ওদের আসল প্রকৃতি ফিরে আসে, খসে পড়ে মিথ্যে খোলস।'

মাথা নাড়লো কামিনী, বোঝাতে চাইলো মোহনের কথা ভালো বুঝছে না সে।

'কেতীর কথা ধরো। ও নরম। এতোদিন ওকে আমরা আত্মসমর্পণ করতেই দেখেছি। তাতে লাভই হয়েছে ওর, যা যা চেয়েছে সব পেয়েছে ও—স্বামী, ছেলেমেয়ে, নিরাপত্তা। বোকার ভান করে থাকায় জীবন ওর কাছে ফুরফুরে বাতাসের মতো সহজ, সাবলীল হয়েছিল। কিন্তু যেই বিপদের চেহারা নিয়ে বাস্তবতা স্পর্শ করলো ওকে, অমনি তার সত্যিকার প্রকৃতি বেরিয়ে পড়লো। আসলে কেতী বদলায়নি, কামিনী। শক্তি আর নিষ্ঠুরতা ওর মধ্যে এখন তুমি যা দেখছো, সবই ওর ভেতর লুকিয়ে ছিলো এতোদিন।'

'কি জানি। এতো সব বুঝতে কষ্ট হয় আমার। যাকে যা ভাবতাম, হঠাৎ দেখছি সে আসলে তা নয়। আমি···' ঝট্ করে মোহনের দিকে তাকালো সে। ···'আমিও কি ওদের মতো, মোহনদা? কিন্তু কই, আমি তো বদলাইনি···?'

'তাই যদি হয়, এখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে, ভুরু কুঁচকে চিন্তা

করছো কেন ? আগের সেই কামিনী, যে কামিনীর সাথে ঘর বাঁধতে গিয়েছিল, সে কি কখনো এভাবে সময় কাটাতো ?'

'না। তার কোনো দরকার পড়েনি···' হঠাৎ থেমে গেল কামিনী।

'দেখলে তো। তুমি নিজেই কথাটা বলে ফেললে। দরকার অর্থাৎ বাস্তবতা।'

মৃদু গলায় কামিনী বললো, 'আমি···আমি নফরেতের কথা ভাবছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'চেষ্টা করেও ওর কথা আমি ভুলতে পারছি না···।'

'তুমি বোধহয় বিশ্বাস করো, নফরেত দুর্ঘটনায় মারা যায়নি, তাই না ? তোমার ধারণা, তাকে কেউ পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ?'

'না-না ! এ-কথা বলো না !'

'কিন্তু কথাটা যখন মন থেকে সরাতে পারছো না, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করাই ভালো,' বললো মোহন। 'তোমার তাই বিশ্বাস, তাই না ?'

'আমি···হ্যাঁ।'

চিন্তিত দেখালো মোহনকে, মাথা নিচু করে বললো, 'তুমি মনে করো কাজটা সোবেকের, ঠিক ?'

'আর কে হতে পারে, বলো ? সেদিন সাপটাকে কিভাবে মারলো ও, মনে আছে ? সেদিন বড় ঘর থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে যাবার সময়, যেদিন মারা গেল নফরেত, কি বলেছিল ও, মনে নেই তোমার ?'

'আছে বৈকি। কিন্তু, কামিনী, মুখে বললেই কাজটা লোকে করে

না।'

'কিন্তু নফরেত যে খুন হয়েছে এ তুমি বিশ্বাস করো কিনা?'

'করি। কিন্তু এটা একটা ধারণা মাত্র, কামিনী। আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। আসল ঘটনা প্রমাণ করা কোনোদিনই হয়তো সম্ভব হবে না। সেজন্যেই তোমার বাবাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ব্যাপারটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা ছিলো। কিন্তু কেউ একজন ধাক্কা দিয়েছিল নফরেতকে। কে, তা আমরা কোনোদিনও হয়তো জানতে পারবো না।'

'মেজদা নয় বলছো?' মোহনের মুখে কি যেন খুঁজলো কামিনী। 'ও না হলে কে?'

'কে তা জানি না, হয়তো জানতে যদি পারিও, প্রমাণ করতে পারবো না। তবে সোবেক যে নয়, এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত আমি। আমার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই সবদিক থেকে ভালো।'

'তবু, নিশ্চই কাউকে সন্দেহ হয় তোমার, তাই না?'

'কাউকে যদি সন্দেহ করি, সেটা ভুল করেও করতে পারি,' বললো মোহন। 'কাজেই এসব ব্যাপারে চিন্তা না করাই উচিত।'

'কিন্তু তা কি করে হয়—আমাদের মধ্যে একজন খুনী থাকবে, অথচ তাকে আমরা চিনতে পারবো না!'

'হয়তো চিনতে না পারাটাই ভালো হবে—সবার জন্যে।'

মোহনের একটা হাত আঁকড়ে ধরলো কামিনী। 'মোহনদা··· মোহনদা, আমার ভারি ভয় করছে!'

দশ

গ্রীষ্মের প্রথম মাস—এগারো তারিখ

ভাব-গম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হলো শেষ ধর্মীয় আচার। মন্ত্রপূত পানি ছিটানো হলো। গুহার ভেতর, সবশেষে ঘাসের তৈরি একটা ঝাঁটা হাতে তুলে নিলেন পবিত্র হ্যাথর মন্দিরের পরম গুরুদেব মণ্ট, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন তিনি, সেই সাথে গুহার ভেতরটা ঝাঁট দিয়ে শয়তান আর দুষ্ট আত্মার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করলেন। তারপর চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হলো গুহার দরজা।

এমবামারদের ব্যবহার করা যে-সব জিনিস অবশিষ্ট থাকলো, সে-গুলো লাশের সংস্পর্শে এসেছে, সব জড়ো করা হলো এক জায়গায়, তারপর পাশের একটা গুহায় ভরে সেটার দরজাও বন্ধ করে দেয়া হলো।

ধ্যানমগ্ন চেহারা নিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেললো ইমহোটেপ। তার মন প্রশান্তিতে ভরে আছে। ধর্মীয় রীতি পালনে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। খরচ অনেক কমানো হলেও, শেষকৃত

অনুষ্ঠানের যাবতীয় আচার নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যায় নফরেতের আত্মা আরাম পাবে আর সন্তোষ বোধ করবে।

বাড়ির পথ ধরলো সবাই। সেখানে পানাহারের আয়োজন করা হয়েছে। ফেরার পথে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে পুরুষরা। মিশরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা সবাই আশাবাদী। রা রাজা হিসেবে শুধু যোগ্যই নন, তিনি একজন ভালো যোদ্ধা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী। তাঁর নেতৃত্বে মিশর আবার একজোট হতে পারে, আবার ফিরে আসতে পারে পিরামিড নির্মাতাদের স্বর্ণযুগ।

ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালো কামিনী। বন্ধ গুহাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ভয় ছিলো, হয়তো বিস্ফোরিত হবে কেউ, খুনী হিসেবে অভিযুক্ত করা হবে কাউকে। কিন্তু দেবতাদের অশেষ কৃপায় তেমন কিছু ঘটেনি।

বিপদ কেটে গেছে।

নিঃশ্বাসের সাথে ফিসফিস করে উঠলো হেনেট। 'আমিও তাই আশা করি, কামিনী।'

'মানে?' প্রায় ভড়কে উঠে কানী বুড়ির দিকে তাকালো কামিনী।

'তুই কি ভাবছিস আমি জানি,' হেনেটের ঠোঁটে সবজান্তার হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'ভাবছিস, বিপদ কেটে গেছে।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'হয়তো তাই। কিন্তু জানিস তো, অনেক সময় যেটাকে শেষ মনে হয় সেটা আসলে মাত্র শুরু।'

রেগে উঠলো কামিনী। 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আমি মুখ খুললেই তোরা সবাই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠিস...' হেনেটের কুৎসিত চেহারায় অসন্তোষ।

'নফরেত মারা গেল, বাবা তোমাকে এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ?' জানতে চাইলো কামিনী।

'জিজ্ঞেস তো সবাইকেই করেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেছে আমার কথা।'

'কি বলেছো তুমি বাবাকে ?'

'কি আবার বলবো, বলেছি, ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো।' একটা মাত্র চোখ জ্বলজ্বল করছে হেনেটের। 'তুই অন্য কিছু মনে করিস, কামিনী ? কাউকে তোর পছন্দ হয় ?'

কামিনী শুধু মাথা নাড়লো, কথা বললো না।

আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস। তোদের মা তোদেরকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে, সেজন্যেই তো এতো লাথি ঝাঁটা খেয়েও শুধু তোদের ভালো খুঁজি।'

'ভালো তুমি তো নফরেতেরও খুঁজতে।'

'মিথ্যে কথা!' চেহারা বিকৃত করে কামিনীর দিকে ঝুঁকে পড়লো হেনেট। 'এরকম একটা মিথ্যা ধারণা কি করে হলো তোর ?'

'তোমার ওপর খুব বিশ্বাস ছিলো নফরেতের।'

'দেমাকে মাটিতে পা পড়তো না মাগীর! নিজেকে ভারি চালাক মনে করতো!'

'কিন্তু যখন বেঁচে ছিলো, তার পায়েই তেল মাখিয়েছো,' ঝাঁঝের সাথে বললো কামিনী।

'মিথ্যে কথা! ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারতাম না! আমি শুধু মনিবের নির্দেশ মেনেছি, ব্যস। কিন্তু আসল কথা তা নয়। তুই জানিস না লো…'

'আসল কথা ?'

ফিস ফিস করে কামিনীর কানে কানে বললো বুড়ি, 'সত্যি যদি দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, ঝামেলা দূর হয়েছে ভালো হয়েছে। কিন্তু…' কথাটা ইচ্ছে করেই শেষ করলো না হেনেট।

'কিন্তু কি ?'

'এক মেয়ের মা-ই শুধু হয়েছিস, দুনিয়াদারির কিই-বা তুই জানিস। নফরেতের আত্মার কথা বলছি। তার আত্মা যদি অশান্তির মধ্যে থাকে ?'

'থাকলো, তাতে কি ?'

চোখটা বন্ধ করে শিউরে উঠলো হেনেট। 'তাহলে যে কি হবে সে-কথা ভাবতেও আমার ভয় করে, কামিনী।'

দরজায় টোকা পড়লো। 'কামিনী আছিস নাকি ?'

ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো কামিনী। বুকের কাপড় দ্রুত ঠিকঠাক করতে করতে জবাব দিলো, 'এসো, বড়দা।'

দরজা ঠেলে ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকলো ইয়ামো। তার চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ।

'তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতে।' বিছানা থেকে নেমে পড়লো কামিনী। 'বসো। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বড়দা। শরীর খারাপ নয় তো ?'

ম্লান একটু হাসলো ইয়ামো। 'নারে, শরীর খারাপ নয়। হিমানীকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছি, বুঝলি। সে-ব্যাপারেই তোর সাথে কথা বলতে এলাম।' ধীরে ধীরে বিছানার ওপর বসলো ইয়ামো। ইঙ্গিতে পাশের জায়গাটা দেখালো। 'বস।'

কামিনীর চোখে সহানুভূতি ফুটে উঠলো। বসলো না সে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বললো বড় ভাইয়ের সাথে।

'ওর এই পরিবর্তন বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি,' বললো ইয়ামো। 'হঠাৎ কোনো শব্দ হলে ভীষণ চমকে ওঠে। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। এভাবে ও বাঁচবে কিভাবে বল তো? সব সময় কেমন মনমরা হয়ে থাকে। তোরাও ব্যাপারটা নিশ্চই লক্ষ্য করেছিস?'

'হ্যাঁ...।' বিষণ্ণ দেখালো কামিনীকে। হিমানীর জন্যে তার দুঃখ হলো, বড়দার জন্যে মায়া।

'অসুস্থ কিনা কতো বার জিজ্ঞেস করেছি, বলেছি চিকিৎসার দরকার থাকলে বলো, কিন্তু ওর সেই একই কথা—আমার কিছু হয়নি।'

'জানি।'

'তুইও বুঝি জিজ্ঞেস করেছিলি? তোকে কিছু বলেছে?'

'না,' বললো কামিনী। 'কিছু স্বীকার করতে চায় না।'

বিড় বিড় করে বলে চললো ইয়ামো, 'একটা রাতও ভালো করে ঘুমাতে পারে না। ঘুমের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখে কে জানে, চিৎকার করে ওঠে। আচ্ছা, এমন হতে পারে, দুঃখজনক বা ভয় পাবার মতো কিছু ঘটছে, ও জানে কিন্তু আমরা জানি না?'

মাথা নাড়লো কামিনী। 'তা কি করে হয়। ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো আছে। তেমন কিছুই তো ঘটেনি, শুধু...শুধু একজন মারা গেছে। কিন্তু নফরেত মারা যাওয়ায় ভাবীর দুঃখ পাবার বা ভয় পাবার তো কারণ দেখি না।' একটু থেমে কথাটা বলেই ফেললো কামিনী, 'বরং, আমার তো মনে হয়, ওর খুশি হবারই কথা।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ইয়ামোর ঠোঁটে। 'তা যা বলেছিস।

তাছাড়া, ব্যাপারটা আরো আগে থেকে ঘটছে বলে মনে হয়, নফরে-তের মারা যাবারও আগে থেকে।'

ইয়ামোর কণ্ঠস্বর ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে তার দিকে ঝট্ করে তাকালো কামিনী।

ইয়ামো আবার বললো, 'ঠিক বলিনি? ব্যাপারটা আরো আগে থেকে ঘটছে না?'

'কই,' বললো কামিনী, খুব ধীরে ধীরে, 'আমি তো লক্ষ্য করিনি।'

'তোকে কিছুই কি বলেনি ও, ঠিক মনে আছে?' ইয়ামোর কপালে চিন্তার রেখা। 'ভালো-মন্দ কোনো কথাই না?'

মাথা নাড়লো কামিনী। 'কিন্তু বড়দা, ভাবীকে আমার অসুস্থ বলে মনে হয় না। কেমন যেন ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়…।'

'ভয়?' ভারি অবাক দেখালো ইয়ামোকে। 'কি বলছিস? ওর মতো সাহসী মেয়ে এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি আছে আর? তাছাড়া, কাকে ভয় করবে ও? কেন?'

অসহায় দেখালো কামিনীকে। 'জানি, ভয় পাবার মেয়ে নয়, কিন্তু তবু…মানুষ তো বদলায়ও…।'

'তোর কি মনে হয়, কেতী কিছু জানে? হিমানী কি ওকে কিছু বলেছে?'

'বললে কেতীকে নয়, আমাকেই বলতো। উঁহু, কেতীকে কিছু বলবে না।'

'ওর ব্যাপারটা নিয়ে তোরা আলাপ করছিস? তুই আর কেতী?'

'না। কে কেমন আছে না আছে তা নিয়ে কেতীর কোনো মাথা-ব্যথা নেই।' মনে মনে কামিনী ভাবলো, হিমানীর এই মানসিক বিপর্যয়ের সুযোগ পুরোমাত্রায় নিচ্ছে কেতী। ভালো কাপড়চোপড়,

ভালো খাবারদাবার নিজের আর নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে আগে-ভাগে হাতিয়ে নিচ্ছে সে, হিমানী সুস্থ থাকলে যা কোনো দিনই সম্ভব হতো না। এসবই লক্ষ্য করে হিমানী, কিন্তু কিছু বলে না। অন্য সময় হলে দুই জা তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠতো। হিমানীর এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে বাড়ির সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে।

'তুমি দাদী-মার সাথে কথা বলেছো?' জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

'দাদী মা,' বিড়বিড় করে বললো ইয়ামো, আড়ষ্ট একটা ভাব দেখা গেল তার চেহারায়, 'বলে, এই নতুন হিমানীকে নিয়ে আমার নাকি খুশি থাকা উচিত। হিমানী বদলে যাওয়ায় বাড়িতে নাকি এখন শান্তি আছে।'

একটু ইতস্তত করে কামিনী জানতে চাইলো, 'হেনেটকে কিছু জিজ্ঞেস করেছো?'

ভুরু কোঁচকালো ইয়ামো। 'না। ওর সাথে কথা বলার কোনো মানে হয় না। বলবো একটা, বুঝবে আরেকটা। বাবা ওকে একেবারে মাথায় চড়িয়ে রেখেছে।'

'হ্যাঁ, বাড়িতে ও একটা যন্ত্রণা,' বললো কামিনী। 'তবু ও আবার সব খবরই রাখে।'

ধীরে ধীরে ইয়ামো বললো, 'ওর সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। তুই জিজ্ঞেস করবি, কামিনী? তারপর কি বললো আমাকে জানাবি?'

'ঠিক আছে...।'

খানিক পরই সুযোগ এসে গেল, তাঁত-ঘরে যাবার পথে দেখা হয়ে গেল হেনেটের সাথে। প্রশ্নটা শুনে হেনেট অস্বস্তিবোধ করছে দেখে অবাকই হলো কামিনী। হেনেটও কেমন যেন বদলে গেছে।

গলার মাদুলি আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো হেনেট, যেন কেউ ওদের কথা শুনে ফেলবে এই ভয়ে মরে যাচ্ছে। 'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবি না! আমি কি জানি? আমি নিজেকে নিয়ে থাকি, কারো ভালো-মন্দের খবর রাখি না। যদি কোনো বিপদ ঘটে, তার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না।'

'বিপদ?'

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলালো হেনেট। 'যদি ঘটেও, তাতে তোর বা আমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা দু'জন এমন কিছু করিনি যে কেউ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে।'

'তুমি কি বলতে চাইছো—কি বলতে চাইছো?'

হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিলো হিমানী। 'এতো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা কেন? আমি কারো সাতে-পাঁচে নেই। সর, আমাকে যেতে দে, অনেক কাজ পড়ে আছে।' তাঁত-ঘরের দিকে চলে গেল বড়ি।

ধীরে ধীরে বাড়িতে ফিরে এলো কামিনী। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল হিমানী, কামিনীর আগমন টের পেলো না। কাঁধে কামিনীর হাত পড়ায় শিউরে উঠে লাফ দিলো সে। তারপর কামিনীকে দেখতে পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'ও, তুমি! এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আমি ভাবলাম...।'

'হিমানী,' জিজ্ঞেস করলো কামিনী। 'তোমার কি হয়েছে বলো তো? আমাকেও বলবে না? বড়দা তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে...।'

কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করলো হিমানী। এতোই ঘাবড়ে গেছে, তোতলাতে শুরু করলো, 'ই-য়া-মো? কি-কি-কি

ব-ললো ?'

'তোমার জন্যে চিন্তায় আছে। ঘুমের মধ্যে তুমি চিৎকার করো···।'

'কামিনী !' খপ্ করে কামিনীর একটা কব্জি চেপে ধরলো হিমানী। 'কি বলেছি আমি ?' আতংকে তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। 'ইয়া-মো··কি জানে সে ? কি বলেছে তোমাকে ?'

'আমাদের ধারণা, তোমার কিছু একটা হয়েছে। তুমি কি অসুস্থ, হিমানী ? কিংবা এমন কিছু ঘটেছে, যেজন্যে মন খারাপ ?'

'না-না, মন খারাপ নয়। কি ঘটবে !'

'তুমি আসলে ভয় পেয়েছো, তাই না ?'

হঠাৎ চেহারায় আক্রোশ নিয়ে কামিনীর দিকে তাকালো হিমানী। 'এ-কথা বললে কেন ? কি এমন ঘটেছে যে ভয় পাবো আমি ?'

'কি ঘটেছে জানি না,' বললো কামিনী। 'কিন্তু কথাটা সত্যি, তাই না ?'

এ যেন সেই আগের হিমানী—পুরুষালি, বদরাগী, রণরঙ্গিনী। 'তোমার সাহস তো কম নয়। আমি আবার ভয় পাবো কাকে ! খবরদার, আমার স্বামীর সাথে আর কখনো আড়ালে কথা বলবে না। ইয়ামো আর আমি, দু'জন দু'জনকে বুঝি আমরা, আমাদের মধ্যে মনের মিল আছে। কেউ তাতে ভাঙন ধরায় তা আমি চাই না।' থামলো সে, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললো, 'নফরেতের কথা যদি বলো, মাগী মরেছে ভালো হয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারো, এটাই আমার কথা—নফরেত বিদায় হওয়ায় আমি ভারি খুশি।'

'নফরেত ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কামিনী। 'তার কথা

উঠছে কেন ?'

'উঠুক আর নাই উঠুক, আমার কথা আমি জানিয়ে দিলাম!' চিৎকার করে বললো হিমানী, যেন বাড়ির সবার কানে কথাটা তুলতে চাইছে সে। 'নফরেতকে আমি ঘৃণা করতাম। সে মারা যাওয়ায় আমি খুশি।'

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলো হিমানী, কিন্তু ঘরে ইয়ামোকে ঢুকতে দেখে সে যেন একেবারে কেঁচো হয়ে গেল।

ইয়ামোকে কঠোর দেখালো। তার এই চেহারা আগে কখনো লক্ষ্য করেনি কামিনী। স্ত্রীকে সে বললো, 'আস্তে কথা বলো, হিমানী। বাবা শুনলে নতুন করে অশান্তি শুরু হবে। তুমি এমন বোকার মতো আচরণ করছো কেন ?'

হিমানীরও এই চেহারা আগে দেখেনি কামিনী। ইয়ামো ঘরে ঢোকায় জোঁকের মুখে যেন লবণ পড়েছে। বিড়বিড় করে হিমানী বললো, 'দুঃখিত, ইয়ামো। ভুল হয়ে গেছে। সত্যি ভুল হয়ে গেছে ...' কামিনীর মনে হলো, সে এখানে না থাকলে হিমানী সম্ভবত স্বামীর পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেতো।

'ভবিষতে আর এরকম যেন না হয়,' সাবধান করে দিলো ইয়ামো। 'তুমি আর কেতীই এতোদিন বাড়িতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলে। তোমরা মেয়েমানুষরা পারো তো শুধু গলা ফাটাতে।'

দৃঢ় পা ফেলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ইয়ামো, কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে আছে। ইয়ামোর আচরণে এই কর্তৃত্বের ভাব, কামিনীর জন্যে এ-ও নতুন এক অভিজ্ঞতা।

অন্যমনস্ক কামিনী দাদী-মার ঘরে এসে ঢুকলো। আশা, দাদী-মা হয়তো ভালো কোনো পরামর্শ দিতে পারবে। এশা আঙুর

খাচ্ছিলো, কামিনীর কথা মোটেও গুরুত্বের সাথে নিলো না। 'হিমানীকে নিয়ে এতো গবেষণা কেন?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'চেঁচামেচি করে গোটা বাড়ি মাথায় তুলে রাখতো, সেটা বুঝি ভালো লাগতো তোদের? এই তো বেশ, কেতী কারো সাথে ঝগড়া করছে না। এখন শুধু দেখার বিষয় ইয়ামো তার এই কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে কিনা।'

'বড়দা?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, এতোদিনে শিখেছে ইয়ামো কিভাবে বউকে সিধে রাখতে হয়। বোধহয় খুব একচোট মারধর করেছে হিমানীকে, আর তাতেই হিমানী একেবারে গলে ছাতু হয়ে গেছে। তা সে যাক, এবার তোর কথা বল। তুই কেন ওদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করছিস? তারচেয়ে কোহির গল্প কর, শুনতে ভালো লাগবে।'

'কোহির গল্প?' ভুরু কুঁচকে তাকালো কামিনী।

'তোরা [illegible] করিস কোথায় কি ঘটছে তার কিছুই এই বুড়ি জানে না,' দাঁত[illegible] মাড়ি বের করে হাসতে লাগলো এশা। 'এতে লজ্জার কিছু [illegible]কে কামিনী। জীবনের ধর্মই এই। তবে বুঝেশুনে পা ফে[illegible] যাবো[illegible]াগে নিজের মন বোঝ। কোহি লোক খারাপ তা বলছি না [illegible] আজ [illegible]বাপও ওকে ভালো বলে জানে। কিন্তু···।'

থাকবে [illegible]লো কামিনী, 'বুড়ির দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে!'

[illegible]ধরে নিলাম, ভুল করেছি আমি। কিন্তু তাহলেও একটা কথা [illegible] থাকে। এভাবে কতোদিন, সেটা ভেবেছিস? তোর যা বয়ে[illegible] বয়সে আজকাল অনেক মেয়ের বিয়েও হয় না। এমনই ভাগ্য, বিধবা হয়ে ফিরে এলি। কিন্তু এখন? দিন কাটবে কিভাবে?

চোখের সামনে আর তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যাকে ধরে ঝুলে পড়বি—'

চেহারা লাল হয়ে উঠলো কামিনীর। 'তোমার কাছে এলেই শুধু এই সব কথা। আমি এলাম…'

খিক্‌খিক্‌ করে হাসলো এশা। 'এই শেষ ক'টা দিন আমার আর কাজ কি, বল? না কিছু পাওয়ার আছে, না কিছু চাওয়ার। জীবন আমার কাছে এখন স্রেফ একটা কৌতুক। তোরা সবাই কেমন বদলে যাচ্ছিস—দেখি, আর মজা পাই।'

'আবার কে বদলালো?'

'হিমানীর কথা তো নিজেই বললি। তারপর ধর, ইয়ামো—সে-ও বদলেছে। নফরেত মারা যাবার পর, সোবেকও বদলেছে। হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে গেছে সে, যেন তার কোনো অভিযোগ বা দাবি নেই আর। আগের সেই লাফালাফি আলার মধ্যেও দেখছি না। তারপর কেতীর কথা ধর। চুপচাপ ছিলো, এ[illegible] তার মুখে খই ফুটছে। হেনেটও হঠাৎ করে বোবা হয়ে গেছে, [illegible]স করতে কষ্ট হয়।'

'তুমি?' য়ামো[illegible]

'শুধু আমি বদলাইনি,' বললো এশা। 'কখনো ব[illegible]লিয়ে[illegible]ও না। কারণ, আমার কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো ভয় নেই।' [illegible]ত।'

'ভয়?' [illegible] উচু

'আমার কথা থাক, তোর কথা বলি,' গম্ভীর হলো [illegible]নো[illegible] 'তুই কি জানিস, নফরেত আর কোহি একই শহর থেকে এ[illegible] অথচ মজার ব্যাপার হলো, কোহির নজর পড়লো তোর ওপর[illegible]দী-[illegible]

'আমি যাই,' দ্রুত বললো কামিনী। 'দেখি তানি কি করছে।'

'নফরেত তোকে ঘেন্না করতো, তা জানতি ?' জিজ্ঞেস করলো এশা।

'কেন, নফরেত আমাকে ঘেন্না করবে কেন ?'

'ওই যে বললাম, কোহির নজর···।'

'সত্যি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বলে আর দাঁড়ালো না কামিনী। শুনতে পেলো, পিছন থেকে খিলখিল করে হাসছে দাদী-মা।

উঠনে বেরিয়ে এসে লেকের দিকে এগোলো কামিনী। বারান্দা থেকে তাকে ডাকলো কোহি।

'নতুন একটা গান বেঁধেছি, কামিনী। শুনবে ?'

মাথা নাড়লো কামিনী, হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে আছে। নফরেত আর কোহি। কোহি আর নফরেত। বুড়িটা এই চিন্তা তার মাথায় ঢোকালো কেন। আর, তার নিজেরই বা এতোটা ক্ষেপে ওঠার কি কারণ।

পিছন থেকে গেয়ে উঠলো কোহি, সেই পুরানো গানটা, 'আমি মেক্সিসে যাবো, যাবো সত্য দেবতা পাথার কাছে। তাকে আমি বলবো, আজ রাতে তুমি আমাকে আমার বোন এনে দাও। তার চোখে থাকবে মায়া, মনে থাকবে মধু···।'

'কামিনী।'

তীরে দাঁড়িয়ে নীলনদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কামিনী, এ জগতেই যেন নেই। আবার তাকে ডাকলো মোহন। এবার সম্বিত ফিরলো কামিনীর, ঘাড় ফিরিয়ে মোহনকে দেখে মিষ্টি করে হাসলো। 'কখন এলে, মোহনদা ?'

'অমন মগ্ন হয়ে কি ভাবছিলে বলো তো ?' জিজ্ঞেস করলো মোহন, কামিনীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

'ভাবছিলাম কাসিনের কথা। আচ্ছা, মোহনদা, মানুষ মরে গেলে কি হয় তার ? সত্যি কথাটা কেউ কি জানে ?'

কয়েক মুহূর্ত কামিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলো মোহন, তারপর হাসলো।

'কফিনে যে লেখাগুলো থাকে, তার কিছু কিছু এমনই জটিল, কেউ অর্থ করতে পারে না,' বললো কামিনী। 'আমরা শুধু জানি অসিরিস খুন হয়েছিল, কিন্তু তার শরীর জোড়া লাগানো হয়েছিল আবার। জানি, সাদা মুকুট পরেন তিনি। আরো জানি, তার মৃত্যু নেই বলে আমাদেরও মৃত্যু নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরও মানুষ বেঁচে থাকে বলে যে কথাটা শুনি, সেটা কিরকম বেঁচে থাকে, বলতে পারো ? এসব নিয়ে চিন্তা করতে গেলে কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি···।'

'আমার জানা নেই, কামিনী। এসব প্রশ্ন তুমি কোনো পুরোহিত-কে করে দেখতে পারো।'

'পুরোহিতরা তো শুধু দায়সারা গোছের কথা বলে। আমি আসল কথাটা জানতে চাই।'

নরম সুরে মোহন বললো, 'আমার মনে হয়, নিজেরা না মরলে আসল কথাটা কোনোদিনই জানা যাবে না।'

শিউরে উঠলো কামিনী। 'অমন কথা বলো না।'

'তোমার কিছু হয়েছে, কামিনী ?'

'দাদী-মা আমার মন খারাপ করে দিয়েছে,' বলে থামলো কামিনী, একটু পর আবার বললো, 'আচ্ছা, তুমি কি জানো, মোহনদা, এখানে আসার আগে নফরেত আর কোহির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিলো ?'

মোহনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। 'ও, তাহলে এই ব্যাপার।'

মোহনের দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো কামিনী, ঘুরে বাড়ির পথ ধরলো সে। বললো, 'এই ব্যাপার মানে? তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করলাম, আর তুমি…।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কামিনীকে অনুসরণ করলো মোহন, তার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে বললো, 'দক্ষিণে নফরেত আর কোহি পরস্পরকে চিনতো, কিন্তু ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিলো কিনা তা তো আমি জানি না। কেন বলো তো?'

'না, এমনি।' মোহনের দিকে তাকালো না কামিনী।

'এখন আর কিছু এসেও যায় না,' বললো মোহন। 'নফরেত মারা গেছে। আর, নফরেত মারা যাওয়ায় কোহি যে খুব মুষড়ে পড়েছে তাও নয়।'

ঝট্ করে মোহনের দিকে তাকালো কামিনী। 'তা সত্যি। কোহি আগে যেমন ছিলো এখনও তেমনি আছে। নফরেতের ব্যাপারে তার কোনো দুর্বলতা থাকলে…।'

'ছিলো বলে মনে হয় না।'

মোহনের একটা হাত চেপে ধরলো কামিনী। 'তোমার সাথে কথা বলে মন আমার ভালো হয়ে গেল।'

ক্ষীণ একটু হাসলো মোহন। 'খুকী কামিনীর সিংহ মেরামত করতাম আমি। এখন তার অন্য খেলনা হয়েছে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে বাঁক নিয়ে অন্য পথ ধরলো কামিনী। 'সবাই কেমন যেন হয়ে গেছে, ওদের কাছে এখুনি আমি ফিরতে চাই না। পাহাড়ে উঠতে পারি না আমরা, মোহনদা? সমাধি প্রাঙ্গণে চুপচাপ বসে থাকলেও মনে শান্তি লাগে। যাবে, মোহনদা?'

'হ্যাঁ, ওখানে শান্তি আছে,' বললো মোহন। একটু অন্যমনস্ক দেখালো তাকে। 'তার কারণ, নিচে থাকলে তুমি শুধু ঘর-সংসার, হিংসা-বিদ্বেষ, ফসল আর বন্যা দেখতে পাও। কিন্তু ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়—গোটা মিশর সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কি জানো, কামিনী, মিশর সম্পর্কে ভাবা উচিত আমাদের। বোঝা যাচ্ছে, জোড়া লেগে আবার এক হবে এই দেশ। অতীতে যেমন ছিলো, শক্তিশালী—আবার সেই শক্তি ফিরে পাবে মিশর···।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে যায়, মোহন?'

'দেশ, কামিনী, দেবতাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ,' বললো মোহন। 'দেবতাদের আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি। দেশ বড় হলে, শক্তিশালী হলে নিশ্চই তাতে আমাদের সবার লাভ।'

'তোমার এসব কথা আমি বুঝি না,' বলে পাহাড়ের দিকে তাকালো সে। 'ওই দেখো, কারা আসছে।'

সরু পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসছে ইয়ামো আর হিমানী।

'সমাধি প্রাঙ্গণে গিয়েছিল ওরা,' বললো কামিনী।

পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে পথটা। একদিকে পাহাড়ের খাড়া শরীর, আরেক দিকে গভীর খাদ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মোহন বললো, 'হ্যাঁ। প্রাঙ্গণ থেকে কিছু জিনিস সরাবার দরকার ছিলো। এমবামরা ওগুলো ব্যবহার করেনি।'

'কি জিনিস?'

'লিনেন, টুকিটাকি আরো দু'একটা জিনিস,' বললো মোহন। 'ইয়ামো আমাকে বলছিল, হিমানীকে ওখানে নিয়ে গিয়ে ওগুলো

কোথায় সরানো যায় আলাপ করবে।'

ওরা দু'জন, কামিনী আর মোহন, দাঁড়িয়ে পড়লো—ইয়ামো আর হিমানীর নেমে আসা দেখছে।

হঠাৎ করেই একটা কথা মনে পড়ে গেল কামিনীর। নফরেত যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিল, হিমানী আর ইয়ামো ঠিক সেই জায়গার দিকে এগিয়ে আসছে।

আগে আগে হাঁটছে হিমানী। তার খানিকটা পিছনে রয়েছে ইয়ামো।

আচমকা ইয়ামোকে কিছু বলার জন্যে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালো হিমানী। কামিনী ভাবলো, হিমানী বোধহয় বলতে চাইছে ঠিক এখান থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল নফরেত।

তারপর, হঠাৎ করে, শিউরে উঠে একেবারে পাথর হয়ে গেল হিমানী। এখনো সে ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ঝাঁকি খেলো সে, ভয়ংকর কি যেন দেখতে পেয়েছে, বা হয়তো অদৃশ্য কিছুর একটা ধাক্কা খেয়েছে। হাত দু'টো শূন্যে উঠে পড়লো। চিৎকার করে কি যেন বললো সে। দ্রুত সামনে পা বাড়াতে গিয়ে হোঁচট খেলো, মনে হলো তাল হারিয়ে ফেলবে। টলমল করছে পা দু'টো।

লাফ দিয়ে হিমানীকে ধরতে এলো ইয়ামো, হাত দু'টো সামনে বাড়ানো।

আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো হিমানীর গলা চিরে।

বিস্ফারিত হয়ে উঠলো কামিনীর চোখ জোড়া, চিৎকারটা শুনে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

হিমানী টলতে টলতে পড়ে গেল, নাকি স্বেচ্ছায় লাফ দিলো,

সে। শূন্যে ডিগবাজি খেলো শরীরটা। তারপর নিচের দিকে মাথা দিয়ে সোজা নেমে আসতে লাগলো পাথরের দিকে।

দু'হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে তাকিয়ে আছে কামিনী। অনেক উঁচু থেকে তীর বেগে নিচে নেমে আসছে হিমানী। ওপর দিকে তাকিয়ে ইয়ামোকে দেখলো সে। পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। হিমানীর কাছে পৌঁছুতে পারেনি সে, তার আগেই হিমানী কিনারা থেকে পড়ে গেছে।

এতোটা দূর থেকেও পতনের আওয়াজটা পেলো ওরা। আরেকবার শিউরে উঠলো কামিনী। চোখ বুজে ছিলো, এরপর তাকাতেই দেখলো পাথরের ওপর নিঃসাড় পড়ে রয়েছে হিমানী। ঠিক ওখানেই পাওয়া গিয়েছিল নফরেতের লাশ।

নিজেকে সামলে নিয়ে সেদিকে ছুটলো কামিনী। শুনতে পেলো পাহাড়ী রাস্তার ওপর থেকে চিৎকার করছে ইয়ামো, ছুটে নেমে আসছে নিচে।

সবার আগে কামিনী পৌঁছুলো। হিমানীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে, হাঁটু ভাঁজ করে বসলো তার পাশে। হিমানীর চোখ দু'টো খোলা, চোখের পাতা নড়ছে। ঠোঁট জোড়াও নড়ছে, কি যেন বলতে চায় সে। আরো ঝুঁকলো কামিনী, হিমানীর ঠোঁটের কাছে কান রাখলো।

প্রথমে কিছুই শুনতে পেলো না কামিনী। তারপর কর্কশ, ভোঁতা গোঙানির মতো অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেলো।

'নফরে...।'

নামটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারলো না হিমানী, তার মাথা

দাঁড়িয়ে পড়ে ইয়ামোর জন্যে অপেক্ষা করছিল মোহন, লাশের কাছে একসাথে ছুটে এলো ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে বড়দার দিকে তাকালো কামিনী। জিজ্ঞেস করলো, 'চিৎকার করে কি বললো ভাবী, পড়ে যাবার আগে?'

হাঁপরের মতো হাঁপাচ্ছে ইয়ামো, কথা বলার শক্তি নেই। 'ঘাড় ফিরিয়ে আমার পিছনে তাকালো ও···যেন আমার পিছনে কাউকে দেখতে পেয়েছে···অথচ আমাদের পিছনে কেউ ছিলো না।' দম নিলো ইয়ামো।

মোহন ঠাণ্ডা সুরে বললো, 'না, তোমাদের পিছনে কেউ ছিলো না।'

ইয়ামো নিচু গলায়, অনেকটা ফিসফিস করে বললো, 'তারপর··· তারপর হঠাৎ হিমানী চিৎকার করে বললো—'

'কি বললো?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলো কামিনী।

ইয়ামো কাঁপছে, আতংকে বিস্ফারিত তার চোখ। 'বললো···,' কাঁপা কাঁপা গলায়, থেমে থেমে কথা বলছে সে, '···বললো, ওই ···ওই নফরেত···ওই নফরেত আসছে।'

এগারো

গ্রীষ্মের প্রথম মাস—বারো তারিখ

'তুমি তাহলে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলে?' মোহনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো কামিনী। 'তাহলে হিমানীই নফরেত-কে খুন করেছে···?'

মোহন কোনো মন্তব্য করলো না, চোখে উদাস দৃষ্টি নিয়ে দূর দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে। সমাধির পাশে, মোহনের ক্ষুদে পাথুরে গুহা-মুখে বসে আছে ওরা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচের উপত্যকার দিকে তাকালো কামিনী। মাথার ওপর দাউ দাউ সূর্য জ্বলছে, রূপালি ফিতের মতো এঁকেবেঁকে দিগন্তরেখার ওপারে চলে গেছে নীলনদ। জীবন আর মৃত্যুর কথা ভাবছে কামিনী। কাসিন মারা গেছে, মারা গেছে নফরেত আর হিমানী। তারা যারা বেঁচে আছে, সে আর মোহন, বাকি আর সবাই, তারাও একদিন মারা যাবে। মৃত্যুর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। কিন্তু দেবতারা অনন্ত-কাল স্বর্গ-মর্ত্যে বিচরণ করবেন। আর নীলনদও থাকবে, এমনি বয়ে চলবে চিরটিকাল।

হিমানী আর নফরেত…

'অথচ আমি প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম সোবেকই…।'

'সোবেককে তুমি সাপ মারতে দেখেছিলে, ও যে নিষ্ঠুর এই ধারণাটা তোমার মনে আগে থেকেই জন্ম নেয়,' বললো মোহন। 'সেজন্যে ওকেই তোমার সন্দেহ হয়।'

'দেখো কি বোকা আমি,' বললো কামিনী। 'হেনেট আমাকে বললো, হিমানী এদিকে হাঁটতে এসেছে, বললো তার আগে নফরেতকেও এদিকে আসতে দেখেছে ও। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিলো, নফরেতের পিছু নিয়ে এদিকে এসেছে হিমানী। আমার মনে পড়া উচিত ছিলো এর মাত্র কিছুক্ষণ আগে স্বামী আর দেওরদের কাপুরুষ বলে গাল দেয় হিমানী। নফরেতকে খুন করার প্রস্তাবটা সেই প্রথম তোলে।'

শিউরে উঠলো কামিনী। 'তারপর, এদিকে আসার পথে হিমানীর সাথে দেখা হলো আমার। ওকে দেখেই ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিলো। হিমানীর ওই চেহারা আগে কখনো দেখিনি আমি। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে। এদিকে আমাকে আসতে দিতে চাইছিল না। আসলে আমাকে সে নফরেতের লাশ দেখতে দিতে চাইছিল না। আচ্ছা, তুমি কি ধারণা করতে পেরেছিলে, হিমানী খুন করেছে নফরেতকে?'

'ঠিক ওভাবে ভাবিনি আমি,' বললো মোহন। 'তবে, এটুকু বুঝেছিলাম, হিমানীর অদ্ভুত আচরণেরমধ্যেই, তার হঠাৎ এরকম বদলে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নফরেত হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা।'

'অথচ কিছুই বলোনি তুমি।'

'কি করে বলি, কামিনী? আমার হাতে প্রমাণ কই?'

'অপরাধ প্রমাণ করতে হলে নিরেট বাস্তব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। এমন কি, অনেক সময় চোখে যা ধরা পড়ে, বাস্তব ঘটনা তার চেয়ে অন্যরকম হতে পারে। হিমানীর কথাই ধরো। ওকে তো আমরা দু'জনেই পড়ে যেতে দেখলাম। বাস্তব ঘটনা হলো, ও নিজে থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু আসলে কি তাই?'

ঝট্ করে মোহনের দিকে ফিরলো কামিনী। 'মোহনদা, ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখেছিল হিমানী? আমরা তো কাউকেই দেখলাম না। কিছু থাকলে তো দেখবো। কিন্তু হিমানী নিশ্চই কিছু একটা দেখেছিল। কি সেটা, মোহনদা?'

ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো মোহনের ঠোঁটে, পরক্ষণে সেটা মিলিয়ে গেল। 'কি দেখেছিল? হয়তো একটা ছবি দেখেছিল। যে ছবি তাকে দেখিয়েছে তারই মন।'

'তোমার কথা···তুমি এমন হেঁয়ালি করে কথা বলো কেন, মোহনদা?' অসহায় দেখালো কামিনীকে। 'আমি শুধু জানতে চাই, বিপদ কেটে গেছে কিনা। নাকি আরো খুন হবে?'

কামিনীর হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো মোহন, অভয় দিয়ে বললো, 'দুশ্চিন্তা করা একদম বোকামি। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তো আছি।'

'হিমানী নিশ্চই নফরেতকে দেখতে পেয়েছিল। নফরেতের আত্মা প্রতিশোধ নিয়েছে।' আবার শিউরে উঠলো কামিনী। 'দাদী-মা বললো, নফরেত নাকি আমাকেও ঘৃণা করতো। তাই যদি হয়···।'

'বলেছি তো, অন্তত তোমার কোনো ভয় নেই, কামিনী,' জোর গলায় আশ্বাস দিলো মোহন। 'তোমার ওপর সব সময় একটা চোখ

'কিন্তু কখনো যদি একা পাহাড়ী পথ দিয়ে আসি, যদি ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাই, নফরেতকে দেখতে পাবো না তো? বাড়ির সবাই বলাবলি করছে, এই পথে একা আর আসা-যাওয়া করা যাবে না। এদিকে নাকি নফরেতের আত্মা ঘোরাফেরা করছে।'

মোহনের বলতে ইচ্ছে করলো, নফরেতকে ভয় পাবার কোনো দরকার নেই। হিমানীকে নফরেত খুন করেনি। কিন্তু এসব কথা বললেই খুনি কে জানতে চাইবে কামিনী। সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'কামিনী, নফরেত তোমাকে ঘৃণা করতো কিনা আমি জানি না। তবে এ-বাড়ির বোধহয় সবাইকেই কমবেশি ঘৃণা করতো সে। কিন্তু কথা হলো, তুমি নফরেতের কোনো ক্ষতি করোনি। কাজেই সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

'তাহলেই আমি খুশি,' বললো কামিনী। 'চলো, এবার আমরা নিচে নামি।'

'হ্যাঁ, চলো,' বললো মোহন। উঠে দাঁড়ালো সে। 'শুনতে পাচ্ছো, কামিনী?'

'কি? কই?'

'ভালো করে কান পাতো,' বললো মোহন। 'কিছুই কি শুনতে পাচ্ছো না?'

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শো শো আওয়াজ করছে বাতাস। 'কই, না।'

'কোহি গান গাইছে, শুনতে পাচ্ছো না?' কামিনীর দিকে বিষাদ-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে মোহন।

'ও, হ্যাঁ, কোহি গান গায়—,' হঠাৎ ঝট্ করে মোহনের দিকে

ফিরলো কামিনী। 'তারমানে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো, মোহনদা? কোহি এই মুহূর্তে গাইছে কিনা আমি জানি না; যদি গায়ও, এখান থেকে শুনতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না। নদীর পাড় বা আমাদের বাড়ির উঠন এখান থেকে অ-নে-ক দূরে।'

মোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কিন্তু তার চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নাড়লো কামিনী। একটু রাগ হলো তার, সেই সাথে মোহনের কথা বুঝতে না পারায় খানিকটা বিস্ময় বোধ করলো।

গ্রীষ্মের প্রথম মাস—তেইশ তারিখ

কুঁজো বুড়ি দোরগোড়া থেকে ভেতরে উঁকি দিলো, খসখসে গলায় বললো, 'মাগো, একটা কথা বলতে পারি?'

ঝট্ করে দরজার দিকে ফিরলো এশা। 'তোমার আবার কি কথা?'

'কিছু না,' বললো হেনেট, বসন্তের দাগে ভরা মুখের প্রতিটি ভাঁজ আর রেখা জ্যান্ত হয়ে উঠলো। 'এই এইটা তোমাকে দেখাতে এলাম।' পিছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এসে একটা অলংকারের বাক্স দেখালো সে।

কিশোরী দাসীকে ইঙ্গিত করলো এশা, কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। ঘরে ঢুকলো হেনেট। অলংকারের ছোটো বাক্সটা ধরিয়ে দিলো এশার হাতে। বাক্সের ঢাকনিটা ঠেলে সরিয়ে দেয়া যায়, মাথার ওপর দুটো বোতাম রয়েছে, বোতামের গলায় সিল্কের লুপ পরানো।

'এটা তার।'

'কার কথা বলছো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো এশা। 'হিমানী?'

'না-না। এক নম্বরটার কথা বলছি।'

'তারমানে নফরেত? ও, আচ্ছা, নম্বর দিয়ে ফেলেছো, তাই না? কত নম্বরে গিয়ে এর শেষ হবে তাও নিশ্চই জানো?' হেনেটের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো বৃদ্ধা।

তার ইঙ্গিত এবং ক্রোধ গায়ে মাখলো না কানী বুড়ি। 'এটা আমি তার ঘরে পেলাম, মা। তার সমস্ত অলংকার, টয়লেট সরঞ্জাম, সুগন্ধি ভরা কৌটা - যা কিছু ছিলো, সব লাশের সাথে কবরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা তাহলে কিভাবে এলো?'

বোতামের গলা থেকে সিল্কের লুপ খুলে ভেতরে তাকালো এশা। গোলাপি পুঁতির একটা মালা, মাঝখানে চকচকে একটা মাদুলির অর্ধেক অংশ। আর কিছু নেই বাক্সে। 'কোত্থেকে আবার আসবে,' বললো এশা। 'এমবামরা ভুল করে রেখে গেছে।'

হেনেটের একটা চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে। 'কিন্তু এম-বামরা সব নিয়ে চলে যাবার পর তার ঘরে আমি গিয়েছিলাম, তখন তো এটা দেখিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে হেনটের দিকে তাকালো এশা। 'তোমার কাজই তো কুমতলব আঁটা। এবার কি মতলব ফেঁদেছো বলো দেখি। এই ভৌতিক গুজব ছড়িয়ে তোমার লাভ কি?'

'আমাকে তুমি খামোকা দুষছো। হিমানীর কপালে কি ঘটেছে আমরা সবাই জানি। কেন ঘটেছে তাও জানি।'

'হয়তো জানি,' এশার সুরে ব্যঙ্গ ঝরলো। 'হয়তো আমাদের মধ্যে

কেউ আগে থেকেই জানতো হিমানীর কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে। তাই না, হেনেট? আমার তো বিশ্বাস, নফরেত কিভাবে মরলো, আমাদের সবার চেয়ে তুমিই সেটা ভালো জানো।'

'মা, তুমি নিশ্চই ভাবছো না…?'

'কেন ভাববো না? গত দু'মাস ধরে ভয়ে একেবারে সিটকে ছিলো হিমানী। সে ভয় নিশ্চই মৃত্যুভয় ছিলো। কাল থেকে আমার ধারণা হয়, কেউ বোধহয় ভয় দেখাচ্ছিল হিমানীকে তার—গোপন কথাটা ইয়ামো বা ইমহোটেপকে বলে দেবে। আমার জানতে ইচ্ছে করে কি সেই গোপন কথা। কে সব ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল তাকে।'

খসখসে গলায় হড়বড় করে প্রতিবাদ জানালো হেনেট। চোখ বুজে ঝড়টা থামার অপেক্ষায় থাকলো এশা, তারপর আবার বললো, 'নিজের দোষ স্বীকার করবে তুমি? দুনিয়াটা তাহলে বদলে যেতো। তোমার অনেক কাজেরই আমি কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না, হেনেট।'

'এটা তোমার একটা ভুল ধারণা,' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললো হেনেট। 'তোমার বুঝি ধারণা চুপ করে থাকার বিনিময়ে হিমানীর কাছ থেকে সুবিধে আদায়ের চেষ্টা করছিলাম আমি, তাই না? নয় দেবতার কিরে খেয়ে বলছি…।'

'তোমার মুখে দেবতাদের নাম মানায় না, হেনেট,' বললো এশা। 'আমার ধারণা, বাক্সটা তুমিই নফরেতের ঘরে রেখেছিলে। কেন, সে একমাত্র তুমিই জানো। তোষামোদ করে ইমহোটেপকে ভোলাতে পারো, কিন্তু আমাকে পারবে না।'

'ঠিক আছে, মনিবের কাছেই যাই তাহলে, উনি আমাকে বিশ্বাস

করেন,' ঠাণ্ডা গলায় বললো হেনেট।

'বাক্সটা আমার কাছে থাকলো,' বললো এশা। 'আর হ্যাঁ, এটাকে পুঁজি করে ভৌতিক গুজব ছড়াতে পারবে না তুমি। হিমানী না থাকায় বাড়িতে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছে। জীবিত নফরেতের চেয়ে মৃত নফরেত আরো বেশি ক্ষতি করে গেছে আমাদের। কিন্তু এবার শান্তি চাই। তুমি তাতে বাদ সেধো না, হেনেট। তার পরিণতি তোমার জন্যেও হয়তো ভালো হবে না।'

'এসব কি?' মায়ের ঘরে ঢুকে বললো ইমহোটেপ। 'হেনেট হাউমাউ করে কাঁদছে। আমার ভালো-মন্দের দিকে একমাত্র ওরই নজর আছে, অথচ কেউ তোমরা ওকে দেখতে পারো না।'

মুচকি হাসি দেখা গেল বৃদ্ধা এশার ঠোঁটে।

'মা, তুমি ওকে চোর বলেছো? বলেছো, অলংকারের একটা বাক্স চুরি করেছে সে?'

'তাই বললো বুঝি? আর তুই-ও তার কথা বিশ্বাস করলি? এই না হলে ছেলে!' বাক্সটা বালিশের তলা থেকে বের করে ছেলের হাতে ধরিয়ে দিলো এশা। 'এই সেই বাক্স। হেনেট নাকি এটা নফরেতের ঘর থেকে পেয়েছে। তোর বিশ্বাস হয়?'

বাক্সটা নেড়েচেড়ে দেখলো ইমহোটেপ। 'হ্যাঁ, নফরেতকে আমিই এটা দিয়েছিলাম।' বাক্স খুলে ভেতরে তাকালো সে। 'কই, তেমন কিছু তো নেই। নিশ্চই এমবামরা ভুল করে রেখে গেছে। কিন্তু এই সামান্য একটা জিনিস নিয়ে এতো হৈ-চৈ কেন?'

'আমারও তো সেই কথা।'

'এটা আমি কেতীকে···না, কামিনীকে দেবো। নফরেতের সাথে

একমাত্র কামিনীই কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি।' একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেললো সে। 'বাড়ির মেয়েদের এই ঝগড়া-ঝাটি আমার আর ভালো লাগে না…'

'তবু তো একজন এখন নেই।'

'বেচারা ইয়ামো। তবু বলবো, মা, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। হিমানী মোটাসোটা ছেলেপুলে বিয়াতো তা ঠিক, কিন্তু সে যে বাড়িতে একটা অশান্তির কারণ ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বড় ছেলে বউয়ের কথায় উঠতো আর বসতো। তবে শেষ দিকে সত্যি-কার পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছিলো সে। এখন তো রীতিমতো কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও আগের সেই দ্বিধা-সং-কোচ নেই তার। আমি ভুল করলেও সেটা দেখতে পায়, শুধু তাই নয়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেয়। তার ওপর আমি খুশি। ভাবছি, কিছুদিন গেলে আবার ওর একটা বিয়ে দিতে হবে…।'

'বল, বল।'

'কামিনীর কথা ভাবছিলাম। মেয়েটাও তো আমার একা রয়েছে…'

বৃদ্ধার চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। 'ধারণাটা তোর নিজের, ইমহোটেপ? নাকি কেউ তোর মাথায় ঢুকিয়েছে?'

'না-না,' দ্রুত বললো ইমহোটেপ। 'ইয়ামো আর কামিনী কিছু জানে না। কেউই কিছু জানে না। মনে মনে ভাবছিলাম আর কি। কেমন হবে বলো তো?'

'আমি তো সব সময় বলে এসেছি, তোর মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি কম,' কঠিন সুরে বললো এশা। 'কামিনী আর ইয়ামোর বয়সের ফারাকটা ভেবে দেখেছিস? তাছাড়া, পছন্দ অপছন্দের একটা ব্যাপারও তো

আছে ?'

'কামিনীর একবার বিয়ে হলে কি হবে, ওর মতো মেয়ে সাতশো গ্রামে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ···।'

'তাহলেই বোঝ্,' বললো এশা। 'ইয়ামোর মতো লোককে তার পছন্দ হবে কেন ?'

'কেন, ইয়ামো কি আমার অপাত্র ?'

'তা কেন হবে,' বললো এশা। 'কিন্তু সাতশো গ্রামের সেরা মেয়ের স্বামী হবার উপযুক্ত কি ? সেই মেয়ে তাকে যদি পছন্দ না করে ? তাছাড়া, এই বিপদের মধ্যে বিয়ে-টিয়ের কথা তুই ভাবছিস কোন্ আক্কেলে ?'

'বিপদ ? বিপদ তো কেটে গেছে !'

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো এশা। 'তাহলে তো ভালোই। আচ্ছা, ভালো কথা, ইয়ামো আর সোবেককে কর্তৃত্ব দেয়ার কথা কিছু ভাবছিস নাকি ?'

'অংশীদার করে নেয়ার কথা ভাবছি,' বললো ইমহোটেপ। 'কাগজ-পত্র তৈরি হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই সই করবো। আমার তিন ছেলেই আমার ব্যবসার অংশীদার থাকবে।'

'আলাকেও নিচ্ছিস ?'

'ওকে বাদ দিলে মনে খুব আঘাত পাবে···।'

'কাজটা ভালো করছিস না,' বললো এশা। 'ইয়ামো আর সোবেক, এটা ওদের প্রাপ্য। কিন্তু আলার বয়স এতোই কম, এই বয়সে কর্তৃত্ব হাতে পেলে একেবারে গোল্লায় যাবে ছেলেটা। ওর ওপর তখন তোরও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।'

'হ্যাঁ,' খানিক ইতস্তত করে বললো ইমহোটেপ, 'তোমার কথায়

যুক্তি আছে। দেখি কি করা যায়।'

দরজার কাছে পৌঁছে থামলো সে। আবার বললো, 'খরচ শুধু বাড়ছেই। এভাবে একের পর এক লোকজন মারা গেলে রাজার ভাণ্ডারও তো শেষ হয়ে যাবে।'

'প্রার্থনা করি, এরপর যেন আমার পালা আসে,' বললো এশা। 'তার আগে আর কেউ যেন মারা না যায়। ভালো কথা, আমার বেলায় যেন কিপটেমি করা না হয়। আরেক দুনিয়ায় গিয়ে জীবনটা আমি উপভোগ করতে চাই। প্রচুর খাবার-দাবার দিবি, প্রচুর মদ দিবি, দাসীদের মডেল দিবি এক ডজন, খেলনার সরঞ্জাম যেন কোনোটা বাদ না পড়ে, প্রসাধনের সব রকম উপকরণ থাকা চাই···।' দীর্ঘ একটা তালিকা পেশ করলো বৃদ্ধা।

ক্ষীণ একটু হাসলো ইমহোটেপ। 'তোমার কথা আলাদা, মা। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, হিমানীর জন্যে খরচ করতে খারাপই লাগছে আমার। বড় জ্বালান জ্বালিয়ে গেছে।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

গ্রীষ্মের প্রথম মাস—পঁচিশ তারিখ

নোমার্কের কোর্টে উপস্থিত হয়ে অংশীদারিত্বের কাগজ-পত্রে সই করা হলো। সবাই খুব খুশি, শুধু বাড়ির ছোটো ছেলে আলা বাদে। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয় ইমহোটেপ, কম বয়সের জন্যে তাকে অংশীদার করা হবে না। আলার মন খারাপ, কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে ওরা তাকে কোথাও দেখতে পেলো না।

ছেলেদের অংশীদার করে নিয়ে ইমহোটেপ খুব খুশি। হুকুম করলো, মদের বড় একটা কলস আনা হোক। কিছুক্ষণের মধ্যে বারান্দায় হাজির করা হলো বড়সড় একটা কলস। ছেলেদের ডেকে ইম-

হোটেপ বললো, 'প্রাণ ভরে মদ খাও তোমরা। ভুলে যাও শোক, শুধু ভবিষ্যৎ আর সুখের কথা ভাবো।'

এক ঢোক করে মদ খেলো ওরা চারজন—ইমহোটেপ, মোহন, ইয়ামো আর সোবেক। এই সময় খবর এলো, একটা ষাঁড় চুরি হয়েছে। ব্যাপারটা জানার জন্যে তখুনি রওনা হলো ওরা সবাই।

এক ঘণ্টা পর ইয়ামো যখন বারান্দায় ফিরলো, তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, ভীষণ ক্লান্ত। বারান্দার ওপর একটা উঁচু পাটাতনে রয়েছে মদের কলস, সেটার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। তামার একটা পাত্র কলসের ভেতর ডুবিয়ে মদ তুললো সে। বারান্দায় বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো পাত্রে। খানিক পর ফিরলো সোবেক।

'এবার যতো খুশি মদ খাবো,' সহাস্যে বললো সে। 'আজ আমাদের ভারি খুশির দিন, ইয়ামো।'

'নিশ্চই। দেখিস, আমাদের সম্পদ দিনে দিনে বাড়বে আরো।'

'এখন থেকে যার বুদ্ধিতে যতোটা ফসল ফলবে, সেই অনুপাতে ভাগও বেশি পাবে সে,' বললো সোবেক। 'ব্যবসার ব্যাপারেও তাই। দেখো, দু'বছরের মধ্যে তোমাদের দু'জনের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হবো আমি। তুমি আর বাবা, তোমরা তো ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু আমি নেবো। ব্যবসার মারপ্যাচ তোমাদের চেয়ে ভালো বুঝি আমি।'

ছোটো ভাইয়ের কথা শুনে হাসতে লাগলো ইয়ামো। 'যাই করিস, ভেবেচিন্তে করিস। আমার কথা হলো, অস্থির হবার কোনো দরকার নেই। উন্নতি আস্তে-ধীরে হওয়াই ভালো।'

'দুর, দুর! 'বড় ভায়ের কথা হেসে উড়িয়ে দিলো সোবেক। 'আমি রাতারাতি ধনী হতে চাই।' কলস থেকে পর পর দুই পাত্র মদ

খেলো সে।

'আস্তে-ধীরে খা,' বললো ইয়ামো। 'সারাদিন আজ পেটে তেমন কিছু পড়েনি তোর, একবারে এতোটা করে মদ খেলে ক্ষতি হবে।'

'সব কিছুতেই এতো সাবধানী তুমি,' একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললো সোবেক, 'সেজন্যেই তো বলি, তোমার দ্বারা খুব একটা কিছু কখনোই হবে না।'

'আচ্ছা, হয়েছে, তুই উন্নতি করে দেখা, তাতেই আমরা খুশি…' হঠাৎ থেমে গেল ইয়ামো, তার মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠলো।

'কি হলো, ইয়ামো?'

'কিছু না—হঠাৎ পেটটা ব্যথা করে উঠলো…তেমন কিছু না।' হাত তুলে কপালের ঘাম মুছলো ইয়ামো।

'তোমাকে কেমন যেন অসুস্থ লাগছে?'

'এই তো একটু আগেও ভালো ছিলাম।'

'মদের কলসে কেউ বিষ মিশিয়ে না রাখলেই হয়,' হাসতে হাসতে বললো সোবেক। উঠে গিয়ে আবার নিজের পাত্রে মদ নিলো সে। ঢক ঢক করে শেষ করলো পাত্রটা। তারপর আরো এক পাত্র নিয়ে ইয়ামোর পাশে এসে বসলো। চুমুক দিলো পাত্রে।

শেষ চুমুক দেয়ার জন্যে মুখের সামনে হাত তুললো সোবেক, তার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠলো। হাত থেকে খসে পড়লো পাত্র। 'ইয়ামো…ইয়ামো…,' হাঁপাতে লাগলো সে, '…আমারও… আমারও পেটে ব্যথা…ও মাগো, পুড়ে যাচ্ছে…।'

পেট চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো ইয়ামো। টলছে। তার চোখ-জোড়া আতংকে বিস্ফারিত।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সোবেকও, কিন্তু খানিকটা উঠে ধপাস

করে পড়ে গেল। মৃত্যু ভয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, 'তোমরা কোথায়···বিষ···বাঁচাও আমাদের···বিষ···বা-বা, আ-মা-দের বাঁ-চা-ও···,' শেষ দিকে তার কথা জড়িয়ে এলো।

'ডাক্তার···ডা-ক্তা-র···ডা-কো···' ধপাস করে বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল ইয়ামো। তার কথাও জড়িয়ে আসছে।

'বাঁ-চা-ও···বাঁ-চা-ও···' ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে সোবেকের গলা।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো হেনেট। 'কি হয়েছে? কিসের এতো চেঁচামেচি। বলি, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে?' তার চিৎকারে বাড়ির ভেতর থেকে বাকি সবাই ছুটে এলো।

ইয়ামোর গলা থেকে চিঁ চিঁ করে আওয়াজ বেরুলো, 'বিষ··· মদের কলসে···ডা ক্তা-র···।'

ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলো কানী বুড়ি হেনেট। নফরেতের অশান্ত আত্মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়ছে সে। দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে। নিজের মাথার সাদা চুল ধরে টেনে টেনে ছিঁড়ছে। তারপর সে বাঁদী-দাসীদের দিকে তেড়ে গেল। 'মাগীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস? মন্দিরে ছুটে যা-না লো! গুরুদেব মারসুকে খবর দে! এ-তল্লাটে গুরুদেবই তো একমাত্র ডাক্তার।'

দরবার ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে ইমহোটেপ। তার লিনেনের আলখাল্লায় ধুলো লেগে রয়েছে। কিছু মুখে দেয়নি সে, কাপড় বদলায়নি, শুতেও যায়নি। চেহারায় ভয় আর ক্লান্তি।

অন্দরমহল থেকে মেয়েদের করুণ বিলাপধ্বনি ভেসে আসছে।

সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে হেনেটের নাকি সুরের কান্না। পাশের কামরায় রয়েছে ইয়ামো, তার চিকিৎসা চলছে। গুরুদেব মারসুর অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, মন্ত্র পড়ছে সে।

সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্দরমহল থেকে পালিয়ে এসেছে কামিনী, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে গুরুদেব মারসু আর বড় ভাই ইয়ামোর দিকে।

গুরুদেব মারসু ইয়ামোর প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন দেবতাদের কাছে। চোখ ভরা পানি নিয়ে বিড়বিড় করে কামিনীও মন্ত্র পড়ছে। 'দেবতা ইসইস—ও মহান দেবতা ইসইস—ওকে বাঁচাও—আমার ভাইকে বাঁচাও—ও দেবতা ইসইস, মহান জাদুকর…।'

গুরুদেব মারসুর কণ্ঠস্বর আরো একটু চড়লো। ইয়ামোর ঠোঁট নড়ে উঠলো একবার।

মনে মনে নফরেতকে উদ্দেশ্য করে কামিনী বললো, 'হিমানী তোমাকে খুন করেছে, সেজন্যে আমার ভাইকে তুমি দায়ী করতে পারো না। যে তোমাকে খুন করেছে তাকে তো তুমিও মেরে ফেলেছো। তবু তুমি সন্তুষ্ট নও? সোবেককেও মারলে তুমি, অথচ তোমার বিরুদ্ধে কথা বললেও, তোমার কোনো ক্ষতি সে করেনি। মহান ইসইস, নফরেতের প্রতিশোধ থেকে তুমি আমার ভাইকে বাঁচাও।'

বারান্দায় বেরিয়ে এসে মেয়েকে দেখতে পেলো ইমহোটেপ। 'এদিকে আয়, মা,' রুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েকে কাছে ডাকলো সে।

ছুটে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো কামিনী, ইমহোটেপ মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরলেন।

'বাবা, বাবা,' ডুকরে কেঁদে উঠলো কামিনী। 'বড়দা কি…?'

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ইমহোটেপ বললো, 'ইয়া-মোর এখনো আশা আছে, মা। গুরুদেব অবশ্য শেষ কথা এখনি বলতে চান না। সোবেক···তোরা খবর পাসনি ?'

বাবার বুকে মাথা ঠুকলো কামিনী। 'হ্যাঁ···।'

'ভোর রাতে মারা গেছে···,' মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে এগোলো ইমহোটেপ। কামিনী বাধা দেয়ার আগেই দেয়ালে কপাল ঠুকতে শুরু করলো সে। 'আমার বুকের ধন সোবেক, চলে গেলি বাবা! আমার সুদর্শন···।'

বাপকে জড়িয়ে ধরে দেয়ালের কাছ থেকে টেনে আনলো কামিনী। তাকে নিয়ে দরবার ঘরে ঢুকলো সে। 'তুমি বসো, বাবা। একটু শান্ত হও। ভাবো, এই নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার উপায় কি।'

কামিনীর কথা শুনতে পায়নি ইমহোটেপ। 'করার কিছু বাকি রাখা হয়নি। গুরুদেব বমি করিয়েছে। শিকড় বেঁটে খাওয়ানো হয়েছে, বিষ যাতে আর বিষ না থাকে। মন্ত্র পড়া শেষ হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আমার সোবেক চলে গেল। চিকিৎসক হিসেবে গুরুদেব মারসুর তুলনা হয় না। তিনি যখন ওকে বাঁচাতে পারেন নি, তারমানে দেবতারা চাননি সোবেক বাঁচুক।'

দরবার ঘরে ঢুকলেন গুরুদেব মারসু।

'বলুন ?' অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করলো ইমহোটেপ।

গুরুদেব গম্ভীর। 'ইসইস-এর দয়া, আপনার বড় ছেলে বেঁচে উঠবে। এখনো সে দুর্বল, তবে বিপদ কেটে গেছে।'

কপালে করাঘাত করলো ইমহোটেপ। 'আমার পুত্রধন সোবেক···।'

গুরুদেব মারসু বললেন, 'ভাগ্য ভালো যে বিষাক্ত মদ বেশি খায়নি ইয়ামো। ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে খেয়েছিল সে, কিন্তু আপনার

মেজো ছেলে ঢক ঢক করে খেয়েছিল।'

ইমহোটেপ গুঙিয়ে উঠলো। 'দুই ভাইয়ের মধ্যে ওখানেই তো পার্থক্য। ইয়ামো চিরকাল ধীরস্থির, সাবধানী। আর সোবেকঅস্থির, বেপরোয়া···।' হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, এক পা সামনে এগিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইলো সে, 'মদেই তাহলে বিষ ছিলো? কোনো সন্দেহ নেই?'

'কোনো সন্দেহ নেই,' বললেন গুরুদেব মারসু। 'আমার সহকারিরা কুকুর বিড়ালকে খাইয়েছে ওই মদ, একটাও বাঁচেনি।'

'অথচ ঘণ্টাখানেক আগে ওই একই মদ আমিও খেয়েছি, কিন্তু···।'

'বিষ মেশানো হয়েছে আরো পরে।'

দুই হাতের তালু এক করে আঙুলগুলো ভাঁজ করলো ইমহোটেপ। 'আমার বাড়িতে থেকে আমার ছেলেদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে, এতো সাহস কারো হতে পারে না! এ অসম্ভব! এ কোনো জীবিত লোকের কাজ নয়।'

গুরুদেব মারসু সামান্য একটু কাত করলেন মাথাটা। 'এ-ব্যাপারে আপনিই ভালো বলতে পারেন।'

নার্ভাস দেখালো ইমহোটেপকে, কানের পিছনটা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'একজনের কিছু বলার আছে, আমি চাই আপনি তার কথাগুলো শুনুন।' হাততালি দিলো সে, ছুটে ঘরে ঢুকলো একজন চাকর। ইমহোটেপ তাকে বললো, 'যাও, রাখাল ছেলেটাকে নিয়ে এসো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চাকরটা। গুরুদেবকে ইমহোটেপ বললো, 'ছেলেটা আমাদেই ক্ষেতে কাজ করে, গরু চরায়—ইয়ামোর ভারি ভক্ত। মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়, যা দেখেছে তাই বলবে।'

ভীত-সন্ত্রস্ত এক কিশোরকে নিয়ে ফিরে এলো চাকরটা। এগারো কি বারো বছর বয়স ছেলেটার, কয়লার মতো কালো গায়ের রঙ। প্রায় উলঙ্গই বলা চলে, শুধু কোমরের নিচে নোংরা এক টুকরো কাপড় জড়ানো রয়েছে।

'বল,' হুকুম করলো ইমহোটেপ। 'একটু আগে আমাকে যা বলেছিস।'

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকলো ছেলেটা, কোমরের কাপড় আঙুলে জড়াচ্ছে।

'কথা বল?' ধমক দিলো ইমহোটেপ।

মেঝেতে ছড়ি ঠোকার খটখট আওয়াজ হলো। ঘরে ঢুকলো এশা। 'ছেলেটাকে তুই ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস, ইমহোটেপ। ধর তো কামিনী, এই নে, ওকে এই ঠাণ্ডা সরবতটুকু খাইয়ে দে।'

দাদী-মার হাত থেকে সরবতের পাত্র নিয়ে ছেলেটাকে দিলো কামিনী। ঢক ঢক করে সরবত খেলো ছেলেটা, যেন তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো।

'এবার, লক্ষ্মী সোনা, বলো তো কি তুমি দেখেছো,' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধা।

ধীরে ধীরে মুখ তুললো কিশোর। একে একে সবার দিকে তাকালো সে। মৃদু গলায় জানতে চাইলো, 'আমার মনিব ইয়ামো··· তিনি কোথায়?'

'তোমার মনিব ইয়ামোই নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে,' এবার কথা বললেন গুরুদেব মারসু, 'যা দেখেছো সব বলতে হবে আমাদের। তোমার কোনো ভয় নেই। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

ছেলেটার চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। 'আমার মনিব আমাকে ভালোবাসেন। শুধু তার নির্দেশই মানবো আমি।'

সবাই অপেক্ষা করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো ছেলেটা, যেন কোনো বিপদের আশংকা করছে। আবার তার চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব দেখা গেল। ধৈর্য হারিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো ইমহোটেপ, গুরুদেব তাকে চোখ-ইশারায় ক্ষান্ত করলেন।

তারপর হঠাৎ শুরু করলো ছেলেটা। গুছিয়ে কিছুই সে বলতে পারলো না। যা বললো তার অর্থ দাঁড়ায় এই রকম :

ছোটো একটা গাধাকে তাড়া করে আসছিল সে। উঠনের বড় গেটটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ভেতরে তাকায়। উঠনে তখন কেউ ছিলো না, তবে বারান্দায় একটা পাটাতনের ওপর একটা কলস ছিলো। এই সময় একটা মেয়েলোক, বাড়িরই কেউ হবে, ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। সোজা হেঁটে এসে কলসের সামনে দাঁড়ায় মেয়েলোকটা, কলসের মুখের ওপর একটা হাত রাখে। হাতটা মুঠো করা ছিলো। মুঠোটা খোলে সে। এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে অন্দরমহলের দিকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় মেয়েলোকটা। এই সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরে সে দেখে, তার মনিব ইয়ামো ক্ষেত থেকে ফিরছে। কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে মনিব তাকে ধমক দেবে ভেবে ওখানে আর দাঁড়ায়নি সে, আবার গাধার পিছনে ছোটে।

রেগেমেগে মেঝেতে পা ঠুকলো ইমহোটেপ। 'আর তুই ব্যাটা উল্লুক ওকে সাবধান করলি না?'

ছেলেটা অবাক চোখে তাকালো। 'কিছু জানলে তো সাবধান

করবো ! শুধু দেখলাম মেয়েলোকটা হাসতে হাসতে কলসের ওপর হাতের মুঠো আলগা করলো। ওটা যে মদের কলস তাও তো আমি জানতাম না।'

গুরুদেব মারসু জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েলোকটা কে ?'

চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে মাথা নাড়লো ছেলেটা। 'জানি না। বাড়ির কেউ হবে। ওদের কাউকে ভালো করে আমি চিনিও না। আমি কাজ করি সেই দূরের ক্ষেতে, এদিকে খুব কম আসা হয়। তবে, দেখলাম, ডোরাকাটা একটা লিনেনের কাপড় পরে ছিলো মেয়েলোকটা।'

চমকে উঠলো কামিনী।

'কোনো চাকরাণী, সম্ভবত ?' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছেন গুরুদেব মারসু।

মাথা নাড়লো ছেলেটা। 'তার মাথায় পরচুলা ছিলো, গলায় ছিলো হার···।'

'হার ?' চেঁচিয়ে উঠলো ইমহোটেপ। 'কিসের হার ?'

ছেলেটা শান্তভাবে কথা বলছে এখন। ভয় কাটিয়ে উঠেছে। 'মুক্তা বসানো হার, মাঝখানে ছিলো একটা সোনার সিংহ।'

বৃদ্ধা এশার ছড়ি মেঝেতে খটাখট্ আওয়াজ তুললো। চাপা একটা গর্জন বেরিয়ে এলো ইমহোটেপের গলা থেকে।

গুরুদেব মারসু গম্ভীর গলায় বললেন, 'দেখো, তুমি যদি মিথ্যে কথা বলো···'

'যা বলছি সত্যি বলছি,' জোর গলায় বললো ছেলেটা। 'দেবতাদের কিরে, একটা কথাও মিথ্যে বলছি না।'

পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো, দুর্বল গলায়

জানতে চাইছে ইয়ামো, 'ওখানে এতো চেঁচামেচি কিসের ?'

এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ছেলেটা। ইয়ামোর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো সে। 'মনিব, আপনি আমার মা-বাপ! ওরা আমাকে মারবে, আপনি আমাকে বাঁচান।'

'আরে না, মারবে কেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ইয়ামো। ধীরে ধীরে সে তার মাথাটা একটু তুললো। 'তোমরা ওকে কিছু বলো না। ও একটু বোকা হতে পারে, কিন্তু সরল। কথা দাও, তোমরা ওকে কিছু বলবে না।'

ছেলেটার পিছু পিছু বাকি সবাইও ঘরে ঢুকেছে। ইমহোটেপ বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওর কথা আমরা বিশ্বাস করছি।' ছেলেটার দিকে ফিরলো সে। 'তুমি যাও এবার। কিন্তু কাছাকাছি থেকো, আবার তোমাকে দরকার হতে পারে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা। মনিবের দিকে ঝুঁকলো সে। 'আপনি অসুস্থ, মনিব ?'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ইয়ামোর ঠোঁটে। আশ্বাস দিয়ে বললো, 'চিন্তা করিস না। আমি মরবো না। এখন যা। আর, শোন, তোকে যা বলা হয়েছে তাই করবি। অবাধ্য হবি না।'

খুশি মনে, হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। এগিয়ে এসে ইয়ামোর চোখ দেখলেন গুরুদেব মারসু, রক্তের গতি পরীক্ষা করলেন। তাকে ঘুমোবার নির্দেশ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাঁর সাথে সাথে বাকি সবাইও বেরিয়ে এলো।

'ছেলেটা যে বর্ণনা দিলো, তা থেকে কি মেয়েলোকটাকে চেনা গেল ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ইমহোটেপ।

কামিনী বললো, 'ডোরাকাটা লিনেন শুধু নফরেতই পরতো। বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল ওটা। কিন্তু আর সব কিছুর সাথে ওটাও তো কবরে পুতে দেয়া হয়েছে।'

'আর ওই হারটা,' বললো ইমহোটেপ, 'আমি ওকে দিয়েছিলাম। এ-ধরনের হার এই একটাই ছিলো এ-বাড়িতে। অত্যন্ত দামী জিনিস। নফরেতের সাথে ওটাও কবরে দেয়া হয়েছিল···।' দু'হাত শূন্যে তুলে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করলো সে। 'এ কি ধরনের প্রতিশোধ! নফরেতকে আমি সুখে-শান্তিতে রেখেছিলাম, তার পক্ষ নিয়ে আমি ছেলে-বউদের সাথে ঝগড়া করেছি, মারা যাবার পর মর্যাদার সাথে কবর দিয়েছি—তারপরও কি করে সে আমার ওপর এতো নিষ্ঠুর হয়!' গুরুদেব মারসুর দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকালো সে, 'গুরুদেব, কিছু একটা করুন। এই অভিশাপ থেকে আমার পরিবারকে বাঁচান আপনি। হায় কপাল, কি কুক্ষণই নফরেতকে আমি এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম···।'

'নিজের ভুল তাহলে ধরতে পেরেছেন?' তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর শুনে সবাই ঘাড় ফেরালো।

এলো চুল, ভিজে চোখ নিয়ে ঘরে ঢুকলো কেতী। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ, রাগে কাঁপছে। 'আপনিই তো যতো নষ্টের গোড়া। বুড়ো বয়সে মেয়ের বয়সী একজনকে বিয়ে করে আনলেন, তাও যদি সে শান্ত স্বভাবের হতো। দেখুন, নিজের কি সর্বনাশ করে বসে আছেন। সবচেয়ে যোগ্য ছেলেটাকে হারিয়েছেন। আপনার প্রিয়তমা নফরেত হিমানীকে খেলো, তারপর আমার স্বামীকে খেলো। ভাসুর বেঁচে গেছে ভাগ্যের জোরে, কিন্তু তারমানে এই নয় আবার তাকে মারার চেষ্টা হবে না। ভাবছি, এরপর কার পালা? আমার? আপনার?

কামিনীর ? আপনার প্রিয়তমা নফরেত বাচ্চাগুলোকেও কি ছেড়ে দেবে ?'

মাথা নত করে সমস্ত অভিযোগ সহ্য করলো ইমহোটেপ। কেতী থামতে মুখ তুলে গুরুদেবকে বললো সে, 'কিছু একটা করতেই হবে, গুরুদেব।'

শান্ত সুরে গুরুদেব মারসু বললেন, 'হ্যাঁ। এখন যখন বিপদগুলোর কারণ জানা গেছে, এর প্রতিকার সম্ভব। আমি আপনার মৃতা স্ত্রী আশায়েতের কথা ভাবছিলাম। উনি খুব সৎ আর ধার্মিক ছিলেন। স্বর্গে তিনি নিশ্চয় খুব ভালো অবস্থায় আছেন। তিনি যদি প্রভাব খাটাতে পারেন, নফরেতকে ক্ষান্ত করা সম্ভব। নফরেতের অশান্ত আত্মাকে তিনি শায়েস্তা করতে পারবেন বলে মনে করি।'

মেঝেতে ছড়ি ঠোকার আওয়াজ হলো। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো এশার দিকে। 'বিপদের সময় দিশেহারা হলে চলে না। আমার একটাই কথা, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো সবাই। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।'

বুড়ি মা ঠিক কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো ইমহোটেপ। তাকে উদ্ধার করলো গুরুদেব মারসু, তিনি বিদায় চাইলেন। তাঁর সাথে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল ইমহোটেপ।

কেউ জানে না ঘর থেকে কখন চলে গেছে কেতী।

দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু এশা আর কামিনী। চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাদীমার দিকে তাকালো কামিনী। 'কি যেন ভাবছো তুমি ?'

'এই রকম বিপদে কাউকে না কাউকে তো ভাবতেই হবে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো এশা। 'কামিনী, আমি খুব ভয় পাচ্ছি,

ভাই। কিন্তু সবাই যে কারণে ভয় পাচ্ছে, আমার ভয় পাবার কারণ সেটা নয়।'

'ভয় পাবার আরও কিছু আছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো কামিনী। 'বড়দার বিপদ তো কেটে গেছে···।'

মাথা ঝাঁকালো এশা। 'ভাগ্য ভালো যে গুরুদেব মারস্থর মতো চিকিৎসক সময় মতো পৌঁছুতে পেরেছিলেন। কিন্তু··বিপদ যে এখানেই শেষ হলো, কে তা বলবে?'

'তারমানে?'

'খুব সাবধানে থাকতে হবে, কামিনী। আলা, কেতী, তুই—বিশেষ করে তোরা তিনজন খুব সাবধানে থাকবি। কিছু মুখে দেয়ার আগে কোনো দাসীকে দিয়ে আগে পরীক্ষা করিয়ে নিবি।'

'তুমি?'

'আমি বুড়ি মানুষ, আমাকে মেরে কার কি লাভ,' মৃদু হাসলো এশা। 'তবে, চিন্তা করিস নে, তোদের সবার চেয়ে বেশি সাবধানে থাকবে এই বুড়ি।'

'আর বাবা? বাবার কোনো ক্ষতি নিশ্চই নফরেত করবে না···।'

'কি জানি। এখনো সব কিছু পরিষ্কার বুঝছি না রে। একটা দিন সময় দে, ভালো করে চিন্তা করে দেখি। কাল আমি রাখাল ছেলে-টার সাথে কথা বলবো। ওর কথাগুলোর মধ্যে কিছু একটা আছে যা ঠিক মিলছে না···।' ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে পা বাড়ালো বৃদ্ধা।

বড় ভাইয়ের ঘরে ঢুকলো কামিনী। ইয়ামো অঘোরে ঘুমাচ্ছে দেখে পা টিপে টিপে আবার বেরিয়ে এলো সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কেতীর ঘরের দিকে এগোলো। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি

দিয়ে ভেতরে তাকালো। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে কেতী, বুকের সাথে লেপটে রয়েছে তার একটা বাচ্চা, গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে সে। মন খারাপ হয়ে গেল কামিনীর। স্বামীর প্রতি খুব দরদ থাকলে এতো তাড়াতাড়ি চোখের পানি শুকাতো কি? আবার গানও গাইছে, হোক না তা ঘুমপাড়ানি।

চুপিসাড়ে ওখান থেকে সরে এলো কামিনী। নিজের ঘরে ফিরে এলো সে। টেবিলের ওপর, তার কসমেটিকসের বাক্স আর জারের সাথে অলংকারের ছোট্ট বাক্সটাও রয়েছে। নফরেতের জিনিস ওটা।

বাক্সটা তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো কামিনী। নফরেতের ছোঁয়া আছে এই বাক্সে। হঠাৎ করে নফরেতের জন্যে দুঃখ বোধ করলো সে। বেচারির কপালে সুখ ছিলো না। নিজের অজান্তেই বাক্সটা খুললো কামিনী। পুঁতির মালার সাথে মাদুলির অর্ধেকটা ঠিকই আছে। কিন্তু আরো একটা জিনিস রয়েছে।

কামিনীর হাত কাঁপতে লাগলো। এটা কি? এটা এখানে কেন? এটা তো সেই মুক্তোর হার, মাঝখানে সোনার সিংহ। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো কামিনীর। রাখাল ছেলেটা এই হারের কথাই বলছিল। দর দর করে ঘামতে শুরু করলো সে।

বারো

গ্রীষ্মের প্রথম মাস—ত্রিশ তারিখ

মুক্তোর হারটা পাবার পর থেকে আতংকে আছে কামিনী। ঘুমাতে পারেনি, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে। সকাল হতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে, ঘটনাটা কাউকে জানাতে হবে। সিংহ আকৃতির লকেট সহ হারটা বাক্স থেকে বের করলো, লুকিয়ে রাখলো লিনেনের ভাঁজে। ঘর থেকে বেরুতে যাবে, ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলো কানী বুড়ি হেনেট।

'শুনেছিস লো?' চোখ পাকালো হেনেট, তার মুখের রেখা আর ভাঁজগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে কিলবিল করতে শুরু করলো। 'অভাগা রাখাল ছেলেটার খবর জানিস?'

'কি হয়েছে?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলো কামিনী।

'শেষ,' চটাস করে নিজের কপালে একটা চাটি মেরে বললো হেনেট। 'সকালবেলা মাঠে গিয়ে সবাই দেখে, ক্ষেতের ধারে ঘুমাচ্ছে সে। কতো ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কি, কিন্তু না—ঘুম ভাঙলো

না।'

'মানে ?'

'পপি পাতার রস দিয়ে সরবত বানিয়ে খেয়েছিল, অন্তত সবার তাই ধারণা। কিন্তু কেউ তাকে খেতে দিয়েছিল, নাকি সে নিজেই বানিয়ে খেয়েছিল, কেউ বলতে পারছে না।'

'কি হয়েছে তাই বলো।'

'যা হবার তাই হয়েছে। কালই আমাদের বোঝা উচিত ছিলো, এ ছেলে বাঁচবে না।' গলার মাদুলিগুলো আঙুল দিয়ে নাড়তে শুরু করলো হেনেট। 'নফরেতকে যে দেখতে পায়, সে কি আর বাঁচে ?'

'মারা গেছে ?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো কামিনী।

'হ্যাঁলো, হ্যাঁ—নফরেত তাকে ডেকে নিয়েছে।' কুঁজো বুড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো। 'এ-বাড়িতে কারো নিরাপত্তা নেই।'

পিছন থেকে জানতে চাইলো কামিনী, 'মোহনদা কোথায়, জানো ?' মোহনকে এখন দরকার তার। হারটার কথা শুধু তাকেই বলা যায়।

'মোহনের সাথে এতো কিসের খাতির তোর ?' ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো কুঁজো বুড়ি। 'শরীরে তোর ভরা যৌবন, সেটা খেয়াল রাখিস। মোহনের বয়স একটু বেশি, কিন্তু আজও বিয়ে করেনি, কাজেই দূরে দূরে থাকাই তো ভালো।'

রাগে কাঁপতে শুরু করলো কামিনী। 'ফের যদি এ-ধরনের বাজে কথা বলবে···।'

'মোহন এখন চিঠি লিখছে—তোর মার কাছে। আশায়েতকে অনুরোধ করা হবে সে যেন নফরেতের দুষ্ট আত্মার শয়তানী থেকে পরিবারটাকে রক্ষা করে···।'

'ঠিক আছে, এবার তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও!'

কুঁজো বুড়ি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মা আশায়েতের কাছে আবেদন পত্র লিখছে মোহন, ভাবলো কামিনী, তারমানে গুরুদেব মারস্থর সাথে ইসইসের মন্দিরে আছে সে, তাকে একা পাবার কোনো উপায় নেই।

বাবার কাছে যাবে ও? আপনমনে মাথা নাড়লো কামিনী। বাবার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আগের সেই আস্থা এখন আর তার নেই। আরেকজনকে বলা যেতো, বড়দাকে। বড়দাকে বিশ্বাস করা যায়, ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতো সে। কিন্তু সে এখনো অসুস্থ।

কেতীকে বললে কেমন হয়? চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিলো কামিনী। কারো কথা মন দিয়ে শোনার মেয়েই নয় কেতী। স্বামী খুন হয়েছে, তাতেও তাকে তেমন বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সে শুধু নিজের ছেলেমেয়ের কথা ভাবে। কেতীকে খারাপ বলা যায় না, কিন্তু সে একটা বোকা।

বাকি থাকলো কোহি, আর দাদী-মা।

কোহির কথা ভাবলেই মনটা খুশি হয়ে ওঠে। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। সুন্দর গলা, ভালো গান গায়। তার ওপর লোকটার দুর্বলতাও আছে···

কিন্তু নফরেতের সাথে কোহির একটা সম্পর্ক ছিলো। নফরেতের কথা শুনে বাবাকে চিঠি লিখেছিল সে, সেই চিঠিটাই তো যতো অশান্তি ডেকে আনে।

না, গোপন কোনো ব্যাপারে কোহির সাথে আলাপ করা ঠিক হবে না। সে তো আর এ-বাড়ির কেউ নয়। তারচেয়ে দাদী-মার কাছে যাবে সে। বুড়ির জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।

হারটার কথা শুনেই দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো এশা, ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে কামিনীকে চুপ করতে বললো। লিনেনের ভাঁজ থেকে হারটা বের করলো কামিনী, এশার বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিলো সেটা। চোখে ভালো দেখে না এশা, নাকের কাছে হাত তুলে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো জিনিসটা। আরেকবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিজের কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে ফেললো হার। নিচু গলায়, কিন্তু কর্তৃত্বের সুরে বললো, 'আর কোনো কথা নয়। দেয়ালেরও কান আছে। সারাটা রাত ঘুমাইনি, শুধু চিন্তা করেছি। চিন্তা করে বুঝেছি, কি করা দরকার।'

'বাবা আর মোহন ইসইসের মন্দিরে গেছে,' বললো কামিনী। 'গুরুদেব মারসুকে সাথে নিয়ে আমার মায়ের কাছে আবেদন জানাবে ওরা···।'

'জানি। মরা মানুষের আত্মা নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। আমার চিন্তা-ভাবনা যারা বেঁচে আছে তাদের নিয়ে। মোহন ফিরলে বলবি আমি তাকে ডেকেছি। তাকে সাথে করে আমার ঘরে চলে আসবি। মোহনকে বিশ্বাস করি, ওর সাথেই আলোচনা করবো।'

'হ্যাঁ, মোহনদা বলতে পারবে কি করা উচিত।'

চোখে কৌতুক আর কৌতূহল নিয়ে কামিনীর দিকে তাকালো বৃদ্ধা। 'সমাধি প্রাঙ্গণে প্রায়ই তুই যাস, ওখানে মোহন থাকে। ব্যাপারটা কি ? কি এতো কথা বলিস তোরা ?'

অপ্রতিভ বোধ করলো কামিনী। মোহনদাকে তার ভালো লাগে, কিন্তু এই ভালো লাগা কেন, কতোটা গভীর, ব্যাখ্যা করতে পারবে না সে। মোহনদাকে জড়িয়ে তার সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বললে নিজের অজান্তেই আড়ষ্ট হয়ে যায় শরীর, ঘামতে শুরু করে। মাঝে-

মধ্যে মোহনদাকে তার বন্ধু বলে মনে হয়, আবার কখনো কখনো মনে হয় মোহনদা তার একটা আদর্শ। মোহনদার সান্নিধ্যে এলেই আশ্চর্য একটা নিরাপত্তা বোধ জাগে মনে। এই মানুষটা নির্লোভ, বুদ্ধিমান, দায়িত্ববান, পরোপকারী—কোনো নোংরামি বা কুচিন্তা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

'কি রে, মোহনের নাম শুনেই অমন উদাস হয়ে গেলি যে?' মিটি-মিটি হাসছে এশা।

'দাদী-মা, এ প্রসঙ্গ থাক,' আবেদনের সুরে বললো কামিনী। 'শুধু জেনো, মোহনদাকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু এই ভালো লাগার মধ্যে নোংরা কিছু নেই।'

'তুই আসলে ভাগ্যবতী, কামিনী,' বললো এশা। 'সবার অন্তরে যে ভালোবাসাটুকু থাকে, কিভাবে যেন সেটুকু পেয়ে যাস তুই। আমিও, দেখ, সবার চেয়ে তোকেই বেশি ভালোবাসি।'

হাসতে লাগলো কামিনী।

'কিন্তু তবু বলবো, লাখের মধ্যেও তোর মতো সুন্দরী পাওয়া কঠিন —কাজেই সাবধানে থাকা দরকার। না-না, মোহনকে ভয় পেতে হবে তা বলছি না। মোহন তো দেবতাদের মতো নিষ্পাপ, আমি জানি। ওকে আমি ন্যাংটো দেখেছি। পাপ আর নোংরামিতে ভরা এই দুনিয়ায় দু'একজন লোক থাকে, যারা আদর্শ থেকে এক চুল নড়ে না, মোহন তাদেরই একজন। কিন্তু, এরা আবার সাংসারিক ঝামেলায় নিজেদের জড়াতে চায় না। কাজেই বৃথা সময় নষ্ট করা তোর মতো মেয়ের বোধহয় ঠিক হবে না। তারচেয়ে কোহি···।'

'আবার সেই পুরানো প্যাচাল···?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তোর যা খুশি কর তুই,' হাসতে হাসতে

বললো এশা। 'তোকে ভাই চিনি আমি, খারাপ কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়াবি না, জানি। ভালো কথা, আলা কোথায় বলতে পারিস?'

'ফসল ঘরে তোলা হচ্ছে, তদারকিতে ব্যস্ত।'

'মজুরদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে, তাই তো? দুর্বলদের ওপর হম্বি-তম্বি করায় ছোকরার জুড়ি নেই। ঠিক আছে, ফিরে এলে তাকে বলবি, আমি দেখা করতে বলেছি।'

'আচ্ছা।'

'আর, কি বলেছি, মনে আছে?' চোখ পাকালো বৃদ্ধা। 'কাউকে কিছু বলবি না, ঠোঁট দুটো সেলাই করে রাখ।'

'আমাকে তুমি ডেকেছো, দাদী-মা?'

শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকলো আলা, মাথাটা একদিকে একটু কাত করা, দুই দাঁতের মাঝখানে একটা ফুল। হাসিখুশি চেহারা, ভারি ফুর্তিতে আছে।

'কি করছিলি?' জানতে চাইলো এশা।

'বাবা মন্দিরে গেছে, কাজেই সমস্ত কাজ আমাকেই দেখতে হচ্ছে,' গর্বের সাথে বললো আলা। 'কেন ডেকেছো তাড়াতাড়ি বলো। আমার অনেক কাজ।'

'বাড়ির সবাই আমরা শোক পালন করছি,' শান্ত সুরে বললো এশা। 'তোর মেজো ভাই সোবেক মারা গেছে, এরই মধ্যে তার লাশ নিয়ে চলে গেছে এমবামরা। তোর বড় ভাই মরতে মরতে বেঁচেছে, এখনো সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। অথচ তোকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছিস। কারণটা কি?'

সাদা দাঁত বের করে হাসতে লাগলো আলা। 'সোবেক মারা

গেছে তো আমার কি? দু'চোখে দেখতে পারতো না আমাকে। কোনো কারণ ছাড়াই আমার পিছনে লেগে থাকতো। বাবা আমাকে অংশীদার করবে বলে ঠিক করলো, কিন্তু বাধ সাধলো কে? ওই সোবেক।'

'সোবেক বাধ সাধলো? কে বললো তোকে?'

'কোহি।'

'কোহি?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো এশার। পরচুলা একপাশে সরিয়ে মাথা চুলকালো সে। 'খুবই আশ্চর্য হলাম।'

'কোহি আমাকে বললো, কথাটা সে হেনেটের কাছ থেকে পেয়েছে,' বললো আলা। 'সবাই জানি, হেনেট সব খবরই রাখে।'

'শুধু খবর রাখে না, খবর তৈরিও করে,' কঠিন সুরে বললো এশা। 'আর তার বেশিরভাগ খবর হয় স্রেফ গুজব, নাহয় ডাহা মিথ্যে। সত্যি কথাটা হলো, ইয়ামো আর সোবেক দু'জনই তোকে অংশীদার করার বিপক্ষে ছিলো, কারণ এখনো তোর উপযুক্ত বয়স হয়নি। কিন্তু ওরা কেউ তোর বাবাকে কিছু বলেনি। বলেছি আমি।'

'তুমি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো আলা। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ফুলটা পড়ে গেল মেঝেতে। 'কেন? তোমার সাথে আমার কিসের শত্রুতা? বাবা আমাকে অংশীদার করলে তোমার কি আসে যায়?'

'ফসল আর ব্যবসার মালিকানা পেলে, এই বয়সে, একেবারে নষ্ট হয়ে যাবি তুই,' বললো এশা। 'তোর ভালোর জন্যেই বাধা দিয়েছি।'

'আর বাবা তোমার কথা শুনলো?'

'ঠিক তখুনি আমার কথা মেনে নেয়নি,' বললো এশা, মিটি মিটি হাসছে সে। 'তোকে একটা গোপন ব্যাপার বলি, শিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে দেবে। তোর মনে আছে, হেনেটকে দিয়ে পাশা খেলার

সরঞ্জাম পাঠিয়েছিলাম আমি ?'

'মনে আছে। বাবার সাথে তিন বার খেলি আমি। পাশা খেলার সাথে এর কি সম্পর্ক ?'

'সম্পর্ক আছে বৈকি,' বললো এশা। 'তোর বাবা, বোকা লোক তো, ভালো খেলতে জানে না। আর বোকাদের মতোই, খেলায় হেরে গেলে রেগে যায়। বোকারা হারতে পছন্দ করে না। তিনটে খেলার সবগুলোয় হারলো তোর কাছে, আর তাতেই তার মন ঘুরে গেল—মনে পড়ে গেল আমি কি বলেছি। ঠিক করলো, তোর বয়স কম, কাজেই তোকে কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না।'

অবাক চোখে দাদী-মার দিকে তাকিয়ে থাকলো আলা। পরমুহূর্তে হাসলো সে। 'সত্যি তুমি খুব চালাক, দাদী-মা। আগেও বলেছি, এ-বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি যা একটু বুদ্ধি রাখি, বাকি সবাই গাধা-গরু। হ্যাঁ, প্রথম খেলায় তুমি জিতেছো। কিন্তু, এই বলে রাখলাম, দ্বিতীয় খেলায় অবশ্যই জিতবো আমি। কাজেই, সাবধানে থেকো, দাদী-মা।'

'সাবধানেই আছি, ভাই,' বললো এশা। 'আমারও পরামর্শ, তুই-ও সাবধানে থাকিস। 'এক ভাই গেছে, আরেক ভাই যেতে যেতে রয়ে গেছে। কে জানে, এবার হয়তো তোর পালা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো আলা। 'আমার কোনো ভয় নেই।'

'কেন ? নফরেতকে তো তুই-ও অপমান করেছিলি। হুমকি দিয়েছিলি।'

'নফরেত।' আলার চোখেমুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো।' তার আমি নিকুচি করি।'

'কি ভয়ানক। কি সাংঘাতিক।' খসখসে গলা শোনা গেল হেনে-

টের, বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলো সে। 'ছি, ছি, ছি। মরা মানুষকে এভাবে কেউ গাল দেয়? আলা, তোর জানে কি ভয়-ডর বলতে কিছু নেই? দেখো মা, দেখো; একটা মাদুলি পর্যন্ত পরেনি···।'

'মাদুলি? মাদুলি আমায় রক্ষা করবে? ছো!' তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট ওল্টালো আলা। 'মাদুলি লাগে না, আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে জানি।' হেনেটের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে। 'সরো, যেতে দাও আমাকে।' হেনেটকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'দেখলে?'

'আলার কথা বাদ দাও,' বললো এশা। 'ওর আচরণ কেমন যেন উদ্ভট লাগলো। শোনো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। কোহিকে কি বলেছো তুমি? বলেছো, সোবেক বাধা দেয়ায় ইমহোটেপ আলাকে অংশীদার করেনি?'

'কাজের চাপে পাগল হবার দশা আমার,' বললো হেনেট। 'খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কোহির সাথে ফুসুর ফুসুর করতে যাবো।'

'তুমি তাহলে অস্বীকার করছো, বলোনি?'

'বললাম তো, কোহির কাছে যাইনি আমি,' বললো হেনেট। 'সে আমার কাছে এসেছিল কিনা, আমার মনে নেই। যদি এসে থাকে, কি নিয়ে কথা হয়েছে, তাও আমার মনে নেই। তবে, ইয়ামো আর সোবেক অনেক কথাই বলছিলো, কিছু কিছু আমার কানে এসে থাকতে পারে। আমি তো আর কালা নই।'

'কালা? তোমার প্রতিটি রোমকূপ এক একটা কান,' তিরস্কারের সুরে বললো এশা। 'শোনো, হেনেট। অনেক সময় শুধু জিভটাই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আশা করি তোমার

জবান কারো মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।'

'তুমি শুধু সব কিছুতে আমার দোষ দেখো,' অভিযোগের সুরে বললো হেনেট। 'এই বাড়ির লোকদের জন্যে খাটতে খাটতে হয়রান হয়ে গেলাম, তবু কেউ আমার নাম করে না। তোমাদের জন্যে নিজের জান পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারি…'

'তাই নাকি? তা, এতোই যখন দরদ তোমার—এই যে, আমার খাবার নিয়ে এসেছে, একটু চেখে দেখো না। কে জানে, ওতে হয়তো বিষ মেশানো আছে।'

'মা!' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল হেনেটের। 'বিষ! তোমার মুখে লাগাম নেই! তোমার বিশ্বস্ত দাসীরা রান্না করে পাঠিয়েছে, বিষ আসবে কোত্থেকে!'

'আমারও তো সেই কথা, বিষ আসবে কোত্থেকে,' বললো এশা। 'তুমিও বিশ্বাস করছো, আমিও বিশ্বাস করছি, এতে বিষ নেই। তাহলে খেয়ে দেখতে আপত্তি কিসের? খাওনা, দু'চামচ খাও।'

হেনেট ঘামছে। মুখে কথা সরলো না।

'আমার ছোট্ট দাসী মেয়েটা আগে খেয়ে পরীক্ষা করে, তারপর আমি খাই,' বললো এশা। 'কিন্তু আজ না হয় তুমি পরীক্ষা করলে? আমার বিশ্বাস মিথ্যেও হতে পারে, হয়তো সত্যি এতে বিষ আছে। দাসীর আমার অল্প বয়স, আমি চাই না ও মারা যাক। কিন্তু তোমার তো বয়স হয়েছে, আর ক'টা দিন নাহয় নাই বাঁচলে। দেখেছো, মাংসের রঙটা দেখেছো? আর কি রকম গন্ধ ছাড়ছে। জিভে পানি এসে যাচ্ছে। নাও, হাঁ করো, আমিই তোমার মুখে তুলে দিই…।'

এক পা পিছিয়ে গেল হেনেট।

হেসে উঠলো এশা। 'কি, ভয় লাগছে? আমার ঠাট্টা তোমার

বুঝি পছন্দ হলো না? হা হা, হি হি।' খাবার ভরা পাত্রগুলো এক এক করে নিজের সামনে টেনে নিলো এশা। তারপর গ্রোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—এক তারিখ

মন্দির থেকে ফিরে এলো মোহন। লেকের ধারে তার ফেরার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলো কামিনী। মোহনের হাতে গোল পাকানো প্যাপিরাস। এক ছুটে তার সামনে এসে দাঁড়ালো কামিনী, তার ঘন কালো এলো চুল বাতাসে উড়ছে।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো মোহন।

'মোহনদা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কামিনী, 'আমার সাথে এখুনি তোমাকে দাদী-মার কাছে যেতে হবে। কি যেন কথা আছে তোমার সাথে।'

কামিনীর কথা শুনে সম্বিত ফিরলো মোহনের, মৃদু হাসলো সে। 'বেশ তো। একটু দাঁড়াও, দেখি তোমার বাবা···।'

কিন্তু ইমহোটেপ ইতিমধ্যে উঠনের আরেক প্রান্তে চলে গেছে, ছোটো ছেলে আলার সাথে জরুরী কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে তার। 'দাঁড়াও,' কামিনীকে বললো মোহন, 'হাতের এগুলো রেখে এখুনি আসছি আমি।'

মোহন আর কামিনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হলো এশা। 'তোমাদের দু'জনকে একসাথে দেখলে আমার ভালো লাগে।' পর-মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদল করলো বৃদ্ধা। 'বাইরের আবহাওয়া কেমন দেখলে? বাতাস ঠাণ্ডা তো?'

মাথা ঝাঁকালো কামিনী।

'তাহলে আমার ছড়িটা দে, উঠনে হাঁটবো আমি।'

দাদী-মা সাধারণত বাইরে বের হয় না, কাজেই মনে মনে অবাক হলো কামিনী। বৃদ্ধার একটা কনুই ধরে বেরুতে সাহায্য করলো সে। দরবার ঘর পেরিয়ে বারান্দায় বেরুলো ওরা। কামিনী জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে বসবে?'

মাথা নাড়লো এশা। 'না। লেকের ধারে যাবো আমি।'

ধীরে ধীরে হাঁটছে এশা, কিন্তু চেহারায় কোনো ক্লান্তি নেই, হাঁপাচ্ছেও না। লেকের ধারে, ফুল বাগানের কাছাকাছি গাছের ছায়ায় দাঁড়ালো সে। 'এখানে। কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না।'

'দাদী-মা, তুমি খুব বুদ্ধিমতী,' মন্তব্য করলো মোহন, মিটিমিটি হাসছে সে।

'আমার আর বিয়ের বয়স নেই,' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলো এশা, 'কাজেই আমার প্রশংসা করে লাভ নেই। যার মন গলালে লাভ হবে, তার দিকে নজর দাও।'

কামিনী আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। অন্যমনস্কতার ভান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো মোহন।

'এখানে যে আলোচনা হবে,' বললো এশা, 'আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, মোহন। সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি তোমাকে। আমার নাতি-নাতনিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি কামিনীকে। ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

'ওর কোনো ক্ষতি হবে না, দাদী-মা,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো

মোহন।

মোহনের চেহারায় এমন কিছু ছিলো, দেখে আশ্বস্ত এবং সন্তুষ্ট হলো এশা। 'কামিনীকে নিয়ে আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকলো না। এবার বলো আমাকে, মন্দিরে কি সব আয়োজন করা হয়েছিল।'

আশায়েতের কাছে আবেদন-পত্র লেখা হয়েছে, সমাধির দরজা খুলে বহুবিধ উপকরণের সাথে সেই পত্র পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ইত্যাদি সবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো মোহন।

'এবার, এটা দেখো, মোহন,' বললো এশা, কাপড়ের ভাঁজ থেকে সিংহ আকৃতির লকেটসহ হারটা বের করে মোহনের হাতে দিলো। 'কামিনী, ওকে বল কোথায় এটা পেয়েছিস।'

নির্দেশ পালন করলো কামিনী। বৃদ্ধা আবার তাকালো মোহনের দিকে, জানতে চাইলো, 'কি বুঝলে, বলো?'

'তোমার অনেক বয়স, এশা, জ্ঞান-বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি, তুমি কি বুঝেছো সেটা আগে শুনি।'

'নফরেত কিভাবে মারা গেছে প্রথম থেকেই তুমি সেটা জানো, নয় কি?' বৃদ্ধার ঝাপসা চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

'জানি বললে ভুল হবে,' ধীরে ধীরে জবাব দিলো মোহন। 'আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু এ শুধু আমার সন্দেহ।'

'ঠিক। কিন্তু আন্দাজ করার পিছনেও কিছু কারণ থাকে, থাকে যুক্তি। নিজেদের মধ্যে তিনজন আমরা সন্দেহ নিয়েও আলোচনা করতে পারি।'

কামিনী নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধার দিকে।

'আমার বুদ্ধি দিয়ে ঘটনাগুলোকে আমি তিনভাবে ব্যাখ্যা করতে

পারি,' বললো এশা। 'এক, রাখাল ছেলেটা সত্যিই নফরেতকে দেখেছে। নফরেতের অশান্ত আত্মা হয়তো সত্যি এই পরিবারের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। গুরুদেব মারস্থর তাই বিশ্বাস, তাছাড়া, আমরাও জানি দুষ্ট আত্মা মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে।'

'দুই?' জিজ্ঞেস করলো মোহন।

'ধরো, হিমানীই খুন করেছে নফরেতকে,' বললো এশা। 'তারপর নফরেতের আত্মাকে দেখতে পেয়ে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে হিমানী। এবার আমরা দ্বিতীয় সম্ভাবনা নিয়ে ভাবি এসো। ধরো, কি কারণে জানি না, ইমহোটেপের দুই ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিল কেউ। কিন্তু নিজের কুকীর্তি চাপা দেয়ার জন্যে রাখাল ছেলেটাকে সে ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মিথ্যে একটা গল্প বলিয়েছে। এমন একটা ভৌতিক গল্প, সবাই যা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করবে।'

'কিন্তু বড়দা আর মেজদাকে কে খুন করতে চাইবে?' জানতে চাইলো কামিনী, তার চোখ অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

'চাকর-বাকররা কেউ নয়,' বললো এশা। 'তাদের অতো সাহস হবে না। তাহলে বাকি থাকলাম বাড়ির আমরা অল্প কয়েকজন।'

'আমাদের মধ্যে কেউ?' হতভম্ব দেখালো কামিনীকে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো, দাদী-মা!'

'মোহনকে জিজ্ঞেস কর,' শুকনো গলায় বললো এশা। 'লক্ষ্য করেছিস, ও কোনো প্রতিবাদ করছে না?'

ঝট্ করে মোহনের দিকে ফিরলো কামিনী। 'মোহনদা, তুমি···?'

মৃদু গলায় মোহন বললো, 'তোমার বয়স কম, কামিনী, সবাইকে বিশ্বাস করো। মানুষের মনে বিষ থাকতে পারে, থাকতে পারে লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা—এসব তুমি বোঝো না।'

'কিন্তু তাই বলে···কে ? আমাদের মধ্যে কে সে···?'

কামিনীকে বাধা দিলো এশা। 'রাখাল ছেলেটার কথায় ফিরে আসা যাক। এমন হতে পারে সত্যিই সে একটা মেয়েলোককে দেখেছে, কিন্তু মেয়েলোকটা নফরেত নয়, নফরেতের মতো সাজগোজ করে ছিলো। কেতী হতে পারে সে, হতে পারে হেনেট, এমন কি কামিনী, তুই-ও হতে পারিস। চুপ। আমাকে বলতে দে। তিন, ছেলেটা হয়তো মিথ্যে কথা বলছে। সে যা বলেছে, তা তাকে আগেই বলার জন্যে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল। কে শিখিয়েছিল ? এমন কেউ, যাকে ছেলেটা ভয় করে বা ভালোবাসে, যার কথা সে ফেলতে পারবে না। সত্যি কথা হয়তো কোনো দিনই আমরা জানতে পারবো না, কারণ ছেলেটা বেঁচে নেই।'

'ওর মৃত্যুই বলে দেয়, গল্পটা ওকে বলার জন্যে শেখানো হয়েছিল, মন্তব্য করলো মোহন।

'ঠিক তাই,' সায় দিলো এশা। 'আজ তাকে চেপে ধরা হতো, কড়া জেরার মুখে সত্যি কথাটা বলে ফেলতে বাধ্য হতো সে। বাচ্চা একটা ছেলে মিথ্যে কথা বলছে কিনা ধরতে পারা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়।'

'হ্যাঁ, বললো মোহন। 'আমিও মনে করি, আমাদের মধ্যেই কেউ একজন খুনী।'

ঘন ঘন ওদের দু জনের দিকে তাকালো কামিনী, চোখে এখনো অবিশ্বাস।

'কিন্তু খুনগুলো করে কার কি লাভ, এখনও সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' বললো মোহন।

'পরিষ্কার আমার কাছেও নয়, বললো এশা। 'সেজন্যেই ভয়

পাচ্ছি। জানি না এরপর কার পালা।'

'কিন্তু এ অসম্ভব!' চাপা গলায় চিৎকার করে বললো কামিনী। 'আমাদের মধ্যে কেউ!'

'হ্যাঁ, কামিনী। হেনেট অথবা কেতী, আলা অথবা কোহি, এমন কি হয়তো ইমহোটেপ—হ্যাঁ, কিংবা হয়তো আমি এশা, বা মোহন...' বৃদ্ধা হাসলো, 'বা তুই, কামিনী।'

'তুমি ঠিক বলেছো, এশা,' গম্ভীর সুরে বললো মোহন, 'তালিকা থেকে আমাদেরও বাদ দেয়া চলে না।'

'কিন্তু কেন?' থরথর করে কাঁপছে কামিনী। 'কেন?'

'সেটা জানলে তো খুনীর পরিচয়ও বেরিয়ে আসে,' বললো এশা। 'তবে তালিকা থেকে এক এক করে কয়েকজনকে বাদ দিতে পারি আমরা। মনে রাখতে হবে, বারান্দায় বসে মদ খাচ্ছিলো ইয়ামো, হঠাৎ করে সেখানে হাজির হয় সোবেক, ওই সময় ওখানে তার আসার কথা ছিলো না। কাজেই ধরে নিতে পারি, বিষাক্ত মদ খাওয়াতে চাওয়া হয়েছিল সোবেককে নয়, ইয়ামোকে। সোবেকের দুর্ভাগ্য ওই সময় ওখানে এসে ঢক ঢক করে মদ খায়।'

'কিন্তু বড়দাকে কেউ খুন করতে চাইবে কেন? বড়দার তো কোনো শত্রু নেই। তার মতো শান্ত, নিরীহ, ভালোমানুষ এ বাড়িতে আর একটাও নেই!'

'কাজেই বোঝা গেল, এর পিছনে ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই,' বললো মোহন। 'কামিনী ঠিক বলেছে, কারো সাথে শত্রুতা করার লোক ইয়ামো নয়।'

'খুন করার অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে,' বললো এশা। 'কোনো কোনো উদ্দেশ্য এতো জটিল আর সূক্ষ্ম যে সহজে মানুষের চোখে

পড়ে না। বঞ্চিত একজন মানুষ, কিন্তু কখনো প্রতিবাদ জানায় না, ফলে তার মনে যে রাগ আছে কেউ তা টের পায় না, অথচ একদিন সে চুপিচুপি খুন করে বসে। এরকম ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে।'

'তোমার চিন্তা-ভাবনা কোন্ পথে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি,' বললো মোহন। 'কিন্তু কোনো উপসংহারে পৌঁছুবার আগে, এরপর, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমাদের।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো এশা, ফলে তার পরচুলা একটা কানের ওপর নেমে এলো। হাস্যকর দেখালো তার চেহারা, কিন্তু কেউ হেসে ওঠার মতো উৎসাহ পেলো না।

'ভবিষ্যদ্বাণীটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই, মোহন,' বললো বৃদ্ধা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো মোহন, চিন্তা করছে। একসময় মুখ খুললো সে। 'ইয়ামো মারা গেলে সবচেয়ে লাভবান হতো সোবেক। কারণ এরপর সোবেকের ওপর সব কাজে নির্ভর করতে হতো ইম-হোটেপকে। তার অনুপস্থিতিতে সোবেকই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতো, জমিজমা, ফসল আর ব্যবসা দেখাশোনা করতো। কিন্তু সোবেক যেহেতু মারা গেছে, তাকে আমরা বাদ দিচ্ছি। ইয়ামো মারা গেলে, সোবেকের পর লাভবান হতো আলা।'

'আমি একমত,' বললো এশা। 'কিন্তু এসো, আলার ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখি। আলা নষ্ট হয়ে গেছে, সে অস্থির, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। বড়দের ওপর তার কোনো শ্রদ্ধাবোধও নেই। আরেকটা কথা। কোহি তাকে এমন একটা কথা বলেছে, শুনে সোবেকের ওপর ভয়ানক ক্ষেপে যায় সে...।'

'কোহি ?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলো কামিনী।

কামিনীর উদ্বেগ লক্ষ্য করে এশা আর মোহন দু'জনই দৃষ্টি বিনিময় করলো, তারপর তাকালো কামিনীর দিকে। ওদের তাকানোর ভঙ্গি দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো কামিনী।

'হ্যাঁ,' বললো এশা। 'কোহি কথাটা হেনেটের কাছ থেকে শুনে বলেছে কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার। মোট কথা, আলা তার ভাই-দের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না। ওদের ওপর বরাবর অসন্তুষ্ট সে। তাছাড়া, পরিবারের মধ্যে নিজেকে সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে মনে করে।'

'তাই নাকি ?' অবাক দেখালো মোহনকে।

'শুধু মনে করে না, বলেও বেড়ায়।'

'কি বলতে চাইছো ?' রেগেমেগে জানতে চাইলো কামিনী। 'আলা ওদেরকে বিষ খাইয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল ?'

'একটা সম্ভাবনার কথা বলছি, তার বেশি কিছু না। আমরা শুধু সন্দেহ করছি, এখনো কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ যোগাড় করতে পারিনি। ভাই ভাইকে খুন করেছে, এ নতুন কিছু না। আলা যদি সত্যি কাজটা করে থাকে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড় করা সহজ হবে না। কারণ, আলা সত্যি ভারি চালাক।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো মোহন।

'চাকর-বাকরদের বাদ দিলেও, হেনেটকে আমি সন্দেহের বাইরে রাখতে চাই না,' বললো এশা।

'হেনেট !' প্রায় আঁতকে উঠলো কামিনী। 'বক বক করে, ঝগড়া বাধায়, কিন্তু তাই বলে···দুর ! আমার জন্মের আগে থেকে এ-বাড়িতে আছে সে। যে যাই বলুক, আমাদের ওপর তার দরদ আছে। তাছাড়া,

তার স্বার্থটা কি ?'

'যুবতী বয়সে এই পরিবারে আসে হেনেট,' বললো এশা। 'দেখতে ভালো ছিলো না, স্বভাবটা ছিলো খারাপ, কাজেই স্বামী তাকে বিদায় করে দেয়। একটা বাচ্চা হয়েছিল, কিন্তু ছোটোবেলাতেই মারা যায়। তোর মায়ের সাথে সাথে থাকতো সে, বাইরে থেকে দেখে মনে হতো বটে তোর মাকে খুব ভক্তি করে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক উল্টো ছিলো। তোর মা ছিলো সুন্দরী, স্বামী ছিলো তার প্রেমে মুগ্ধ, ছেলেরা ছিলো স্বাস্থ্যবান—সব মিলিয়ে সুখের সংসার করছিল। মনে মনে তাকে হিংসা করতো হেনেট। আমার চোখে ব্যাপারটা ঠিকই ধরা পড়তো। তোর মা মারা যাবার পর ইমহোটেপ আর বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু এই হেনেটই তাকে রাজি করায়। কাজেই, মুখে যাই বলুক, তোদের ওপর ওর দরদ আছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

'এই পরিবারের কেউ ওকে পছন্দও করে না,' বললো মোহন। 'নিশ্চই এর পিছনে কারণ আছে। তার জিভের এমনই ধার, কারো উপকার না করে ক্ষতিই করে।'

কামিনী কি বলবে ভেবে পেলো না। এশা আর মোহন দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে কামিনী বললো, 'কিন্তু বাবা তো হেনেটকে খুব বিশ্বাস করে।'

'আমি তো সব সময় বলে এসেছি, ইমহোটেপের মাথায় ঘিলু জিনিসটা কম,' বললো এশা। 'তোষামোদ পছন্দ করে, আর হেনেট সেটা জানে। তোর বাপের ওপর কিছুটা দরদ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পরিবারের আর কাউকে সে দেখতে পারে না।'

'কিন্তু আমাদেরকে খুন করে তার লাভ কি ?'

'লাভ কি সেটা বলা কঠিন। আসলে হেনেটের মাথায় কি চলছে কেউ তা জানে না। লাভের কথা হয়তো সে ভাবছেই না। এটা হয়তো স্রেফ তোর মায়ের ওপর ঈর্ষা—এতোদিন পর বিস্ফোরিত হচ্ছে। যার সুখ তার সহ্য হয়নি, তার রেখে যাওয়া সোনার সংসারটাকে ধ্বংস করে এক ধরনের আনন্দ পেতে চাইছে।'

'আশ্চর্য!' গালে হাত দিলো কামিনী। 'এতোদিন ধরে যাকে যেভাবে চিনে এসেছি, হঠাৎ করে তোমরা বলছো তারা সেরকম নয়, ঠিক তার উল্টো।' মোহনের একটা হাত চেপে ধরলো সে। 'মোহনদা, আমার ভয় করছে।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল এশার মুখে। 'হ্যাঁ, ভয় তো লাগারই কথা। কিন্তু মোহনের হাত ধরে থাকলে তোর অন্তত কোনো চিন্তা নেই।'

ঝট্ করে হাতটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিলো কামিনী।

'এবার কেতীর কথা,' বললো এশা।

'তুমি আসলে প্রলাপ বকছো,' ঝাঁঝের সাথে বললো কামিনী। 'নিজের স্বামীকে কেউ কখনো খুন করে?'

'করে লো, করে,' বললো এশা। 'এইটুকু জীবনে তুই আর কতোটুকু দেখেছিস। কেতীকে আমি বোকা বলে জানি আর বোকারা চিরকাল বিপজ্জনক হয়ে থাকে। ওরা শুধু নিজের চারপাশটা দেখতে পায়, একবারে দেখেও শুধু একটা জিনিস। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে, সোবেককে দেখে তাদের বাপ হিসেবে—নিজের মনের মানুষ বা স্বামী হিসেবে নয়। সে ভেবে থাকতে পারে, ইয়ামো না থাকলে তার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। ইয়া-

মোর ওপর আস্থা আছে তোর বাপের, সে না থাকলে সোবেকের ওপর আস্থা রাখতে হবে তার। কেতীর চিন্তা-ভাবনা এই খাতে বয়ে থাকলে আমি অন্তত আশ্চর্য হবো না।'

'কিন্তু কেতী কি ভেবে দেখেনি ওই মদ সোবেকও খেতে পারে?'

'বোকা, তাই চিন্তাটা তার মাথায় আসেনি,' বললো এশা। 'অথচ ঘটলো ঠিক উল্টোটা। ইয়ামো বাঁচলো, মারা গেল সোবেক। বোকাদের বেলায় এই-ই হয়।' একটু থেমে সে বললো, 'এবার আমরা কোহিকে নিয়ে আলোচনা করবো।'

'কোহি?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো কামিনী। অনুভব করলো, মোহন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'হ্যাঁ, কোহিকেও আমরা তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। এমনিতে মনে হতে পারে, কেন সে আমাদের ক্ষতি করতে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাকে কি আমরা সত্যি চিনি?'

মোহন কোনো মন্তব্য করলো না।

'আমরা জানি দক্ষিণ থেকে এসেছে সে,' আবার বললো এশা। 'যেখান থেকে নফরেত এসেছিল। নফরেতকে সাহায্যও করেছে সে। কে বলবে ইচ্ছা করে করেনি? তাকে দেখে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝেছি আমি, মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতা আছে, মেয়েরাও তার দিকে আকৃষ্ট হয়। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে নফরেতের মৃত্যুতে সে কাতর হয়নি, কিন্তু তার মনের কথা কে জানে? কে জানে নফরেতকে সে ভালোবাসতো কিনা? কে জানে নফরেত মারা যাওয়ায় তার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠেনি?' হঠাৎ মোহনের দিকে তাকালো সে। 'তুমি এবার কিছু বলো, মোহন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মোহন বললো, 'আমার নিজস্ব

একটা ধারণা আছে, হ্যাঁ। কে মদে বিষ মিশিয়েছে, কেন মিশিয়েছে ···কিন্তু ব্যাপারটা এখনো তেমন পরিষ্কার নয়—তাই, স্পষ্ট কোনো অভিযোগ আমি তুলছি না।'

'আমরা এখানে সন্দেহ করা নিয়ে কথা বলছি, মোহন,' বললো এশা, 'কাজেই তোমার ধারণার কথা তুমি বলতে পারো।'

মাথা নাড়লো মোহন। 'না, দাদী-মা। এই পর্যায়ে আমি মুখ খুলতে পারি না। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তোমাদের তা না জানাই ভালো। এই জ্ঞান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'এই জ্ঞান তাহলে তোমার জন্যেও বিপজ্জনক, মোহন?' এশার ঝাপসা চোখে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো দৃষ্টি।

'আমরা সবাই বিপদের মধ্যে আছি, দাদী-মা। তবে, কামিনীর বিপদ সবচেয়ে কম।'

মোহনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো এশা। তারপর বললো, 'তোমার মনে কি চলছে জানার বদলে মাস কয়েকের আয় দিতেও আমি আপত্তি করবো না।'

সাথে সাথে কিছু বললো না মোহন, মনে হলো কি যেন চিন্তা করছে সে। এক সময় বললো, 'মানুষ কি ভাবছে সেটা ধরা পড়ে তার আচরণে। কেউ যদি উদ্ভট আচরণ শুরু করে, কিংবা তার আচরণে তাকে যদি চেনা না যায়···।'

'তাহলে তাকে তুমি সন্দেহ করবে?' জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

'না,' বললো মোহন। 'তাকে আমি সন্দেহ করবো না। এই জন্যে যে সত্যিকার অপরাধী চেষ্টা করবে তার আচরণে যেন অস্বাভাবিক কিছু ধরা না পড়ে। যে লোকের মনে পাপ, সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে।'

'লোক ? একজন পুরুষ মানুষ ?' দ্রুত প্রশ্ন করলো এশা।

'পুরুষমানুষ হোক আর মেয়েমানুষ, একই কথা।'

'হুঁ। কিন্তু আমাদের নিয়ে কি আলোচনা হবে ? আমাদের তিন-জনকে নিয়ে ? আমরাও তো সন্দেহের বাইরে নই।'

'হ্যাঁ, আমরাও সন্দেহের বাইরে নই,' গম্ভীর গলায় বললো মোহন। 'আমাকে খুব বেশি বিশ্বাস করা হয়। ফসল বিনিময়, ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন সব আমিই করি। লাভ-লোকসানের হিসেব সব আমার কাছেই থাকে। হিসেবে গরমিল করা আমার পক্ষে সম্ভব, আর সেটা লক্ষ্য করে ইয়ামো হয়তো আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে, আমি ইয়ামোকে শত্রু হিসেবে দেখে থাকতে পারি। সেক্ষেত্রে ইয়ামোকে সরিয়ে দেয়ার কথাই ভাববো আমি।' কথা শেষ করে মৃদু একটু হাসলো মোহন।

'যতোসব আজগুবি কথা!' হাত নেড়ে বললো কামিনী। 'এমন-ভাবে বলছো, যেন সত্যি সত্যি এসবের জন্যে তুমিই দায়ী।'

'আর আমি ?' জানতে চাইলো এশা। 'আমাকে সন্দেহ করার কি কি কারণ দেখতে পাও ? থামো, আমি নিজেই বলি। আমার তিন কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর মানুষ বুড়ো হলে তার শরীর তো অসুস্থ হয়ে পড়েই, মনও সুস্থ থাকে না। অসুস্থ মন ভালো না বেসে ঘৃণা করে। আমি হয়তো তোমাদের প্রাণ চাঞ্চল্য আর সুস্থতা দেখে ঈর্ষায় ভুগছি।'

'আর আমি ?' জিজ্ঞেস করলো কামিনী। 'আমি কেন আমার ভাইদের খুন করতে যাবো ?'

'তোমার তিন ভাই মারা গেলে তুমি ছাড়া তোমার বাপের আর কেউ থাকবে না,' বললো মোহন। 'সে তোমার জন্যে একটা স্বামী

বাছাই করবে, আর তার যেখানে যতো সয়-সম্পত্তি আছে সব তুমি পাবে।' হঠাৎ কামিনীর কাঁধে একটা হাত রাখলো সে। 'কিন্তু, কামিনী, আমাদের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই আমরা সন্দেহ করি না।'

'আমরা, আমি আর মোহন, তোকে ভালোবাসি,' চোখ মটকে বললো বৃদ্ধা। কথাটা মনে রাখিস। আমি, আর মোহন।'

তেরো

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—পয়লা তারিখ

বাড়িতে এশাকে ঢুকতে দেখে আড়াল থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এলো হেনেট, খিক খিক করে একটু হেসে বললো, 'তা মোহনের সাথে এতোক্ষণ ধরে কি কথা হলো তোমার?'

কটমট করে তাকালো এশা। 'তা জেনে তোমার কি দরকার?'

'হ্যাঁ, তাই তো, আমি এ-বাড়ির কে? সামান্য দাসী বইতো নই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো হেনেট। একটা চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে এশাকে।

পিত্তি জ্বলে গেল এশার। 'ইমহোটেপ তোমাকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছে। দেবতা না করেন তার যদি কিছু হয়, তোমার কি অবস্থা হবে তাই ভাবি।'

'মনিব আমার সম্পূর্ণ নিরাপদ, তার কোনো ক্ষতি হবে না,' জোর দিয়ে বললো হেনেট।

'কি করে জানলে? সোবেক মারা গেল, ইয়ামো মরতে মরতে বাঁচলো। নফরেত মরলো। হিমানী মরলো। ইমহোটেপের কিছু হবে না, কে বললো তোমাকে?'

'সোবেক মারা গেছে, সত্যি। ইয়ামোও মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু আমি জানি মনিবের কোনো বিপদ নেই।'

হেনেটের দিকে হঠাৎ ঝুঁকলো এশা। 'কথাটা বলার সময় তুমি হাসলে কেন?'

'আমি? হাসলাম?' থতমত খেয়ে গেল হেনেট। 'কি বাজে কথা বলছো! হাসবো কেন?' চট করে চারপাশটা দেখে নিলো সে।

'চোখে আমি কম দেখি,' কঠিন সুরে বললো এশা, 'কিন্তু যতোটা ভাবো ততোটা নয়। পরিষ্কার দেখলাম তুমি হাসলে। কারণটা তোমাকে বলতে হবে, হেনেট।'

হেনেটকে বিচলিত দেখালো। 'কি জ্বালা! বলছি আমি হাসিনি...।'

'এই হাসলে, আবার এখন ভয়ে কাঁপছো, ব্যাপারটা কি?'

'ভয় পাবো না? একের পর এক যা ঘটছে, তুমি ভয় পাওনি? অশান্ত আত্মা এরপর কার ওপর আসর করে কে জানে।' একটু থেমে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো হেনেট। 'তা, মোহন কি বললো?

নিশ্চই আমাকে নিয়ে…।'

'তোমার সম্পর্কে কি জানে সে, হেনেট ?'

'কি—কি জানবে। বরং জিজ্ঞেস করো, তার সম্পর্কে আমি কি জানি।'

এশার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'বেশ, কি জানো তুমি ?'

নিজের কপালে হাতের তালু দিয়ে চাপড় মারলো হেনেট। 'সবাই মনে করে কানী বুড়ি দেখতে কুৎসিত, আর বোকা। কে জানে, আমিই হয়তো এ-বড়িতে সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখি। যেখানেই দেখা হোক, যখনই দেখা হোক, মোহন এমন ভাব দেখায়, আমার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই—যেন, আমাকে নয়, আমার পিছনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে সে। বুঝি, বুঝি। নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করে মোহন। কিন্তু বেশি চালাক মনে করলে তার পরিণতি কি হয়, দেখেনি সে ? হিমানী নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করতো, এখন সে কোথায় ?' হেনেটের বসন্তের দাগে ভরা চেহারায় বিজয়ের উল্লাস ফুটে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই কেন যেন শিউরে উঠলো সে, ভয়ে ভয়ে চারদিকে দ্রুত চোখ বুলালো।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো এশা। কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, 'হিমানী…।'

'না… মানে…আমি দুঃখিত, মা,' হড়বড় করে বললো হেনেট। ঝট্ করে নিজের পিছনটা দেখে নিলো একবার। 'মাথা গরম করে কি বলেছি, ভুলে যাও। আসলে আমি বোঝাতে চাইনি…মানে…।'

'যাও, হেনেট। তুমি কি বোঝাতে চেয়েছো বা বোঝাতে চাওনি, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমার একটা কথা আমার যেন একটা চোখ খুলে দিলো। নতুন একটা চিন্তা ঢুকলো মাথায়। যাও,

হেনেট, আর শোনো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—জবান-টাকে সামলে রেখো, বুঝেশুনে কাজ করো। আমরা আর কারো মৃত্যু দেখতে চাই না। আমি কি বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পেরেছো তুমি।'

ছেলেমেয়েদের নিয়ে উঠনে রয়েছে কেতী। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কামিনী। কেতীর সামনে দাঁড়াতে তার ভয় লাগবে। যদি তার চেহারায় একজন খুনীর পরিচয় ফুটে ওঠে? শান্ত, নিরীহ কেতী, সে কাউকে খুন করতে পারে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে এগোলো কামিনী।

বারান্দায় উঠতে যাবে, তার পাশ ঘেঁষে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল হেনেট। আপনমনে বিড়বিড় করছে সে, কামিনীর মনে হলো কানী বড়ি খুব ভয় পেয়েছে।

বারান্দায় উঠে আলার সামনে পড়লো কামিনী। থমকে দাঁড়িয়ে ছোটো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

'কি ব্যাপার?' নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চাইলো আলা। 'আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকার মানে কি?' বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা নব্য যুবক, চেহারায় রগচটা ভাব, চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'এরকম ধমকের সুরে কথা বলছিস যে?' একটু রাগের সাথে জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

হঠাৎ হেসে উঠলো আলা। কামিনীর মনে হলো, আলার গলার আওয়াজ এতোটা কর্কশ, আগে সে তা লক্ষ্য করেনি। 'দেখলে, হেনেট কেমন ভয় পেয়েছে? ও একটা আস্ত বোকা। মেয়েরা

অবশ্য বোকাই হয়। তুমিও মেয়ে তো…'

'নিজেকে খুব চালাক মনে করিস, না?'

'আমি চালাক না বোকা, দু'দিন পরই সেটা দেখতে পাবে,' হাসতে হাসতে বললো আলা। 'কিন্তু তোমরা যে আমাকে এখনো ছেলেমানুষ মনে করো, সেটা আমার একেবারেই অসহ্য লাগে।'

'মাত্র আঠারোয় পড়েছিস…।'

'অথচ এই আঠারোতেই এতো বড় জমিদারী, এতো বড় ব্যবসা, সব আমার হাতে চলে আসছে,' বললো আলা, তার চেহারায় বিজয়ের উল্লাস। 'ব্যাপারটা অবশ্য তোমাদের অনেকেরই পছন্দ হবে না, কিন্তু ঘটতে যাচ্ছে ঠিক তাই। একজন তো পটল তুলেছে, আরেকজন মরতে মরতে বেঁচে গেলেও, পুরোপুরি সুস্থ কবে হবে তার কোনো ঠিক নেই। বাবা এখন শুধু আমার ওপর ভরসা করবে, তাছাড়া তার আর কোনো উপায়ও নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চেয়েওছিলাম ঠিক এই রকম একটা কিছু ঘটুক।'

'ওরা না তোর বড় ভাই?' কামিনীর চোখে রাগ আর ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'এভাবে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না?'

'আমাকে অংশীদার করার সময় ওরা যখন বাধা দিলো, ওদের লজ্জা করেনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো আলা, তার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। 'আমি তো রাতদিন দেবতাদের বলছি, ইয়ামো যেন চিরকাল অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।'

'কিন্তু গুরুদেব মারসু বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে বড়দা।'

'ডাক্তারদের শুধু লম্বা লম্বা কথা,' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো আলা। 'আমার মন বলছে, ইয়ামো আর কোনোদিনই সুস্থ হবে না।

নফরেতকেই দোষ দাও, আর যাকেই দোষ দাও।'

'তুই একদম গেছিস,' ঠাণ্ডা সুরে বললো কামিনী। 'আচ্ছা, এসব ঘটছে, তোর ভয় করে না?'

'ভয়?' হো হো করে হেসে উঠলো আলা।

'নফরেত তোকেও পছন্দ করতো না, আলা,' স্মরণ করিয়ে দিলো কামিনী। 'তুই ও তাকে খুন করবি বলে হুমকি দিয়েছিলি।'

'ওসব অশান্ত আত্মা-ফাত্মাকে আমি ডরাই না,' ঠোঁট উল্টে বললো আলা। 'আমি জন্মেইছি জমিদার হবার জন্যে। দেখতেই পাচ্ছো, ভাগ্যও আমাকে সাহায্য করছে। তাই তোমাকেও আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ভালো চাও তো আমার দলে থাকো। কিছুদিনের মধ্যেই আমার হুকুমে চলবে সব।' পিছন ফিরলো সে, দরজার দিকে এগোলো। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো কামিনীর দিকে। 'তোমার স্বামী নেই, তাই না? কে দেখবে তোমাকে? আমি সব কিছুর মালিক হয়ে বসার পর ইচ্ছে রাখি অনেকগুলো বিয়ে করবো।' ঝড়ের বেগে বারান্দা থেকে নেমে গেল আলা।

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলো কামিনী। দেয়াল ধরে কোনোমতে তাল সামলালো। কি বললো তাকে আলা? কি বলতে চাইলো? আলা, তার ছোটো ভাই! কি আভাস দিয়ে গেল?

কামিনীর মনে পড়লো, কোথায় যেন শুনেছে, দূর গ্রামে বেশ্যা মেয়েদের কাছে আসা-যাওয়া করে আলা। বিশ্বাস করেনি কথাটা। এখন বিশ্বাস হচ্ছে।

ভয় পেলো কামিনী। সব বাড়িতেই যুবতী মেয়েদের এই ভয়টা থাকে। ভায়েদের নজর এড়িয়ে চলতে হয়। কিন্তু এ-বাড়িতে এ-ধরনের ভয় ছিলো না এতোদিন।

মনে মনে শিউরে উঠলো কামিনী। নতুন একটা ভয় তাকে গ্রাস করতে চাইলো। টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো সে।

'কামিনী?'

কেতীর গলা পেয়ে চমকে উঠলো কামিনী।

'কি হয়েছে তোমার? তোমার চেহারা অমন নীল কেন?' বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলো কেতী।

'ন্না···ও কিছু না।'

'কিছু না? আলা অমন ছুটে চলে গেল কেন? কি বললো তোমাকে?' কেতীর চোখে সন্দেহ আর বিস্ময়।

'বললো···বললো, সেই নাকি এই পরিবারের কর্তা হবে।'

'তাই নাকি?' খিলখিল করে হেসে উঠলো কেতী। 'আমার কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ধারণা।'

ইয়ামোর ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো আলা। চারদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো সে। লম্বা একটা চেয়ারে আধশোয়া ইয়ামো চোখ মেলে আলাকে দেখতে পেলো, সাথে সাথে তন্দ্রার ভাব ছুটে গেল তার।

'এই যে, ইয়ামো, কেমন আছো?' মুচকি হাসির সাথে জানতে চাইলো আলা। ইয়ামো অচল হয়ে পড়ায় সে যে খুব খুশি তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। 'ক্ষেতে-খামারে কবে তোমাকে আবার আমরা দেখতে পাবো? তোমাকে ছাড়া কেন যে সব ভেস্তে যাচ্ছে না সেটাই আশ্চর্য হয়ে ভাবছি।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলো না ইয়ামো। তাকে খুব দুর্বল দেখালো। থেমে থেমে কথা বললো সে, গলায় জোর পাচ্ছে না, 'আমি বোধ-

হয় বাঁচাবো না রে। বিষের প্রভাব নাকি কেটে গেছে, কিন্তু তাহলে শক্তি ফিরে পাচ্ছি না কেন? আজ সকালে অনেক সাহস করে হাঁটতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পায়ে জোর পেলাম না। প্রতিদিন আরো যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি।'

কৃত্রিম সহানুভূতি ফুটে উঠলো আলার চেহারায়। 'সত্যি খুব খারাপ কথা। গুরুদেব মারসু তাহলে কোনো সাহায্যই করতে পারছে না?'

'গুরুদেবের সহকারী তো রোজই এসে দেখে যাচ্ছে,' বললো ইয়ামো। 'কিন্তু আমার অবস্থা বুঝতে পারছে না সে। কতো রকমের শিকড় বাটা খাচ্ছি, দেবতাদের নামে আমার জন্যে বলি দেয়া হচ্ছে মন্দিরে, বিশেষভাবে তৈরি পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছি। অথচ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা!' হাসি চেপে বললো আলা। চেহারায় তৃপ্তির ভাব নিয়ে ইয়ামোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

ইমহোটেপ তার নিজের ঘরে মোহনের সাথে বসে হিসেব পরীক্ষা করছিল। ছোটো ছেলেকে ঢুকতে দেখে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'এই যে, আমার মাণিক রতন। ফসলের খবর কি, বাপ?'

'খুবই ভালো, বাবা। এবার যা বালি হবে না!'

'তুই-ই যা একটা ভালো খবর শোনালি। 'কিন্তু ইয়ামোকে নিয়ে ভারি দুশ্চিন্তায় আছি রে। যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, ওকে বাঁচাবো কিভাবে!'

তাচ্ছিল্যের সাথে আলা বললো, 'ইয়ামো চিরকালই দুর্বল।'

'না-না, স্বাস্থ্য ওর চিরকালই ভালো...'

'দেখতে মোটাসোটা হলেই স্বাস্থ্য ভালো হয় না,' বাবাকে বাধা

দিয়ে বললো আলা। 'মনের জোর আসল কথা। ইয়ামো তো ভীতুর ডিম, সেজন্যেই দিনে দিনে কাহিল হয়ে পড়ছে। মনের দিক থেকে এতোই দুর্বল কাউকে কড়া সুরে হুকুম পর্যন্ত দিতে পারে না।'

'কিন্তু ইয়ামো অনেক বদলে গিয়েছিল,' বললো ইমহোটেপ। 'কিছু কিছু দায়িত্ব নিচ্ছিলো ও, আগের সেই ভয় ভয় ভাব আর দ্বিধা প্রায় ছিলো না বললেই চলে। অবাক হলেও, ভারি খুশি হয়েছিলাম আমি। তারপরই এই বিপদ। এখন কি যে করি। কোনোভাবেই ওর শক্তি ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। গুরুদেব আশ্বাস দিলেন অথচ···।'

হাতের প্যাপিরাস এক পাশে সরিয়ে রাখলো মোহন। 'বিষ কিন্তু অনেক রকম আছে,' শান্ত গলায় বললো সে।

'মানে?' ঝট্ করে মোহনের দিকে ফিরলো ইমহোটেপ।

মোহন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, ধীরে সুস্থে বললো, 'সব বিষই সাথে সাথে কাজ করে না। কাউকে যদি একটু একটু করে খাওয়ানো হয়, দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়বে সে—মৃত্যু ঘটবে অনেক দিন পরে। বিশেষ করে মেয়েরা এ-ধরনের বিষ সম্পর্কে ভালো জানে। তারা তাদের স্বামীদের খুন করার জন্যে ব্যবহার করে এই বিষ, লোকে যাতে মনে করে ব্যাপারটা খুন নয়, স্বাভাবিক মৃত্যু।'

ইমহোটেপের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'তুমি···তুমি বলতে চাইছো, ইয়ামোকে কেউ সে-ধরনের বিষ খাওয়াচ্ছে?'

'আমি শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছি,' বললো মোহন। 'আমি জানি, ওর খাবারদাবার প্রথমে চাকর-বাকরকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু এই সাবধানতার কোনো অর্থ নেই। কারণ চাকর সামান্য একটু খাবার খায়, তাতে তার দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা নেই।'

'যতো সব পাগলের প্রলাপ!' চেঁচিয়ে উঠলো আলা। 'এ-ধর-

নের বিষ থাকতেই পারে না। থাকলে…' থাকলে কি হতো তা আর উচ্চারণ করলো না সে।

মোহন শান্ত গলায় বললো, 'তুমি এখনো ছোটো, আলা। দুনিয়ার অনেক কিছুই তোমার জানা নেই।'

'এখন তাহলে কি করা দরকার?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলো ইমহোটেপ। 'আশায়েতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। ভোগ দেয়া হয়েছে মন্দিরে। আর কি করতে পারি আমরা?'

একটু চিন্তিত দেখালো মোহনকে। তারপর সে বললো, 'একটা কাজ অবশ্য করা যায়। বিশ্বাসী কোনো চাকরকে দিয়ে তৈরি করানো হোক ইয়ামোর সমস্ত খাবার। সেই সাথে চাকরের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার ব্যবস্থা থাকবে।'

'তারমানে! তারমানে তুমি বলতে চাইছো এই বাড়িতেই কেউ?'

চেঁচিয়ে উঠলো আলা, 'যতো সব পাগলের প্রলাপ!'

মোহন বললো, 'ব্যবস্থা করে দেখাই হোক না। প্রলাপ কিনা জানা যাবে।'

রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আলা। চোখ কুঁচকে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো মোহন। তাকে খুব চিন্তিত দেখালো।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আলা, ধাক্কা খেলো হেনেটের সাথে। 'কানী বুড়ি,' মারমুখো হয়ে বললো সে, 'তোর স্বভাবই এই, আড়াল থেকে কথা শোনা! সরে যা আমার সামনে থেকে।'

এক হাত দিয়ে কাঁধ ডলছে হেনেট। 'তুই আমাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা

দিলি।'

'সময় আসছে, ধাক্কা দিয়ে একেবারে এই বাড়ি থেকেই বের করে দেবো তোকে।' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো আলা।

খনখনে স্বরে ইনিয়েবিনিয়ে কান্না জুড়ে দিলো হেনেট, কিন্তু চোখে পানি নেই। চটাস করে কপালে চাপড় মেরে বললো, 'হায় হায়, এই ছিলো আমার কপালে। সারা জীবন তোদের জন্যে খেটে মরলাম, আর তোরা বলিস কিনা এই বুড়ি বয়েসে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবি। দেবতারা সব দেখছেন, তোদের মাথায় গজব ফেলবেন তাঁরা।'

'এহ্, উনি আমাদের জন্যে খেটে মরছেন।' হেনেটকে ভেঙচালো আলা। 'ভেবেছিস তোকে আমি চিনি না? এই কানী, নফরেতের পক্ষ নিয়েছিলি কেন তাহলে? শুধু বাবা তোকে কিছু বলে না বলে, তা-না হলে আমি তোকে···। কিন্তু বেশি দিন না, শেষ পর্যন্ত আমার ওপর ভরসা করতে হবে বাবাকে। তখন দেখবো বাবা কিভাবে তোর কথা শোনে।'

ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে হেনেট, তার নাকি কান্নায় কোনো লাভ নেই। গলার সুর পাল্টে জানতে চাইলো সে, 'রেগে একেবারে টং হয়ে আছিস। কি এমন ঘটলো···?'

'যাই ঘটুক, তোর জানার দরকার নেই।'

চারদিকে দ্রুত একবার তাকালো হেনেট। 'কোনো কারণে ভয় পাসনি তো, আলা?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো সে। 'বাড়িতে ভয় পাবার মতো অনেক ঘটনাই তো ঘটছে।'

'ডাইনী বুড়ি, ভেবেছিস তুই আমাকে ভয় দেখাতে পারবি?' কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো আলা। হেনেটকে আরেকবার ধাক্কা দিয়ে

বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে।

ধীরে ধীরে কুঁজো বুড়ি হেনেট বাড়ির ভেতর ঢুকলো। ইয়ামোর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার তাকালো সে। তারপর স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। ইয়ামোর গলা থেকে মৃদু কাতরানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আরাম কেদারা থেকে উঠে হাঁটার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, বার বার পড়ে যাবার উপক্রম করছে। দেয়াল ধরে হাঁপাতে লাগলো সে। আবার পড়ে যাচ্ছিলো, দ্রুত এগিয়ে এসে হেনেট তাকে ধরে ফেললো।

'এসো, ইয়ামো, খামোকা নিজেকে কষ্ট দিয়ো না,' বললো হেনেট। 'এখন তুমি দুর্বল, হাঁটাহাঁটি সইবে না। চলো, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।' হেনেটের সাহায্যে বিছানায় এসে শুলো ইয়ামো। তার চেহারা ম্লান, কপালে ঘাম ফুটেছে। চোখে রাজ্যের হতাশা।

হেনেটকে সে বললো, 'আশ্চর্য! এই বয়সেও তোমার গায়ে এতো জোর, হেনেট! দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কি হয়েছে বলো তো? গায়ে জোর পাচ্ছি না কেন? মনে হচ্ছে পেশীগুলো সব নরম কাদা হয়ে গেছে।'

'আমি তো বরাবর বলে আসছি, এ-বাড়িতে দুষ্ট আত্মা ভর করেছে।'

বিড়বিড় করে ইয়ামো বললো, 'আমি বাঁচবো না। কেউ বুঝতে পারছে না, আমি মারা যাচ্ছি। আমি...'

নিচু গলায়, ফিসফিস করে হেনেট বললো, 'না। তোমার আগে অন্যান্যরা মারা যাবে।' তাকে গম্ভীর দেখালো।

'কি? কি বলো?' বিছানার ওপর উঠে বসে হাঁপাতে লাগলো ইয়ামো। 'তোমার এ-কথার মানে?'

'বুঝেশুনেই বলছি।' বারকয়েক মাথা ঝাঁকালো হেনেট। তার একটামাত্র চোখে অদ্ভুত একটা অচেনা দৃষ্টি ফুটে উঠলো, যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে সে। 'এরপর যে মারা যাবে সে তুমি নও। দেখো।'

'আমাকে তুমি এড়িয়ে চলো কেন, কামিনী?' কামিনীর পথরোধ করে দাঁড়ালো কোহি।

চেহারা লালচে হয়ে উঠলো কামিনীর, কি বলবে ভেবে পেলো না। এ-কথা সত্যি, কোহিকে আসতে দেখলে অন্য দিকে চলে যায় সে।

'কেন, কামিনী? কি করেছি আমি?'

কোনো উত্তর তৈরি করা নেই, শুধু মাথা নাড়লো কামিনী। তারপর সে মুখ তুলে কোহির চোখে চোখ রাখলো। তার স্বামী কাসিনের সাথে কোহির চেহারার খানিকটা হয়তো মিল আছে। কোহির চেহারায় রয়েছে হাসিখুশি, আমুদে একটা ভাব। কিন্তু এই মুহূর্তে কোহির ঠোঁটে হাসি নেই। কোহির অস্তিত্ব তাকে আড়ষ্ট করে তোলে। তার বুক ধড়ফড় করে, রোমাঞ্চ জাগে সারা শরীরে।

'আমি জানি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো। কিন্তু কেন, কামিনী? আমি কোনো অন্যায় করেছি?'

মৃদু গলায় কামিনী বললো, 'এড়িয়ে চলবো কেন। তুমি আসছো আমি দেখতে পাইনি।'

'মিথ্যে কথা,' হেসে উঠে বললো কোহি। 'আসলে হয়তো তুমি সুন্দরী বলে আমাকে পাত্তা দিতে চাও না। তা যদি হয়, আমার কিছু বলার নেই। তবে···কামিনী, তোমাকে আমি···' কোহি কামি-

নীর একটা হাত ধরলো, 'তোমাকে আমি…'

ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো কামিনী। আমাকে ছোঁবে না! কেউ ছুঁলে তাকে আমি ঘেন্না করি!'

থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল কোহি। 'তুমি আমার সাথে হঠাৎ এমন করছো কেন বলো তো? আমাদের দু'জনের মধ্যে কি ঘটছে, দু'জনই তা ভালো করে জানি। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই। বুড়ো-বুড়িদের কাছে শোনোনি, প্রেম চিরকাল পবিত্র। তুমি তোমার মৃত স্বামীর জন্যে বাকি জীবন নিজেকে বঞ্চিত করবে, এর তো কোনো মানে হয় না।'

কামিনী মাথা নিচু করে ফেললো।

'তোমাদের এই বাড়ি অভিশপ্ত বাড়ি,' বললো কোহি। 'এখান থেকে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই। এখন শুধু তুমি বলো…'

'কিন্তু আমি যদি যেতে না চাই?' চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

কোহির চেহারায় আমুদে ভাবটুকু ফিরে এলো। 'আসলে তুমি যেতে চাও, কিন্তু মুখে স্বীকার করছো না। আমরা যদি ভাই-বোন হিসেবে সংসার করার সুযোগ পাই, জীবনটা সুখের হবে, কামিনী। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে নিরাপত্তা আছে, এটুকু নিশ্চই তুমি বোঝো। তোমার জন্যে আমার বুকে,' নিজের বুকে একটা হাত রাখলো কোহি, 'সাত সাগর প্রেম উথাল পাথাল করছে।'

অদ্ভুত এক পুলকে অবশ হয়ে এলো কামিনীর শরীর। আপনা থেকেই তার মাথা নত হয়ে এলো। 'আমি লিখতে জানি, কামিনী। কোনোদিন তোমার খাওয়া-পরার অভাব হবে না। দেখতে আমি হয়তো অনেকের মতো সুন্দর নই, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য কি কারো

চেয়ে খারাপ? আর তুমি শুধু সুন্দরী নও, তোমার স্বাস্থ্যও ভারি চমৎকার। ছোটো কিছু ফসলের জমি থাকবে আমাদের। স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে হবে তোমার। ছুটির দিনে আমরা নৌকো নিয়ে নীলনদে বেড়াতে যাবো। আমাদের সাথে তোমার তানিও থাকবে। তানিকেও আমি আমাদের ছেলেমেয়েদের মতো ভালোবাসবো।' একটু থামলো কোহি। তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'অমন চুপ করে থেকো না, কামিনী, কিছু একটা বলো।'

সারা শরীর কাঁপছে কামিনীর। ঘামতে শুরু করেছে সে। ভাবলো, ও আমার হাত ধরায় আমি সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছি। জানি, কোহি স্বাস্থ্যবান, গায়ে খুব জোর রাখে। জানি, আমাদের ছেলে-মেয়ে হলে তারা মোটাসোটা হবে। কিন্তু ওর এই মিষ্টি মিষ্টি কথা কতোটুকু সত্যি কে জানে। ওকে আমি ভালো করে চিনি না। ওকে আমার ভালো লাগে না তা নয়, কিন্তু সে ভালো লাগা, স্পষ্ট বুঝতে পারি, শারীরিক। ওর কাছে এলে লজ্জা পাই, রোমাঞ্চিত হই, কিন্তু প্রশান্তি অনুভব করি না। ভালো লাগার মিষ্টি, পবিত্র একটা ভাব জাগে না মনে। আসলে কি যে চাই, নিজেই আমি জানি না। কিন্তু কোহির সান্নিধ্যে এলে যেটা পেতে ইচ্ছে করে, শারীরিক ব্যাপারটা, শুধু এটা নিশ্চই চাই না। শান্তি দরকার আমার, প্রশান্তি দরকার। আরো কি সব যেন দরকার, কিন্তু সেগুলোর নাম জানা নেই। কিন্তু শুধু এই জিনিস চাই না। হঠাৎ সে কিছু না ভেবেই বলে ফেললো, 'আমি আবার একটা ভাই চাই না। আমি একা থাকতে চাই।'

'এ তোমার মনের কথা নয়, কামিনী। কিংবা তুমি ভুল করছো। তোমার মতো সুন্দরী আর অল্প-বয়েসী মেয়ে একা থাকতে পারে

না। আমি যখন তোমার হাত ধরি, তোমার হাত কাঁপতে থাকে, ওই কাঁপন থেকে তোমার মনের ভাষা বুঝতে পারি আমি।' আবার কোহি কামিনীর একটা হাত ধরলো।

নিজের ওপর অনেক জোর খাটিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো কামিনী। বললো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি না, কোহি। আসলে আমি হয়তো তোমাকে ঘেন্না করি।'

কোহি হাসলো। 'তাতেও আমি কিছু মনে করছি না, কামিনী। কারণ তোমার ঘেন্নাও ভালোবাসার খুব কাছাকাছি কিছু একটা হবে। ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে আবার আমরা কথা বলবো।' লম্বালম্বা পা ফেলে চলে গেল সে, তার স্বচ্ছন্দ হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে অঢেল প্রাণশক্তির আভাস ফুটে উঠলো, চোখ ফেরাতে পারলো না কামিনী।

ধীরে ধীরে লেকের দিকে এগোলো কামিনী, ওদিকে ছেলেমেয়েদের সাথে কেতীকে দেখা যাচ্ছে। এটা-সেটা নিয়ে কিছু কথা বললো কেতী, কিন্তু কামিনী অন্যমনস্ক। তারপর, হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসলো সে, 'আচ্ছা, কেতী, বলো তো, আমার কি আবার বিয়ে করা উচিত?'

'উচিতই তো,' বললো কেতী। 'তুমি সুন্দরী, বয়স কম, স্বাস্থ্যবতী—আরো অনেক মোটাসোটা ছেলেমেয়ে জন্ম দিতে পারবে।'

'কিন্তু একটা মেয়ের জীবন কি শুধু তাই, ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়া?'

'শুধু জন্ম দেয়া নয়, তাদের মানুষ করাও,' বললো কেতী। 'মিশরে মেয়েদের অনেক দাম, বাপের সম্পত্তিতে তাদেরও ভাগ থাকে। তোমার যদি অনেক ছেলেমেয়ে না থাকে, তোমার স্বামীর আর তোমার বাপের সম্পত্তি কাকে তুমি দিয়ে যাবে?'

চিন্তিতভাবে নিজের মেয়ে তানির দিকে তাকালো কামিনী, পুতুলের জন্যে ফুলের মালা তৈরি করছে সে। ছোট্ট এতোটুকুন একটা বাচ্চা, কিন্তু নিজের কাজে কি ভীষণ ব্যস্ত আর মনোযোগী। কামিনীর মনে হলো, তানির মধ্যে আমি আছি, তানির মধ্যে কাসিন আছে···। কিন্তু তানি হঠাৎ মুখ তুলে মাকে দেখতে পেয়ে খুশিতে খিলখিল করে হেসে উঠলে কামিনীর মনে হলো—না, ওর মধ্যে আমিও নেই, কাসিনও নেই, তানি সম্পূর্ণ আলাদা একটা অস্তিত্ব, সম্পূর্ণ একা। যেমন আমিও একা, যেমন কাসিনও একা ছিলো। দুনিয়ায় আসলে আমরা সবাই একা। আমাদের মধ্যে যদি ভালোবাসা থাকে, বড়জোর আমরা তাহলে বন্ধু হতে পারি। আর যদি ভালোবাসা না থাকে, চিরকাল আমরা পরস্পরের কাছে অচেনা থেকে যাবো।

নদীর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন উদাস হয়ে গেল কামিনী। বারবার মোহনের কথা উঁকি দিচ্ছে মনে। মোহনদার সান্নিধ্য তার মনে নিরাপত্তার ভাব এনে দেয়, অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে ছেয়ে যায় অন্তর।

তারপর কামিনীর মনে হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ আমরা চিরকাল বেঁচে থাকবো না। সূর্য অস্ত গেলে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে, আমি ঘুমিয়ে পড়বো—সকালে হয়তো আমার আর ঘুম ভাঙবে না। সবাই দেখবে আমি মরে গেছি।

'কি ব্যাপার, কামিনী?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো কেতী। 'বিড়বিড় করে কি বলছো?'

'না, ভাবছিলাম···ভাবছিলাম, আজ রাতে আমি যদি মারা যাই, কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।'

কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে কামিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলো কেতী।

কিন্তু পরদিন সকালে লেকের ধারে কামিনীকে নয়, পাওয়া গেল আলাকে। শরীরটা লেকের পাড়ে পড়ে আছে, মুখটা পানিতে ডোবা। কেউ তার মাথা আর ঘাড়ে হাত রেখে পানির ভেতর চেপে ধরেছিল মুখ।

চোদ্দ

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—দশ তারিখ

বিছানা নিয়েছে ইমহোটেপ। অথর্ব, রুগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। হতভম্ব চেহারা, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো হেনেট, কিছু মুখে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। 'এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন, মালিক। আপনি দুর্বল হয়ে পড়লে সব যে ছারখার হয়ে যাবে।'

'কি হবে শক্তি দিয়ে? আমার আলা তো দুর্বল ছিলো না। এখন তাকে লবণ-জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। আমার প্রিয় আলা, আমার বুকের মাণিক, আমার শেষ পুত্র ধন···।'

'না-না, মালিক—আপনার ইয়ামো এখনো বেঁচে আছে,' বললো

হেনেট। 'আপনার বড় ছেলে, বাধ্য ছেলে···।'

'কিন্তু আর ক'দিন? উঁহুঁ, তারও কোনো আশা নেই। আমরা সবাই, গোটা পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কে জানতো, একটা উপপত্নী আমার এই সর্বনাশ ডেকে আনবে। জানি না এ কার অভিশাপ। নফরেতের, নাকি আশায়েতের? নফরেতকে নিয়ে আসায় আমার বোন কি আমার ওপর রেগে গেছে?'

'দোহাই মালিক, অমন কথা মুখে আনবেন না। আশায়েতকে আপনি কখনো কষ্ট দেননি, সে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এই তো সবে তার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, নফরেতের আত্মাকে শায়েস্তা করতে তার আরো খানিক সময় লাগবে।'

'এতো আবেদন-নিবেদন, কই, কিছু লাভ হলো? আলা, আমার পুত্রধন···'

গম্ভীর হলো হেনেট। 'একটা কথা মনে রাখতে হবে, মালিক। আপনার আলা আশায়েতের ছেলে ছিলো না। আপনার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে আলার জন্যে আশায়েত কেন ব্যস্ত হবে? কিন্তু ইয়ামো আশায়েতের ছেলে, ওকে সে মরতে দেবে না।'

'আহ্, একটু যেন শান্তি পেলাম,' বিড়বিড় করে বললো ইমহোটেপ। 'শুধু তোমার কথা শুনে মনটা একটু ভালো লাগে। কিন্তু হায়, আমার পুত্রধন আলা নেই।' নিজের কপালে করাঘাত করলো সে। 'কি স্বাস্থ্য। কি শক্তি। হায়, হায়···'

'হায়, হায়,' ইমহোটেপের শোকে হেনেটও কাতর হলো।

'ওই নফরেত, সে একটা ডাইনি ছিলো।' হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলো ইমহোটেপ। 'রূপ দেখিয়ে প্রথমে আমাকে ভোলালো, তারপর এখন মরে গিয়ে···।'

মেঝেতে ছড়ি ঠোকার ঠক ঠক আওয়াজ। পরমুহূর্তে বৃদ্ধা এশার তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'এ-বাড়িতে কি একজনেরও কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই? অভাগিনী একটা মেয়েকে দায়ী করা ছাড়া আর কোনো কাজ পাসনি তোরা?'

মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসলো ইমহোটেপ। 'কাকে তুমি অভাগিনী বলছো, মা? যে আমার ছেলে-গুলোকে একের পর এক মেরে ফেলছে…?'

মেঝেতে সজোরে ছড়ি ঠুকলো এশা। 'মাথায় গোবর না থাকলে এই সব ভৌতিক ধারণা নিয়ে বসে থাকে কেউ?' রাগে কাঁপছে সে। 'মাথায় ঘিলু থাকলে বুঝতি, অশান্ত কোনো আত্মা নয়, জ্যান্ত কোনো মানুষের হাত পানির ভেতর চেপে ধরেছিলো আলার মুখ। ইয়ামো আর সোবেক যে মদ খেলো, আমরা যারা বেঁচে আছি তাদেরই কেউ একজন সেই মদে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল।'

'মা!' ইমহোটেপের চোখে আতংক আর অবিশ্বাস।

বিড়বিড় করছে হেনেট, 'বুড়ি মাগীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'তোর একটা শত্রু আছে, ইমহোটেপ,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো এশা। 'এই বাড়িরই মানুষ সে। প্রমাণ চাস? মোহন প্রস্তাবটা তোলার পর থেকে কামিনী নিজে ইয়ামোর খাবার তৈরি করছে, কিংবা চাকর তৈরি করছে কামিনীর চোখের সামনে। সেই খাবার নিজে হাতে করে নিয়ে এসে ইয়ামোকে খাওয়াচ্ছে কামিনী। সেই থেকে দিনে দিনে শক্তি ফিরে পাচ্ছে ইয়ামো, ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে দুর্বলতা। তারমানে শত্রু এখন আর তার খাবারে বিষ মেশাতে পারছে না।' হেনেটের দিকে কটমট করে তাকালো এশা। 'তোমার বোধহয় এই একটাই কাজ, আমার ছেলেকে অশান্ত আত্মার ভয় দেখানো? ফের

যদি শুনি…।'

হেনেটের চোখটা জ্বলজ্বল করছে। ঝাঁঝের সাথে বললো সে, 'তুমি তো শুধু আমার পিছনেই লেগে আছো!'

ইমহোটেপ তাড়াতাড়ি বললো, 'মা, হেনেটকে কিছু বলো না তো। ওই তো শুধু আমার দিকে একটু যা নজর রাখে।

'পর কখনো আপন হয় না, ইমহোটেপ,' বললো এশা। 'আর আপন কখনো পর হয় না। যাকে কেউ দেখতে পারে না, তুই তাকে মাথায় তুলে রেখেছিস, সেজন্যেই তো তোর আপনজনেরা তোকে এড়িয়ে চলে। বাড়ির কর্তাকে সময়ে কঠিন হতে হয়, আবার সময়ে নরমও হতে হয়। নফরেতকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর তুই এমন আচরণ শুরু করলি, কেউ যেন কিছু নয়, নফরেত আর হেনেটই তোর সব। আপনজনেরা তো তোকে এড়িয়ে চলবেই।'

'মা, আমার এই মানসিক অবস্থায় তুমি কি…'

'না, তোকে আমি গালমন্দ করতে অসিনি,' শান্ত হলো এশা। 'বলতে এসেছি, মাথা ঠাণ্ডা কর। চিন্তা কর। তোর বোন, আমার মেয়ে আশায়েত হয়তো অশান্ত আত্মাকে শায়েস্তা করতে পারবে, কিন্তু এই দুনিয়ার শয়তানদের ওপর তার কোনো প্রভাব নেই। একে একে অনেককেই তো হারালাম, এবার আমাদের কিছু একটা করা দরকার। তা-না হলে আরো লোকজন এ-বাড়িতে মারা যাবে।'

'আমাদের মধ্যে কেউ খুনী? এই বাড়ির কেউ? এ তুমি কি বলছো, মা।'

'আমি ঠিকই বলছি, ইমহোটেপ।'

'তারমানে আমরা সবাই বিপদের মধ্যে রয়েছি?'

'নিশ্চই। এবং সেই বিপদ নফরেতের তরফ থেকে আসছে না,

আসছে আমাদের কারো মধ্যে থেকে। রাত করে বাড়ি ফিরছিল আলা। পাশের গ্রামে মদ খেতে গিয়েছিল সে। কেউ তাকে লেকের পাড়ে টেনে নিয়ে যায়। তারপর পানিতে চেপে ধরে তার মুখ। নফরেতের আত্মা এই কাজ করতে পারে না…।'

'কিন্তু আলার সাথে পারা সহজ কাজ নয়…'

'বললাম না, মদ খেয়ে ফিরছিল সে। হয়তো বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ছিলো। মাতাল একজন যুবককে টেনে নিয়ে যেতে তেমন শক্তি লাগে না—একজন মেয়েমানুষও তা পারে।'

'কি বলতে চাইছো? আমার আলাকে এ-বাড়ির কোনো মেয়েলোক…?'

'হতে পারে, নাও হতে পারে—সে একজন পুরুষমানুষও হতে পারে। মোট কথা, খুনী আমাদের মধ্যেই কেউ।'

'চাকরবাকরদের কেউ?'

'না।'

'তাহলে কে? কোহি? মোহন?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো ইমহোটেপ। 'মোহন আমাদের পরিবারেরই একজন, ছোটোবেলা থেকে আমাদের সাথে আছে সে। তার কোনো উচ্চাশা নেই, থাকলে এতোদিন আমার চেয়েও বড় জমিদার হতে পারতো। আর কোহি—সে একজন আগন্তুক, সত্যি বটে, কিন্তু দূরের হলেও সে আমাদের আত্মীয়। ব্যবসায়িক ব্যাপারে বহুবার সততার পরিচয় দিয়েছে সে। তাছাড়া, আজ সকালেই আমার সাথে দেখা করে কামিনীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে।'

'আচ্ছা, তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে উঠলো এশার। 'তা, তুই কি বললি তাকে?'

"হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি,' জবাব দিলো ইমহোটেপ। 'কারণ, কামিনীকে নিয়ে অন্য কথা ভাবছি আমি। হিমানী মারা যাবার পর ইয়ামো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। ভাবছি···অবশ্য, আমার ভাবনা-চিন্তায় তেমন কিছু এসে যায় না। আমি চাই আমার লক্ষ্মী মেয়েটা সুখী হোক। সে যাকে বেছে নেবে আমি তার সাথেই ওর বিয়ে দেবো।'

'ইয়ামোর সাথে কামিনী সংসার করবে···এই চিন্তা তোর মাথায় ঢোকালো কে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো এশা।

অপ্রতিভ দেখালো ইমহোটেপকে। 'না···মানে···।'

"কি হলো, চুপ করে গেলি যে?' জানতে চাইলো এশা। 'গোটা পরিবার যেখানে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, বিয়ের কথা তখন ওঠে কি করে? কে তোলে?'

খানিক ইতস্তত করে ইমহোটেপ বললো, 'কেউ তোলেনি, আমি নিজেই ভাবছিলাম···।' তার চেহারা দেখে মনে হলো আসল কথাটা চেপে গেল সে।

'একদিকে লাশ নিয়ে ব্যস্ততা, আরেক দিকে বিয়ে নিয়ে ব্যস্ততা, বাহ-বা!' বিদ্রুপ করলো এশা। 'এই না হলে বুদ্ধি।'

'বিয়ে এখুনি হতে হবে তা আমি বলছি না,' ইমহোটেপ মিনমিন করে বললো। 'খরচের ব্যাপারে আমি চিন্তায় আছি।' হঠাৎ তার চেহারায় রাগ ফুটে উঠলো। 'এমবামরা একেবারে পেয়ে বসেছে। প্রতিটি লাশের জন্যে আগের চেয়ে দ্বিগুণ খরচ ধরছে ওরা। ঘরে লাশ রেখে দর কষাকষিও করা যায় না।'

'খরচ যা হবার তাতো হবেই,' বললো এশা। 'তা নিয়ে মাথা গরম করার সময় এটা নয়।'

'এখন তাহলে কি করা দরকার আমাদের ?' নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইলো ইমহোটেপ।

'কাউকে বিশ্বাস করবি না,' বললো এশা। 'এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা।' হেনেটের দিকে একবার তাকালো সে। 'কাউকে না।'

হঠাৎ ফোঁপাতে শুরু করলো হেনেট। 'বারবার তুমি শুধু আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন ?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো সে। 'এ-বাড়িতে কেউ যদি বিশ্বাসী থাকে তো সে আমি। আর কেউ না জানুক, আমার মনিব ঠিকই জানেন…।'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' তাড়াতাড়ি বললো ইমহোটেপ। 'তোমাকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি, হেনেট…।'

'তোর নিজের কথা বল, অন্য সবার মনের কথা তুই জানবি কিভাবে!' প্রতিবাদ করলো এশা। 'আমি আবার বলছি, কাউকেই বিশ্বাস করা চলবে না।'

'তুমি আমাকে সন্দেহ করছো!' ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো হেনেট।

'মা!'

'সন্দেহ আমি করেছিলাম…তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। প্রথমে আমি সন্দেহ করি আলাকে। কিন্তু আলা মারা গেছে, কাজেই আমার সন্দেহ মিথ্যে ছিলো। তারপর আরেকজনকে আমি সন্দেহ করলাম, কিন্তু আলা যেদিন মারা গেল সেদিন আরেকজনকে সন্দেহ হলো আমার…।' একটু থেমে হঠাৎ এশা জানতে চাইলো, 'কোহি আর মোহন কি বাড়িতে আছে ? ওদেরকে এখানে ডেকে আনা। আর হ্যাঁ, রান্নাঘর থেকে কামিনীও যেন চলে আসে। ইয়ামো আর কেতীকেও দরকার। আমি কিছু বলবো। বাড়ির সবার তা শোনা

দরকার।'

কর্তার ঘরে বাড়ির সবাই জড়ো হলো।

একটা গদীমোড়া চেয়ারে বসে আছে বৃদ্ধা এশা, ছড়ির ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে। বাকি সবাই তার সামনে বসে আছে, এমন কি হেনেটও। একে একে সবার দিকে তাকালো এশা।

শান্তশিষ্ট ইয়ামোর চেহারায় কোনো আবেগ নেই।

প্রাণচঞ্চল কোহির সারা মুখে হাসি।

কামিনীকে সন্ত্রস্ত দেখালো, তার চোখে জিজ্ঞাসা।

কেতীর সাদামাটা চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, কৌতূহলের ছিঁটে-ফোঁটাও নেই।

মোহন গম্ভীর, চিন্তিত দেখালো তাকে।

ইমহোটেপকে উদভ্রান্ত দেখালো, মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট-পিট করছে।

শুধু কুঁজো বুড়ি হেনেটের চেহারায় ফুটে আছে উল্লাস আর বিদ্রূপের ভাব। ইমহোটেপের সাথে বিছানায় বসে আছে সে, মনিবকে ডিম-দুধ খাওয়ানো এখনো শেষ করতে পারেনি।

এশা ভাবলো, ওদের চেহারা দেখে বোঝার কিছু উপায় নেই। অথচ এতে কোনো সন্দেহ নেই এদের মধ্যেই কেউ একজন অপরাধী। অনেকগুলো খুন করেছে সে, আরো অনেকগুলো করতে চায়। অপরাধী তার চেহারায় কৃত্রিম ভাব ফুটিয়ে রেখে সবার চোখকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি এশা যদি ভুল করে না থাকি, চেহারা থেকে অপরাধবোধ যতোই লুকাবার চেষ্টা করুক খুনী, এক সময় না এক সময় সেটা আমার চোখে ঠিকই ধরা পড়বে। চুপ করে বসে

থাকলে কাজ হবে না, আমাকে কথা বলতে হবে। কথা বলবো, আর ওদের চেহারা লক্ষ্য করবো। আমি সঠিক পথে চিন্তা-ভাবনা করছি বুঝতে পারলেই প্রতিক্রিয়া হবে খুনীর। সেই প্রতিক্রিয়া যেন আমার চোখ এড়িয়ে না যায়।

'তোমাদের সবাইকে আমার কিছু বলার আছে,' শুরু করলো এশা। 'তবে সবার আগে আমি শুধু কথা বলতে চাই হেনেটের সাথে। ওর সাথে একা নয়, তোমাদের সবার সামনে।'

হেনেটের চেহারা বদলে গেল। আতংকিত দেখালো তাকে। খনখনে সুরে তীব্র প্রতিবাদ জানালো সে, 'আমাকে তুমি সন্দেহ করো, এশা? হায় হায়, আমার কি অতো বুদ্ধি আছে যে তোমার সাথে তর্কে জিতবো! সামান্য একটা বাদী, আমার কথা কেউ শুনতেও চাইবে না। মিথ্যে অভিযোগে তোমরা আমাকে শাস্তি দেবে···।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে এশা বললো, 'কে বললো তোমার কথা শোনা হবে না? তোমার এই অতি নাটুকে ভাব আমার একদম পছন্দ নয়।' দেখলো, ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো মোহনের ঠোঁটে।

'আমি নিরীহ বুড়ি···,' ইমহোটেপের পা জড়িয়ে ধরলো হেনেট, '···মালিক, আপনি আমাকে রক্ষা করুন!'

হেনেটের মাথায় হাত রেখে তাকে অভয় দিলো ইমহোটেপ। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা, এ তোমার অন্যায়। হেনেটকে তুমি এভাবে অপমান করতে পারো না···।'

ধমক দিয়ে ছেলেকেও থামিয়ে দিলো এশা, 'বাজে বকবি না। এখনো কারো বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ তুলিনি। প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ আমি তুলবোও না। হেনেট যে-সব কথা বলেছে আমি শুধু সেগুলোর ব্যাখ্যা চাইবো।'

'কি বলেছি ? কাউকে আমি কিচ্ছু বলিনি।' অস্বীকার করলো হেনেট।

'বলোনি মানে, নিশ্চই বলেছো। তোমার কিছু কিছু কথা নিজের কানে শুনেছি আমি। চোখে হয়তো কম দেখি, কিন্তু কানে আমি অনেকের চেয়ে বেশি শুনি এখনো। বলেছো, মোহন সম্পর্কে তুমি নাকি অনেক কিছু জানো। তোমার এই কথাটার ব্যাখ্যা চাই আমি। কি জানো তুমি মোহন সম্পর্কে ?'

মোহনকে সামান্য একটু অবাক দেখালো। 'বলো, হেনেট, কি জানো তুমি আমার সম্পর্কে ? বলো, সবাই আমরা শুনি।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখটার পানি মুছলো হেনেট। তাকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখালো। 'কারো সম্পর্কেই আমি কিছু জানি না,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'ওটা একটা কথার কথা ছিলো। আমি আসলে কিছু বোঝাতে চাইনি।'

এশা বললো, 'তুমি ঠিক এই কথাগুলো বলেছিলে আমাকে—"বুঝি, বুঝি! নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করে মোহন। কিন্তু বেশি চালাক মনে করলে তার পরিণতি কি হয়, দেখেনি সে? হিমানীও নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করতো, এখন সে কোথায় ?" তার আগে তুমি বলেছো, —"যেখানেই দেখা হোক, যখনই দেখা হোক, মোহন এমন ভাব করে, আমার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই—যেন আমাকে নয়, আমার পিছনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে সে"।'

হেনেট বিড়বিড় করে বললো, 'ও সব সময় ওভাবে তাকায়—আমি যেন একটা কেঁচো। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছু নয়ও।'

'তোমার ওই কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি না—যেন আমাকে

নয়, আমার পিছনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে মোহন। বুঝি, বুঝি! নিজেকে চালাক মনে করে···চালাক তো হিমানীও নিজেকে মনে করতো, এখন সে কোথায়? আমরা জানি, হিমানী মারা গেছে।'

সবার দিকে একে একে তাকালো এশা। 'ওর এই কথার অর্থ তোমরা কেউই কি বুঝতে পারছো না? হিমানীর কথা ভাবো—বেচারি মারা গেছে···এবং মনে রেখো, কেউ যখন তাকায় তখন কারো দিকে তাকায়, এমন কিছুর দিকে তাকায় না যার কোনো অস্তিত্ব নেই···।'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই চিৎকার করে উঠলো হেনেট। 'মনিব! মনিব আমাকে বাঁচান! আমি খুন করিনি···'

ইমহোটেপ বিস্ফোরিত হলো। 'এ সহ্যের বাইরে!' গর্জে উঠলো সে। 'হেনেটকে এভাবে কেউ ভয় দেখাতে পারে না। কোনো প্রমাণ নেই, কিছু না, শুধু শুধু বেচারিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়ার মানে কি? ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আছে?'

স্বভাবসুলভ দ্বিধা আর সংশয় কাটিয়ে উঠে ইয়ামো বললো, 'বাবা ঠিক বলছে। দাদী-মা, তোমার যদি নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ বা অভিযোগ থাকে, বলো।'

এশা মৃদু গলায় বললো, 'আমি তো হেনেটের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলিনি।' ছড়ির ওপর ভর দিয়ে আরো একটু সামনে ঝুঁকলো সে।

চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে ইয়ামো হেনেটের দিকে ফিরলো। 'এ বাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, দাদী-মা সে-সবের জন্যে তোমাকে দায়ী করছে না, হেনেট। আমি যতোটুকু বুঝতে পারছি, দাদী-মা বলতে চায়, তুমি কিছু তথ্য জানো, বা জ্ঞান রাখো, যা লুকিয়ে

রাখছো। কাজেই, হেনেট, সত্যি তুমি যদি কিছু জানো, মোহন বা আর কারো সম্পর্কে, এখুনি সেটা বলার সময়। এখানে, আমাদের সবার সামনে। মুখ খোলো। কি জানো তুমি ?'

মাথা নাড়লো হেনেট। 'জানি না, আমি কিছুই জানি না।'

'চিন্তা করে কথা বলো, হেনেট। গোপন কথা ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'জানি না, জানি না, জানি না।' থরথর করে কাঁপছে হেনেট। 'এনেডের কিরে, দেবী মাতের কিরে, রা-র কিরে—ভালো মন্দ কিছুই আমি জানি না।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো এশা। সামনের দিকে আরো খানিক ঝুঁকলো সে। অস্ফুটে বললো, 'আমাকে আমার ঘরে দিয়ে এসো।'

কামিনী আর মোহন আসন ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে এলো। এশা বললো, 'তুমি-না, কামিনী। মোহন আমাকে নিয়ে যাবে।' মোহনের ওপর শরীরের খানিকটা ভার চাপিয়ে ছেলের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো এশা। মোহনের দিকে একবার তাকালো সে। দেখলো, মোহনের চেহারা থমথম করছে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো এশা। জানতে চাইলো, 'কি বুঝলে, মোহন ?'

'তুমি বোকামি করলে, দাদী-মা,' গম্ভীর গলায় বললো মোহন। 'বড় বেশি বোকামি করে ফেললে।'

'আমার জানার দরকার ছিলো।'

'হ্যাঁ—কিন্তু ভয়ংকর একটা ঝুঁকি নিয়েছো তুমি।'

'আচ্ছা। তারমানে আমি যা ভাবছি তুমিও তাই ভাবছো।'

'এই চিন্তা বেশ আগে থেকেই রয়েছে আমার মাথায়,' বললো মোহন, 'কিন্তু আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। এমন কি, দাদী-মা, তোমার হাতেও এখনো কোনো প্রমাণ নেই। গোটা ব্যাপারটা তুমি শুধু আঁচ করতে পেরেছো।'

'আমি জেনেছি, এটুকুই যথেষ্ট।'

'হয়তো খুব বেশি জেনে ফেলেছো, দাদী-মা।'

'কি বলতে চাও? ও; হ্যাঁ, তা বটে।'

'সাবধানে থেকো, দাদী-মা। এখন থেকে তুমি বিপদের মধ্যে থাকছো।'

'আমাদের কিছু একটা করা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি।'

'ঠিক, কিন্তু করার কি আছে আমাদের? হাতে প্রমাণ থাকা চাই।'

'জানি।'

ওরা আর আলাপ করতে পারলো না। এশার কিশোরী দাসী ছুটে এলো কর্ত্রীর কাছে। মেয়েটার হাতে বৃদ্ধাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মোহন। তার চেহারায় গাম্ভীর্য, এবং অপার বিস্ময়।

কিশোরী দাসী বক বক করছে, কিন্তু তার কথায় কান নেই এশার। বৃদ্ধার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, দুর্বল লাগছে শরীর। চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছে সে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সবগুলো চেহারা, তার সামনে বসে আছে সবাই। একে একে সবগুলো চেহারা স্মরণ করলো এশা।

শুধু একজনের চেহারায় মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠেছিল ভয়—ভয় আর উপলব্ধির ভাব। সে কি ভুল করেছে? যা দেখেছে, তা কি চোখের ভুল? চোখে সে ভালো দেখে না…।

না, ভুল হতে পারে না। শুধু যে চেহারায় পলকের জন্যে ভয় ফুটে উঠেছিল, তা নয়। সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাও সেই ওই এক পলকের জন্যে। শুধু একজনের কাছে তার কথাগুলোর অর্থ ধরা পড়েছে। সে যা বলতে চেয়েছে, শুধু একজনই তা বুঝতে পেরেছে।

তারমানে তার অনুমান আর সন্দেহ সত্যি। ওই একজনের প্রতিক্রিয়াই তা বলে দিচ্ছে।

চোখ মেললো বৃদ্ধা। সাদা দেয়ালের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে।

অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য॥

পনেরো

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—পনেরো তারিখ

মেয়েকে পাশে নিয়ে বিছানায় বসে আছে ইমহোটেপ। কামিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে। 'সবই তো ব্যাখ্যা করলাম, মা। তুই নিশ্চই বুঝতে পারছিস, তোর বিয়ের ব্যাপারে কেন আমি এতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছি? এবার বল, তিনজনের মধ্যে কাকে তোর পছন্দ?'

মাথা নিচু করে বসে আছে কামিনী, তার কপালে আর ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'আমি···আমি জানি না, বাবা।'

'পরিস্থিতি অন্যরকম হলে আরো সময় নেয়া যেতো,' বললো ইমহোটেপ। 'দূরের শহরগুলোয় আরো অনেক ভালো পাত্র আছে, দেখেশুনে তাদের একজনের সাথে তোর বিয়ে দিতাম। কিন্তু তা হবার নয়। আমার শরীরে কিছু নেই আর, যে-কোনো দিন খুনও হয়ে যেতে পারি। খুন হয়ে যেতে পারে ইয়ামোও। তোরও ভয় আছে। কাজেই এই ব্যবসা আর জমিদারী দেখার জন্যে একজন পুরুষ মানুষ দরকার বাড়িতে। আমি আর ইয়ামো মারা গেলে সব কিছুর মালিক হবি তুই, কিন্তু একা মেয়েছেলে এতো বড় জমিদারী আর ব্যবসা সামলানো সম্ভব নয়। আমার ইচ্ছে ছিলো, হিমানী যখন মারা গেল, ইয়ামোর সাথে বিয়ে হোক তোর। ইয়ামোরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোর একটা মতামত আছে। কোহিকে তোর পছন্দ, নাকি মোহনকে?'

কামিনী কথা বলতে পারলো না।

'মোহন অত্যন্ত যোগ্য স্বামী হবে, কোনো সন্দেহ নেই,' বললো ইমহোটেপ। 'ওর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। শুধু তোর সাথে বয়সের পার্থক্য একটু বেশি হয়ে যায়। যদিও, একজন যুবকের চেয়ে গায়ে বেশি শক্তি রাখে মোহন। ওকে বিয়ে করলে যে কোনো মেয়ে সুখী হবে। যদিও, ওর মনোভাব আমার জানা নেই। তবে আমি প্রস্তাব করলে খুশি মনে রাজি হবে সে। তারপর আছে, কোহি। সুদর্শন, সুপুরুষ, হাসিখুশি যুবক। তোকে ভালোও বাসে। মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলেছেও। দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। ওকে বিয়ে করলেও ভালো করবি। নাকি, ভাইয়ের সাথেই সংসার পাতার

ইচ্ছে ?'

'আ-আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, বাবা,' অস্ফুটে বললো কামিনী। 'কি ভাববো, কি বলবো—কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছে, এই অবস্থায়…।'

'বুঝি, মা, সবই বুঝি,' ধরা গলায় বললো ইমহোটেপ, তার চোখ ছলছল করছে। 'এই পরিস্থিতিতে বিয়ের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু আমি জমিদার মানুষ, জমিদারী রক্ষার কথাও আমাকে ভাবতে হবে। ইয়ামোর কিছু হয়ে গেলে, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুই শুধু বেঁচে থাকবি…।'

'তাহলে তুমি বড়দার সাথে সংসার করতে বলছো কেন ?'

প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল ইমহোটেপ। 'না…মানে, তোর যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে বিপদের ভয় থাক বা না থাক, ওকেই তুই বিয়ে কর, এই আমি চাই।'

কামিনীর মনে পড়লো, এক সময় সে দুষ্টামির ছলে ভাবতো, স্বামী হিসেবে ভাইদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেয়ার প্রশ্ন উঠলে বড়দা ইয়ামোকেই বেছে নিতো সে। বড়দা শান্ত, নিরীহ। কারো সাতে-পাঁচে থাকে না, স্বার্থপর নয়। কিন্তু ভাবনাটা নেহাতই নিজের সাথে একটা ঠাট্টা বা খেলা ছিলো। তারপর কোহি এলো। কোহির কাছাকাছি গেলেই তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কোহিকে তার ভালো লাগে। কিন্তু মোহনের সান্নিধ্য তাকে প্রশান্ত আর নিরাপত্তার ভাব এনে দেয়।

কাকে বেছে নেবে সে ? স্বামী হিসেবে কাকে তার বেশি পছন্দ ?

বড়দার জন্যে তার মায়া হয়। হিমানী মারা যাওয়ায় বেচারি একা হয়ে গেছে। হিমানী বেঁচে থাকতেও শান্তি পায়নি সে। স্ত্রী হিসেবে

হিমানী মোটেও ভালো ছিলো না। বড়দার আসলে দরকার শান্ত-শিষ্ট, লক্ষ্মী একটা বউ। আমি কি তার সেই বউ হতে পারি না?

না।

কারণ, কোহি আমাকে ভালোবাসে। কোহি আমাকে পেতে চায়। নিজের মন বুঝি না, কিন্তু শরীর বুঝি। কোহির কাছে গেলে আমার রক্ত নেচে ওঠে।

কিন্তু শরীরের চাহিদা শেষ কথা নয়। মনের মতো একজন পুরুষ চাই, যার সাথে সংসার করে শান্তি পাবো, যে আমাকে নিরাপত্তা দেবে।

মোহন।

কিন্তু মোহন তো কখনো ভালোবাসার কথা বলে না। ওর সাথে কতোদিন একা থেকেছি, ওর চোখে তো প্রেম দেখিনি। বাবাকে যদি মোহনের কথা বলি, আর মোহন যদি আমার ইচ্ছের কোনো মূল্য না দেয়? মোহন আমাকে বিয়ে করতে না চাইলে কোনোদিন আর ওর সামনে দাঁড়াতে পারবো না।

তারচেয়ে সে আমার বন্ধু আছে বন্ধুই থাক। ওর বন্ধুত্ব আমি হারাতে চাই না

'চুপ করে থাকিস না, মা,' ইমহোটেপ মেয়ের একটা হাত ধরলো। 'যে-কোনো একজনকে তোর বেছে নিতেই হবে।'

ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো কামিনী, 'কো-কোহি।'

কামিনী আর তানিকে নিয়ে নৌকো করে নীলনদে বেড়াতে বেরিয়েছে কোহি। কামিনীর চোখে চোখ রেখে সারাক্ষণ হাসছে সে, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা। মাঝে মধ্যে গান ধরছে, আবার

কখনো তানির কথা শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠছে। বিয়েতে কামিনী রাজি হয়েছে শুনে এই নৌবিহারের প্রস্তাব দেয় সে। খানিক ইতস্তত করে সায় দেয় কামিনীও।

এই লোক আমাকে সুখী করবে, মনে মনে ভাবছে কামিনী। শুধু আমাকে নয়, আমার তানিকেও ভালোবাসবে ও। আরো ছেলেমেয়ে হবে আমাদের, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার করবো।

বেড়ানো শেষ করে ফিরছে ওরা। নদীর পাড়ে তরী ভিড়লো। তানিকে কোলে নিয়ে তীরে পা রাখলো কোহি, তানি তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তানিকে কোল থেকে মাটিতে নামালো কোহি, তার গলার মাদুলিটা ছিঁড়ে চলে এলো তানির ছোট্ট হাতে।

'কি ওটা?' আঁতকে উঠে জানতে চাইলো কামিনী। তানির হাত থেকে মাদুলিটা নিয়ে দেখলো সে। তার চেহারা মুহূর্তের মধ্যে রক্ত-শূন্য হয়ে গেল। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো সে, 'নফরেত!'

'নফরেত মানে, কামিনী?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো কোহি।

'নফরেতের মাদুলি এটা,' দ্রুত বললো কামিনী, তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট অভিযোগ। 'তার অলংকারের বাক্সে এই মাদুলির অর্ধেকটা ছিলো। তুমি আর নফরেত···এখন আমি সব বুঝতে পারছি! তুমি···তুমিই বাক্সটা আবার ঘরে রেখে এসেছিলে। এখন আমি সব জানি। আমাকে মিথ্যে বলো না, কোহি। আমি জানি।'

কোহি প্রতিবাদ করলো না। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ কামিনীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর সে বললো, 'তোমাকে আমি মিথ্যে বলবো না, কামিনী।' খানিক চিন্তা করলো সে, তার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'একদিক থেকে তুমি জেনেছো ভালোই হয়েছে।'

'তুমি···এই মাদুলির অর্ধেকটা নফরেতকে দিয়েছিলে। তুমি···ওকে তুমি ভালোবাসতে।' চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো কামিনীর। 'তুমি একটা চরিত্রহীন লোক।'

'তুমি ভুল বুঝছো, কামিনী,' আবেদনের সুরে বললো কোহি। 'আগে আমার কথা শোনো, তারপর যা খুশি বলো। বিশ্বাস করো, নফরেতকে আমি ভালোবাসতাম না। এই মাদুলির অর্ধেক আমি তাকে দিইনি, সেই আমাকে দিয়েছিল। আর বাক্সটাও তোমার ঘরে আমি রেখে আসিনি।'

'তুমি বলতে চাইছো, তুমি তাকে ভালোবাসতে না, কিন্তু সে তোমাকে ভালোবাসতো?'

অসহায় দেখালো কোহিকে। 'কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে, আমার কি করার থাকে, তুমিই বলো? কিন্তু আমি তাকে ভালো-বাসিনি, কামিনী। জীবনে কাউকে যদি ভালোবেসে থাকি সে তোমাকে।'

মুখ ফিরিয়ে নিলো কামিনী। তানির একটা হাত ধরলো। 'আয়, তানি।' বাড়ির দিকে পা বাড়ালো সে।

'কামিনী!'

কামিনী দাঁড়ালো না।

'কামিনী শোনো!' কাতর কণ্ঠে ডাকলো কোহি।

'এখন তোমার সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগবে না, কোহি,' হাঁটতে হাঁটতে বললো কামিনী। 'মন যদি ভালো হয়, তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু কামিনী, তোমাকে বুঝতে হবে আমার কোনো দোষ ছিলো না···।'

উত্তরে কিছু না বলে বাড়ির ভেতর ঢুকলো কামিনী, চোখ ভরা পানি নিয়ে।

একজন দাসীকে দিয়ে হেনেটকে ডেকে পাঠিয়েছে কামিনী।

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো কুঁজো বুড়ি, কামিনীর হাতে অলংকারের বাক্সটা দেখে থতমত খেয়ে গেছে সে।

'এটা তুমি আমার ঘরে রেখে গিয়েছিলে, তাই না?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইলো কামিনী। 'তুমি চেয়েছিলে মাদুলির অর্ধেকটা আমি যেন দেখি। চেয়েছিলে একদিন জানতে পারবো বাকি অর্ধেক কোহির কাছে আছে, তাই না?'

'আচ্ছা, তাহলে জেনে ফেলেছিস? জানাই তো ভালো, কামিনী। বিয়ে হয়ে যাবার পর জানলে অশান্তির আগুনে পুড়তি। তারচেয়ে আগে জানাটা ভালো হলো না?' বেসুরো গলায় হেসে উঠলো কুঁজো বুড়ি।

'তুমি আমাকে আঘাত দিতে চেয়েছিলে,' বললো কামিনী। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে। 'মানুষের মনে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাও তুমি, তাই না? সোজা কথা সোজা করে কখনো তুমি বলো না। অপেক্ষা করো, ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করো। তুমি আসলে আমাদের সবাইকে ঘেন্না করো, তাই না, হেনেট?'

'ছুঁড়ির মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' কদর্য হাসি ফুটলো হেনেটের চেহারায়। 'অমন তাজা পুরুষ মানুষটা নফরেতকে ভালোবাসতো জেনে হিংসায় জ্বলছে।'

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখলো কামিনী। বললো, 'কিন্তু তোমার আশা পূরণ হয়নি, হেনেট। কোহির কথা আমি বিশ্বাস

করেছি। নফরেতকে সে ভালোবাসতো না। মাহুলির অর্ধেকটা নফরেতই তাকে দেয়, কোহি নফরেতকে দেয়নি।'

হেনেটের মুখে হাসি থাকলো না, চোখটায় রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠলো। 'কোহি বললো আর তুই বিশ্বাস করলি? নফরেতের সাথে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো জেনেও ওকে তুই বিয়ে করবি?'

'আসলেই তুমি আমাদের সবাইকে ঘেন্না করো,' ঠাণ্ডা সুরে বললো কামিনী। 'কিন্তু কেন, হেনেট? কার ওপর তোমার এতো রাগ? কেন তুমি আমাদের ভালো চাও না?'

'ফের যদি এসব বাজে কথা বলবি, আমি তোর বাপের কাছে অভিযোগ করবো,' চোখ রাঙালো হেনেট।

অলংকারের বাক্সের দিকে তাকালো কামিনী। 'এই বাক্সে তুমিই সিংহের লকেট বসানো হারটা রেখেছিলে, তাই না, হেনেট? মিথ্যে কথা বলে পার পাবে না, আমি জানি।'

হঠাৎ ভয়ে কুঁকড়ে গেল হেনেট। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলালো সে। ফিসফিস করে বললো, 'আমার কোনো উপায় ছিলো না, কামিনী। ভয়ে...।'

'ভয়? কিসের ভয়?'

কামিনীর আরো কাছে সরে এলো হেনেট। 'ওটা আমাকে নফরেত দিয়েছিল। মারা যাবার ক'দিন আগে। সোনার লকেট সহ হারটা। কিন্তু রাখাল ছোঁড়া যখন বললো ওই হার পরা একজন মেয়েলোককে দেখেছে সে, দেখেছে মদের কলসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ··আমি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম, হারটা আমার কাছে আছে দেখলে সবাই ভাববে মদে বিষ মিশিয়ে আমিই ইয়ামো আর সোবেককে খুন করার চেষ্টা করেছি। তাই বাক্সের ভেতর ওটা

আমি ভরে রাখি···।'

'সত্যি বলছো, হেনেট? সত্যি কথা জীবনে কখনো বলেছো?'

'কসম খেয়ে বলছি, সব সত্যি! আমি ভয় পেয়েছিলাম···'

কামিনীর চেহারায় কৌতুহল। 'তুমি কাঁপছো, হেনেট। মনে হচ্ছে এখনও তুমি ভয়ে অস্থির হয়ে আছো।'

'হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে আছি···তার কারণও আছে···।'

'কেন? কিসের ভয়? বলো আমাকে।'

কালচে ঠোঁটে হলদেটে জিভের ডগা বুলালো হেনেট। 'কি বলবো? আমার কিছু বলার নেই।'

'তুমি অনেক বেশি জানো, হেনেট। সেটাই না তোমার কাল হয়। কার কোথায় দুর্বলতা, কে কি ভাবছে, কে কি করছে, এসব জেনেছো আর উপভোগ করেছো, মজা পেয়েছো—কিন্তু এখন ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো হেনেট। পরমুহূর্তে আবার কদর্য হাসি ফুটলো তার মুখে। চোখে আক্রোশ নিয়ে বললো, 'অপেক্ষা কর, কামিনী। একদিন সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবো আমি। আমি, যাকে তোরা কানী বুড়ি আর কুটনি বুড়ি বলে গাল দিস। দাঁড়া, লো, দাঁড়া, কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখতে পাবি···।'

'আমার কোনো ক্ষতি তুমি করতে পারবে না, হেনেট,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো কামিনী। 'আমার মা আমাকে রক্ষা করবে।'

হেনেটের চেহারায় ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'তোর মা—মাগীকে আমি দু চোখে দেখতে পারতাম না। তাকে আমি সব সময় ঘেন্না করতাম। তুই তোর ঠিক মায়ের মতো সুন্দরী, সেই একই রূপ, একই গলা,

একই জেদ—তোকেও আমি ঘেন্না করি, কামিনী।'

হেসে উঠলো কামিনী। 'দেখলে তো, কথাটা তোমাকে শেষ পর্যন্ত বলিয়ে ছাড়লাম।'

ষোলো

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—পনেরো তারিখ

ছড়ির ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ঢুকলো এশা, দু'পা হেঁটে এসে ভীষণ হাঁপিয়ে গেছে। উপলব্ধি করলো, অবশেষে বয়স তার টোল আদায় করছে। এতোদিন শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা ছিলো, মনের দুর্বলতা কাকে বলে জানতো না। কিন্তু এখন টের পাচ্ছে মনটাকে সারাক্ষণ সর্তক রাখার মাশুল দিতে হচ্ছে শরীরকেও। তার বিশ্বাস, বিপদ কার তরফ থেকে আসবে এখন সে তা জানে, কিন্তু তাতেও স্বস্তি আসেনি। স্বইচ্ছায় শত্রুর দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে, তাই আগের চেয়ে শতগুণ সর্তক থাকতে হচ্ছে তাকে। প্রমাণ—প্রমাণ—যেভাবে হোক প্রমাণ তাকে জোগাড় করতেই হবে···কিন্তু কিভাবে?

প্রমাণ আছে, থাকতেই হবে, তার এই এতো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পারে সে। কিন্তু দুর্বল শরীর-মন নিয়ে সেই প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন। একটানা বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারে না সে, মাথা ঘোরে ; এখানে সেখানে ঢুঁ মারতে পারে না, পা টলে। কাজেই শুধু একটা কাজই তার পক্ষে সম্ভব, প্রতিরোধ গড়ে তোলা —সর্তক থাকা, নিজেকে পাহারা দেয়া। সে জানে, খুনী তাকে একটা হুমকি বলে মনে করছে। তৈরি হয়ে আছে সে, সুযোগ খুঁজছে, মওকা পেলেই আবার সে খুন করবে।

তার পরবর্তী লক্ষ্য আমি, ভাবলো এশা। আপন মনে ক্ষীণ একটু হাসলো বৃদ্ধা—কিন্তু তার হাতে আমি মরতে চাই না। তার ধারণা, তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করা হবে। সে কখনো একা থাকে না, চাকর-চাকরাণীরা কেউ না কেউ সাথে থাকেই, তারমানে শারীরিক আঘাতের ভয় নেই। বিষই হতে হবে।

তার জন্যে রান্না করছে কামিনী, নিজের হাতে করে দিয়ে যাচ্ছে ঘরে। নিজের ঘরে মদের একটা কলস আনিয়েছে এশা, একজন চাকরাণীকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করছে খারাপ কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখার জন্যে। নিজের খাবার-দাবার আর মদ কামিনীকে দিয়ে পরীক্ষা করায় সে—যদিও কামিনীকে তার ভয় নেই—তবু। হতে পারে খুনী হয়তো কামিনীকে মারতে চাইছে না।

তবে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে আকাশ পাতাল অনেক কথা ভাবছে এশা। কিশোরী চাকরাণীটা লিনেনের পোশাকগুলো ভাঁজ করে রাখছে। বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের সাথে কথা বলার পর মাকে

ডেকে পাঠিয়েছিল ইমহোটেপ। ছেলের মুখে সব শোনার পর বিয়ের পক্ষেই মত দিয়েছে এশা। সবদিক চিন্তা করে কামিনীর পছন্দ অনুমোদন করেছে সে। কোহিই কামিনীর উপযুক্ত স্বামী হতে পারবে।

তবে মোহনের জন্যে দুঃখবোধ করেছে এশা। মোহনের নিজের কোনো সয়-সম্পত্তি এই মুহূর্তে না থাকলেও, ছোটোখাটো এক জমিদারের ছেলে সে। দক্ষ লেখক, নিজের রোজগারও মন্দ নয়। বিয়ে করে বউকে সে সুখেই রাখতে পারবে। কিন্তু কামিনীর প্রতি তার দুর্বলতা আছে এটুকু বোঝা গেলেও, আভাসে ইঙ্গিতে সেটা কখনো প্রকাশ করেনি সে। কাজেই কোহিকে বাদ দিয়ে মোহনকে কামিনীর স্বামী হিসেবে কল্পনা করার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। প্রস্তাব দিলে মোহন হয়তো আকাশ থেকে পড়বে, বলবে, 'তা হয় না। আমি চিরকুমার থাকতে চাই।'

তারচেয়ে এই ভালো, কোহির সাথেই সংসার করুক কামিনী।

ইয়ামোর কথাও তুলেছে ইমহোটেপ। মাকে বলেছে, 'আমার খুবই ইচ্ছে ছিলো, ইয়ামোর সাথে সংসার করবে কামিনী। কিন্তু এরপর কার পালা কে জানে? আমি চাই না কামিনী আবার বিধবা হোক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলের কথায় সায় দিয়েছে এশা।

মাকে তার আরো একটা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ইমহোটেপ। দেবতারা না করেন, ইয়ামো যদি মারা যায়, তাহলে তার এবং সোবেকের ছেলেমেয়েদের অভিভাবক হিসেবে মোহনকে নির্বাচন করেছে সে। এ-ব্যাপারে সব কাগজ-পত্র তৈরি করা হয়েছে, শুধু সই করা বাকি। ইয়ামোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এতে তার আপত্তি নেই। এশাও মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়েছে, কাজটা ভালোই করেছে

ইমহোটেপ। এর ফলে, ইয়ামো মারা যাবার পর, কামিনী সব কিছুর মালিক হলেও, ইয়ামো আর সোবেকের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হবে না, তাদের প্রাপ্য অংশ মোহন তাদেরকে পাইয়ে দেবে।

তার সাথে খুনীর একটা খেলা চলছে, বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে ভাবলো এশা। সে তার চাল দিয়েছে। এবার খুনীর পালা। দেখা যাক, কি চাল দেয় সে।

এই বয়সে যতোটা সর্তক থাকা সম্ভব তার চেয়ে বেশিই সর্তক আছে সে। ঘরে ঢুকেই মদের বড়সড় কলসটা পরীক্ষা করেছে। কলসের মুখে ঢাকনি ছিলো, ঢাকনির চারদিকের কিনারা ছিলো আঠা দিয়ে মোড়া। যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি পেয়েছে সে।

কিশোরী দাসীর দিকে তাকালো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'মোহন কোথায় জানিস?'

দাসী জবাবে বললো, তার ধারণা মোহন সম্ভবত সমাধি প্রাঙ্গণে গেছে।

'তার কাছে যা একবার,' নিচু গলায় বললো এশা। 'গিয়ে বলবি, কাল যখন ইমহোটেপ আর ইয়ামো ক্ষেতে যাবে, সে যেন আমার সাথে অবশ্যই দেখা করে। বলবি, তার আগে যেন ভালো করে দেখে নেয়, ইমহোটেপ আর ইয়ামোর সাথে কোহিও ক্ষেতে গেছে কিনা। মোট কথা তাকে কেউ যেন আমার কাছে আসতে না দেখে। ওই সময়টায় কেতী ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেকের ধারে থাকার কথা। কি বলতে হবে, বুঝেছিস? শোনা আমাকে।'

দাসী শোনালো। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মোহনের সাথে পরামর্শটা গোপনে হওয়া চাই, ভাবলো এশা। কাল ওই সময় হেনেটকেও কোনো একটা কাজ দিয়ে কোথাও সরিয়ে

দেবে সে। এরপর কি ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে তার মনে, মোহনের সাথে আলাপ করা দরকার।

ঘণ্টাখানেক পর দাসী এসে খবর দিলো, মোহন কাল দেখা করবে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো এশা। কিন্তু সেই সাথে আরো যেন ক্লান্ত আর দুর্বল হয়ে পড়লো সে। দাসীকে মিষ্টি গন্ধ মলম নিয়ে আসতে বললো।

মলম লাগিয়ে এশার হাত আর পা মালিশ শুরু করলো দাসী। আরামে চোখ বুজলো এশা। পেশীর আড়ষ্ট ভাব একটু একটু করে দূর হয়ে যাচ্ছে, গাটের ব্যথা কমছে ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ পর হাত আর পা লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো বৃদ্ধা, তারপর আবার চোখ বুজলো। ঘুম এসে তাকে সমস্ত ভয় আর উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিলো।

অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙলো এশার, সারা শরীরে অদ্ভুত একটা শী[illegible] ভাব। হঠাৎ আতংকিত বোধ করলো সে—তার হাত [illegible] অসাড় হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো, শুধু হাত-পা নয়, সারা শরীর কেমন যেন অবশ লাগছে। বুকের কোঁচকানো চামড়ায় হাত রাখ[illegible]—হৃৎপিণ্ড এখনো লাফাচ্ছে, কিন্তু দ্রুত নিস্তেজ হয়ে আ[illegible]ছে। [illegible]র মাথাটা···ঠিকমতো কাজ করছে না···।

এশা বুঝলো, মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে চলেছে।

অদ্ভুত একটা মৃত্যু—আগাম কোনো আভাস না দিয়ে এসে পড়েছে। বুড়ো মানুষরা এভাবেই মরে, ভাবলো সে। কিন্তু পর-মুহূর্তে উপলব্ধি করলো, অসম্ভব, এ স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না।

বিষ···

কিন্তু কিভাবে? কখন? যা খেয়েছে সবই পরীক্ষা করিয়ে খেয়েছে,

পরীক্ষার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক বা গলদ ছিলো না।

তাহলে কিভাবে? কখন?

জ্ঞান হারাবার আগে, সামান্য যেটুকু বুদ্ধি এখনো অবশিষ্ট আছে, তার সাহায্যে রহস্যটা ভেদ করার চেষ্টা করলো বৃদ্ধা। তাকে জানতেই হবে, মরার আগে তাকে জানতেই হবে।

হৃৎপিণ্ডের ওপর কিসের যেন একটা চাপ, দ্রুত বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। বুঝলো, আর বেশি দেরি নেই।

কিভাবে? কখন?

আজ সারাদিন যা ঘটেছে, একে একে সব স্মরণ করার চেষ্টা করলো এশা। শেষ ঘটনাটা মনে পড়ে যেতেই তার যেন চোখ খুলে গেল।

পশম কামানো ভেড়ার চামড়া···চর্বির একটা পিণ্ড···তার বাবার একটা পরীক্ষা ছিলো, তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে কিছু কিছু বিষ হজম করে নেয় চামড়া। চর্বি···চর্বি দিয়ে তৈরি মলম। তার মিষ্টি গন্ধ···মলমে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল খুনী। মিশরীয় মহিলাদের প্রিয় মলম, খুবই দরকারী জিনিস···।

কাল···মোহন আসবে···কিন্তু সে জানবে না···সে তাকে বলে যেতে পারছে না···অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পরদিন সকালে কিশোরী দাসী ঘুম থেকে জেগেই দেখলো মুখ আর চোখ খুলে মরে পড়ে আছে তার কর্ত্রী। বাড়ির ভেতর ছুটোছুটি করে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

মায়ের লাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইমহোটেপ। তার

চেহারায় শোক, কিন্তু সন্দেহের ছায়ামাত্র নেই। মৃদু কণ্ঠে বললো সে, 'মার বয়স হয়েছিল। অসিরিস তাকে ডেকে নিয়েছে। আমি খুশি এই দেখে যে আমার মা কষ্ট পেয়ে মরেনি। আমার সান্ত্বনা এই যে মায়ের মৃত্যুর সাথে অশান্ত কোনো আত্মা বা মানুষের কোনো শয়তানির সম্পর্ক নেই। কোথাও কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। দেখো, আমার মাকে কেমন শান্ত দেখাচ্ছে।'

ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে কামিনী, আর ইয়ামো তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'শান্ত হ, বোন। মনটাকে শক্ত কর। দেবতাদের বল, আর আমরা মৃত্যু দেখতে চাই না।'

হেনেট কাঁদছে না, শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর মাথা নাড়ছে। যদিও তার মুখ মুহূর্তের জন্যেও থেমে নেই। একনাগাড়ে কথা বলে চলেছে সে, 'এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। আমি তো স্রেফ একটা দাসী, কিন্তু আমাকেও সে আপন মেয়ের মতো স্নেহ করতো। সুখ-দুঃখের সব কথা আমাকেই তো বলতো সে।'

হাসি আর গান আপাততঃ বন্ধ রেখেছে কোহি, চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছে গাম্ভীর্য।

ঘরে ঢুকলো মোহন। চেহারায় কোনো ভাব নেই, লাশের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলো। ঠিক এই সময়েই তাকে এখানে আসতে বলেছিল এশা। তার মনে একটাই প্রশ্ন: কি বলতে চেয়েছিল আমাকে?

নিশ্চই কিছু বলতে চেয়েছিল।

বলার জন্যে বেঁচে নেই এশা। কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল তা সে অনুমান করতে পারে।

সতেরো

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—ষোলো তারিখ

'মোহনদা, দাদী-মা···দাদী-মা কি···খুন হয়েছে ?'

'আমার তাই বিশ্বাস, কামিনী।'

'কিভাবে ?' অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলো কামিনী।

'তা জানি না।'

'কিন্তু দাদী-মা খুব সতর্ক ছিলো। তার সব খাবার প্রথমে আমি খেতাম···'

'জানি, কামিনী। কিভাবে ব্যাপারটা ঘটলো বলতে পারবো না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এটাও একটা খুন।'

'কিন্তু···

'জানি কি বলবে। এসবের পিছনে অশান্ত আত্মার হাত আছে, এই তো ?'

'তুমি বলতে চাও নেই ?'

'নেই। দাদী-মা সেটা জানতো। একজনকে সন্দেহ করতো সে,

নিজের সন্দেহ প্রকাশও করে ফেলে। সত্যি কথা বলতে কি, দাদী-মা নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিল। মরে গিয়ে প্রমাণ করলো, তার সন্দেহ ভুল নয়।'

মোহনের একটা কনুই খামচে ধরলো কামিনী। 'কে... কে সে?'

'না,' বললো মোহন, 'কে তা সে আমাকে বলেনি। তার নাম ভুলেও মুখে আনেনি। তবে, আমার ধারণা, তার আর আমার চিন্তা একই খাতে বইছিল।'

'তাহলে আমাকে তোমার বলতেই হবে, মোহনদা,' জেদ ধরলো কামিনী। 'আমি তাহলে সাবধান হতে পারবো।'

'না, কামিনী। তুমি জানলে তোমার বিপদ বাড়বে। তোমার ভালো-মন্দের ব্যাপারে আমি একটা দায়িত্ব অনুভব করি, সেটা আমাকে পালন করতে হলে তোমাকে বলা চলে না।'

'তারমানে কি আমি নিরাপদ?'

মাথা নাড়লো মোহন। 'না, কামিনী, তুমিও নিরাপদ নও। নিরাপদ কেউ নয়। কিন্তু সত্যি কথাটা যতোক্ষণ না জানছো ততোক্ষণ বিপদের ভয় একটু কম, এই যা। তোমার ব্যবহারে বা হাবভাবে যদি প্রকাশ পায় তুমি তাকে সন্দেহ করো, যে-কোনো ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে সরাবার চেষ্টা করবে সে।'

'কিন্তু তোমাকে, মোহনদা? তুমি তো জানো!'

'জানি, তা বলিনি। বলেছি, মনে হয় জানি। কিন্তু আমার আচরণে কিছুই আমি প্রকাশ করিনি। বোকামি করে মুখ খুলেছিল দাদী-মা। শত্রুকে বুঝতে দিয়েছিল কোন্ পথে এগোচ্ছে তার চিন্তা-ভাবনা। সেজন্যেই এশাকে খুন না করে খুনীর উপায় ছিলো না।'

'মোহনদা···মোহনদা, তোমার যদি কিছু হয়···'

কামিনীর চোখে চোখ রেখে মোহন বললো, 'আমার কথা অনেক ভাবো তুমি, তাই না, কামিনী ?' কামিনীর একটা হাত ধরলো সে।

দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার জন্যে চিন্তা করো না,' নিচু গলায় আশ্বাস দিলো মোহন। 'আর জেনো, আমি যতোক্ষণ বেঁচে আছি, খুনী তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর ক'টা দিন, দেখবে, আবার শান্তি ফিরে আসবে।'

মোহনদা যখন বলছে, ভাবলো কামিনী, তখন নিশ্চই শান্তি ফিরে আসবে। তারপর সে ভাবলো, মোহনদার কাছে এলেই নিজেকে আমার সুখী সুখী লাগে।

হঠাৎ কামিনী নিজেকে কর্কশ সুরে বলতে শুনলো, 'কোহির সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে।'

কামিনীর হাতটা আস্তে করে ছেড়ে দিলো মোহন। 'আমি জানি, কামিনী।'

'ওরা বললো···বাবা বললো, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'আমি জানি,' বললো মোহন। সরে এলো সে। উঠন ধরে বাড়ির দিকে এগোলো।

মোহনদা চলে যাচ্ছে, ভাবলো কামিনী। ও কি আঘাত পেলো ? 'মোহনদা, কোথায় যাচ্ছো তুমি ?'

'পানি খেয়ে মাঠে যাবো, ইয়ামোর সাথে কাজ করবো। অনেক কাজ পড়ে আছে, ফসল কাটা শেষ···'

'আর কোহি ?'

'কোহিও আমাদের সাথে থাকবে।'

চিৎকার করে কামিনী বললো, 'কিন্তু এখানে একা থাকতে ভয়

করবে আমার।'

দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এলো মোহন। 'ভয় পেয়ো না, কামিনী। অন্তত আজ ভয় পাবার কোনো কারণ নেই তোমার।'

'তারমানে? আজ ভয় পাবো না···কিন্তু কাল?'

'আজকের দিনটা বেঁচে থাকাই যথেষ্ট, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে,' বললো মোহন। 'আজ তোমার কোনো বিপদ নেই।'

মোহনদা, তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন খুনী কি ভাবছে না ভাবছে সব তুমি পরিষ্কার জানো।'

'এরপর তুমি হয়তো বলে বসবে আমিই খুনী।' হাসছে মোহন।

'আমার না হয় আজ কোনো বিপদ নেই, কিন্তু বাবার? ইয়ামোর? তোমার?' উদ্বেগে ব্যাকুল দেখালো কামিনীকে।

'তোমার বাবার?' মাথা নাড়লো মোহন, হাসলো। 'না, তারও আজ কোনো বিপদ নেই। ইয়ামোর?' আবার মাথা নাড়লো সে, হাসলো। 'না, ইয়ামোরও অন্তত আজ কোনো বিপদ নেই। তুমি বরং, কামিনী, এসব ভুলে থাকার চেষ্টা করো। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি আমি, যদিও দেখে হয়তো মনে করছো কিছুই আমি করছি না।'

'বুঝেছি,' চিন্তিতভাবে মোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো কামিনী, 'বুঝেছি, এরপর ইয়ামোর পালা। আবার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হবে, সেজন্যেই তুমি মাঠে যাচ্ছো—তাকে পাহারা দেয়ার জন্যে। দু'বার তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। এবারও যাতে খুনী ব্যর্থ হয় সে চেষ্টা করছো তুমি। কিন্তু মোহনদা, কে সে? কেন সে আমাদের সবাইকে এতো ঘৃণা করে··?'

'চুপ। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, কামিনী।'

'তোমাকে···শুধু তোমাকেই তো বিশ্বাস করি, মোহনদা! আমি জানি, তুমি আমাকে মরতে দেবে না···মোহনদা!' কেঁদে ফেললো কামিনী। 'জীবনকে আমি বড় ভালোবাসি···আমি মরতে চাই না মোহনদা···।'

'তোমাকে আমি মরতে দেবোও না,' দৃঢ় সুরে বললো মোহন।

'কিন্তু আমি তোমাকেও চাই, মোহনদা···মানে তোমাকে বেঁচে থাকতে দেখতে চাই।'

'থাকবো, কামিনী—তোমাকে কথা দিলাম।'

শান্ত হলো কামিনী। চোখে চোখ রেখে হাসলো ওরা। তারপর ইয়ামোর খোঁজে চলে গেল মোহন।

লেকের পাড়ে বসে কাদা-মাটি দিয়ে ছেলেমেয়ের জন্য পুতুল তৈরি করছে কেতী। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কাছাকাছি থামলো কামিনী। কেতীর কাজ দেখছে বটে, কিন্তু মনের ভেতর চলছে চিন্তার জাল বোনা।

খুনীর পরিচয় দাদী-মা জানতো, মোহন জানে। কিভাবে? বুদ্ধি দিয়ে জেনেছে ওরা, চিন্তা করে বের করেছে। কাজটা তাহলে তেমন কঠিন নয়, চিন্তা করলে আসল উত্তরটা বেরিয়ে আসতে পারে।

তাকে জানতে হবে, ভাবলো কামিনী।

বাবা নয়, বাবা হতে পারে না—নিজের ছেলেদের এভাবে কেউ মারতে পারে না। তাহলে বাকি থাকলো···কে বাকি থাকলো?

কেতী আর হেনেট।

দু'জনেই মেয়েমানুষ···

তাছাড়া, খুন করার ওদের কোনো কারণও নেই।

তবে হেনেট···হেনেট ওদেরকে ঘৃণা করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবাকে? না, অসম্ভব। সত্যিই কি অসম্ভব? হয়তো বাবাকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে হেনেট। হয়তো যুবতী বয়সে ভেবেছিল বাবা তাকে বিয়ে করবে। ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি বলে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তার বুকে।

'কি ব্যাপার, কামিনী?' হঠাৎ কেতীর গলা পেয়ে চমকে উঠলো কামিনী। 'অমন মগ্ন হয়ে কি ভাবছো?'

'আমার ভয় করছে, কেতী!' বললো কামিনী।

'ভয়?' অবাক দেখালো কেতীকে।

'হ্যাঁ, বাড়িতে একের পর এক যা ঘটছে···।'

'ও, সেই ভয়।' কেতী কোনো গুরুত্বই দিলো না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো কামিনী। 'এসব ঘটছে···তোমার ভয় করে না, কেতী?'

'না,' বললো কেতী। এক মুহূর্তে কি যেন ভাবলো সে। 'শ্বশুরের কিছু যদি ঘটে, মোহন ছেলেমেয়েদের স্বার্থ দেখবে। মোহন সৎ লোক।

'কেন, বড়দা রয়েছে না?'

'তোমার বড়দাও মারা যাবে।'

'কেতী! কি বলছো!'

কামিনীর দিকে চেয়ে থেকে আবার কি যেন ভাবলো কেতী। তারপর বললো, তোমার বাপ, শুনলে হয়তো খারাপ লাগবে—কিন্তু কথা যখন উঠলোই, সত্যি কথাটাই বলবো। শ্বশুর আমার শুধু বদরাগী নয়, রীতিমতো অত্যাচারী লোক। চিরটা কাল শুধু একা কর্তৃত্ব ফলিয়ে এসেছে। বুড়ো বয়সে একটা ছুঁড়িকে নিয়ে বাড়িতে

ঢোকালো, এটা কি তার উচিত হয়েছে? শ্বশুর হলে কি হবে, কোনো-দিনই ভালো চোখে দেখিনি—ভালো কোনো কাজ করলে তো! আর ইয়ামো, আমার ভাশুর, বউয়ের কথায় উঠতো, বউয়ের কথায় বসতো। কিছুদিন থেকে তার মধ্যে একটা রগচটা ভাব দেখা যাচ্ছে। শ্বশুর মারা গেলে আমার ছেলেমেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে না, কে বললো? বিশেষ করে তার নিজের যখন ছেলেমেয়ে রয়েছে? কিন্তু মোহনের কোনো ছেলেমেয়ে নেই, কাজেই সে কাউকে ঠকাতে চেষ্টা করবে না। এতোগুলো লোক মারা গেল, সবাই খুব চিন্তা করছে, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এও মন্দ না। লোক থাকা মানেই ঝামেলা···।'

'কেতী!'

'জানি, আমার কথা তোমার ভালো লাগবে না···।

'কেতী, তোমার স্বামীও না খুন হয়েছে!'

কাঁধ ঝাঁকালো কেতী।

'সোবেকের জন্যে তোমার···সোবেককে তুমি ভালোবাসতে না?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালো কেতী। পাল্টা প্রশ্ন করলো সে, 'কেন ভালোবাসবো?'

'কেতী!' হতভম্ব দেখাচ্ছে কামিনীকে। 'সে তোমার স্বামী ছিলো। তোমাকে ছেলেমেয়ে দিয়েছে।'

হঠাৎ করেই কোমল হলো কেতীর চেহারা। তিন ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে ঝরে পড়ছে মাতৃ-স্নেহ। 'হ্যাঁ, সোবেক আমাকে সন্তান দিয়েছে। সেজন্যে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আসলে কি ছিলো সে, শুনি? সুদর্শন একটা লম্পট—দু'চার দিন পরপরই খারাপ মেয়েমানুষদের কাছে যেতো।

কেন, ঘরে আরো একটা বোন আনলে আমি কি তার গর্দান নিতাম? তাতে বরং সংসারে কাজের একটা মানুষ পাওয়া যেতো। তা না, বেশ্যাদের কাছে যেতো সে, সোনা আর রূপোর চাকতিগুলো দু'হাতে উড়িয়ে আসতো। শ্বশুর তাকে বেশি স্বাধীনতা দেয়নি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছিল, দিলে বাড়িতে তাকে পাওয়াই যেতো না। এই রকম লম্পট একটা লোকের জন্যে শ্রদ্ধা বা দরদ কেন থাকবে আমার?'

একটু থামলো কেতী, তারপর আবার বললো, 'তাছাড়া, পুরুষ-মানুষরা আসলে কি? বাচ্চা পয়দার জন্যে প্রয়োজন আছে ওদের, ব্যস, ওদের আর কোনো গুরুত্ব নেই। দুনিয়াটা চালাচ্ছি আমরা, কামিনী, আমরা মেয়েমানুষরা। আমাদেরকে বাচ্চা দিয়ে পুরুষরা যতো তাড়াতাড়ি মরে যায় ততোই ভালো...'

আজ হঠাৎ করে উপলব্ধি করলো কামিনী, কেতী শুধু দৈহিক দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও কঠিন পাথর। কেতীর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। কাদা ছেনে পুতুল তৈরি করছে। পেশীবহুল, মোটাসোটা, পুরুষালি হাত। হঠাৎ করেই আলার কথা মনে পড়ে গেল কামিনীর। শক্ত এক জোড়া হাত আলার মুখটাকে লেকের পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিল। সন্দেহ নেই, কেতীর হাতে সে জোর আছে...।

কেতীর মেয়ে একটা পুতুল মাড়িয়ে ফেলে কান্না জুড়ে দিলো। তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেলো কেতী।

'কি হলো? আবার কি হলো?' চিৎকার করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো কুঁজো বুড়ি। 'বাচ্চাটা অমন করে কেঁদে উঠলো কেন? আমি ভাবলাম আবার বুঝি...।' থেমে গেল হেনেট, তার

চেহারায় নৈরাশ্য ফুটে উঠলো। আশা করছিল নিশ্চই আবার কোনো সর্বনাশা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

একবার কেতীকে দেখলো কামিনী; আরেকবার হেনেটকে।

একজনের চেহারায় ঘৃণা, আরেকজনের চেহারায় স্নেহ।

কামিনী ভাবলো, কে জানে কোন্‌টা বেশি ভয়ংকর!

'বড়দা, সাবধান! কেতী একটা ভয়ংকর মেয়েছেলে, খুব সাবধানে থেকো তুমি!'

'কেতী? ভয়ংকর? কি বলছিস তুই, কামিনী?' বিমূঢ় দেখালো ইয়ামোকে। 'তোর কি মাথা খারাপ হলো!'

'তুমি জানো না, বড়দা,' জোর দিয়ে বললো কামিনী, 'কেতী পারে না এমন কোনো কাজ নেই।'

'দুর!' হেসে উঠলো ইয়ামো। 'ও তো চিরকাল চুপচাপ, কারো সাতে-পাঁচে থাকে না। বুদ্ধি কম, হয়তো একটু ঈর্ষাকাতর, কিন্তু তাই বলে··· বিপজ্জনক হতেই পারে না।'

'কেতী খুব নিষ্ঠুর, বড়দা। ওকে আমার ভয় করে। আমি চাই ওর ব্যাপারে তুমি সতর্ক থাকবে।'

'কি হয়েছে বল তো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো ইয়ামো। হঠাৎ কেতীকে তোর বিপজ্জনক মনে হলো কেন? তুই কি ভাবছিস বাড়িতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, কেতী দায়ী? দুর-দুর, ওর অতো সাহস হবে কোত্থেকে! এতো বুদ্ধিই বা পাবে কোথায়!'

'বুদ্ধির তেমন দরকার আছে কি?' জিজ্ঞেস করলো কামিনী। 'বিষ সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান থাকলেই হয়। তুমি তো জানো, কিছু কিছু পরিবার এই জ্ঞান নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখে—মায়ের

কাছ থেকে মেয়ে পায়। বিষাক্ত শেকড় থেকে তৈরি করা হয় এই বিষ। লক্ষ্য করেছো, ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়লে জঙ্গল থেকে পাতা আর শেকড় নিয়ে এসে ওষুধ তৈরি করে কেতী ?'

'হ্যাঁ, তা তৈরি করে, কিন্তু তাই বলে···,' ইয়ামোকে এতোক্ষণে চিন্তিত দেখালো।

'হেনেটও কম বিপজ্জনক নয়, বড়দা,' নিচু গলায় বললো কামিনী।

'হেনেট···হ্যাঁ। ওকে কেউ আমরা পছন্দ করি না। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু বাবা ওকে অতিরিক্ত পছন্দ করে বলে···।'

'বাবাই তো ওকে মাথায় চড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, বাবাকে খুব তোয়াজ করে হেনেট, আর বাবাও তোয়াজ পছন্দ করে।'

বড় ভাইয়ের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালো কামিনী। বড়দা বাবার সমালোচনা করছে, এই প্রথম শুনলো সে। ইদানিং ব্যাপারটা প্রায়ই চোখে পড়ে, ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছে ইয়ামো। আজকাল সে কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে। ইমহোটেপ বুড়ো হয়ে গেছে, শোকে কাতর। হুকুম দেয়ার বা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগের সেই ক্ষমতা তার আর নেই। এমন কি তার শারীরিক শক্তিও কমে গেছে, আজকাল বেশির ভাগ সময় ঘরে শুয়ে থাকে সে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। কামিনী লক্ষ্য করেছে, আপন মনে বিড়বিড় করে বাবা, নিজের সাথে কথা বলে।

'তোমার কি মনে হয়, হেনেট···মানে এসবের জন্যে···মানে তুমি কি মনে করো যা যা ঘটেছে সে-সবের জন্যে হেনেট···?'

কামিনীর একটা হাত খপ্ করে চেপে ধরলো ইয়ামো। দ্রুত চারদিকে তাকালো সে। 'চুপ, চুপ! এসব কথা মুখে আনতে নেই।

দেয়ালেরও কান আছে।'

'তারমানে তুমিও ভাবছো…?'

ফিসফিস করে ইয়ামো বললো, 'চুপ, এসব কথা এখন থাক। চোখ-কান খোলা রেখেছি আমরা, একটা বুদ্ধিও পাওয়া গেছে… খুনীকে আমরা ঠিকই ধরে ফেলবো।'

আঠারো

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—সতেরো তারিখ

নতুন চাঁদ উঠবে, আজ তাই উৎসব। অসুস্থ দেহ-মন নিয়েও সমাধি-প্রাঙ্গণে এলো ইমহোটেপ, বারণ করে তাকে রাখা যায়নি। দেবতাদের জন্যে নিজের হাতে ভোগ দিলো সে। তারপরই ডাকাডাকি শুরু করলো চড়া গলায়, 'কোথায়, আমার ছেলেরা সব কোথায়? আলা, বাপ আমার? বুকের ধন, সোবেক?

'বাবা…বাবা…,' ছুটে এলো ইয়ামো।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ইমহোটেপ। এতোক্ষণে তার মনে পড়েছে। আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে তার। সব ভুলে যাচ্ছে। 'বুঝেছি,

পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। মনেই থাকে না, আলা আর সোবেক নেই।'

দু'হাত বাড়িয়ে ইয়ামোকে আলিঙ্গন করলো সে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'তুমি আছো, আর কামিনী মা আছে···কিন্তু ক'দিনের জন্যে? ক'দিনের জন্যে?'

'শান্ত হও, বাবা,' চোখ ছলছল করছে ইয়ামোর। কিন্তু ইমহোটেপ তার কথা শুনতে পায়নি মনে করে আরো জোরে, প্রায় চিৎকার করে আবার বললো সে, 'যা হবার হয়েছে, এবার আমাদেরকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।'

'কি?' উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলো ইমহোটেপ। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে হেনেটের ওপর।'

কামিনী আর ইয়ামো দৃষ্টি বিনিময় করলো।

'ঠিক বলিনি?' জিজ্ঞেস করলো ইমহোটেপ। 'সব কিছু হেনেটের ওপর নির্ভর করছে না? হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'বাবা, তোমার কথা আমরা বুঝতে পারছি না,' বিস্মিত কণ্ঠে বললো ইয়ামো।

বিড়বিড় করে কি বললো ইমহোটেপ, বোঝা গেল না। চোখে শূন্য দৃষ্টি, হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিলো সে, 'শুধু হেনেটই বোঝে আমাকে। সে জানে আমার কাঁধে কতো রকমের দায়িত্ব। হেনেট চিরকাল আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। কাজেই তার প্রতিদান পাওয়া উচিত। সে চিরকাল আমার ভালো চেয়েছে, কাজেই আমিও তার ভালো চাইবো। তাকে পুরস্কার দিতে হবে।'

ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল ইমহোটেপ। কটমট করে তাকালো। 'আমার কথা বোঝা গেছে, ইয়ামো? হেনেটের কথার ওপর কথা বলা চলবে না। তার হুকুম সবাইকে মেনে চলতে হবে।

বোঝা গেছে ?'

'কিন্তু কেন, বাবা ?'

'আমি বলছি, তাই। কারণ, হেনেট যা চায় তা দেয়া হলে এ-বাড়িতে আর কেউ খুন হবে না···।' ঘুরে দাঁড়ালো ইমহোটেপ, হন হন করে ফিরে চললো সরু পাহাড়ী পথের দিকে।

'এ-সবের মানে কি, বড়দা ?'

'জানি না, কামিনী। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা বোধহয় সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছে···।'

'কিন্তু হেনেটের ব্যাপারে যা বললো, পাগলামি নাও হতে পারে,' চিন্তিত দেখালো কামিনীকে। 'কানী বুড়ি যদি এ-সবের জন্যে দায়ী হয়, আমি একটুও আশ্চর্য হবো না। সে যে আমাদের সবাইকে ঘৃণা করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাকে কি বলেছে জানো ? বলেছে, দিন কতোক পর সে নাকি আমাদের সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে।'

ভাই-বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর কামিনীর কাঁধে একটা হাত রাখলো ইয়ামো। 'ওকে ক্ষেপাবি না। তুই এতো বোকা, কি ভাবছিস না ভাবছিস সব তোর চেহারা দেখে বোঝা যায়। বাবা কি বললো শুনলি তো ? হেনেট যা চায় তা তাকে দেয়া হলে এ-বাড়িতে আর কেউ খুন হবে না···।'

ভাঁড়ার ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুঁজো বুড়ি, সামনে ভাঁজ করা চাদরের স্তূপ, চাদরগুলো এক দুই করে গুণছে সে, আর বিড়বিড় করে বলছে, 'আশায়েত মাগী, এগুলো সব তোর চাদর। আমি শুতাম ছেঁড়া কাঁথায়, আর তুই এই দামী চাদর বিছিয়ে শুতি। জানিস,

তোর সেই চাদরগুলো এখন কি কাজে ব্যবহার হচ্ছে ?' খিল খিল করে হেসে উঠলো হেনেট। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলো সে, হাসি থেমে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালো।

ওখানে ইয়ামো দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'কি করছো তুমি, হেনেট ?'

'এমবামরা আরো চাদর চেয়েছে। ডজন ডজন চাদর দরকার হচ্ছে ওদের। এভাবে যদি সবাই মরতে থাকে, চাদরগুলো আর একটাও থাকবে না। এগুলো সব তোমার মায়ের চাদর, ইয়ামো। বেচারি অনেক যত্ন করে রাখতো। কে জানতো তারই চাদর তার ছেলে...।'

'ওগুলো ব্যবহার করতে হবে কে বলেছে তোমাকে ?' জিজ্ঞেস করলো ইয়ামো।

'তোমার বাবা,' বললো হেনেট, 'সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। জানোই তো, এই কানী বুড়িকে বিশ্বাস করে তোমার বাবা।' কর্কশ সুরে হাসতে লাগলো সে। 'আমাকে ডেকে বললো, হেনেট, শুধু তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি। বললো, এই সংসারের সব দায় দায়িত্ব তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'কষ্ট করলে প্রতিদান পাওয়া যায়ই। এতোদিনে আমার আশা পূরণ হলো—সবাইকে আমার কথামতো চলতে হবে।'

বোকা বোকা দেখালো ইয়ামোকে। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

'কারো ভালো লাগুক না লাগুক,' বললো হেনেট, 'এই কানী বুড়িই এখন থেকে হুকুম চালাবে। যে দু'একজন এখনো বেঁচে আছে, আমার কথায় উঠতে-বসতে হবে তাদের। তুমি কি বলো, ইয়ামো ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইয়ামো বললো, 'হুঁ। দেখেশুনে তো তাই মনে হচ্ছে।' তার কণ্ঠস্বর নরম শোনালো, 'বাবা বলছিল,' একটু বিরতি নিলো সে, 'এখন নাকি সব কিছুই তোমার ওপর

নির্ভর করছে।'

বসন্তের দাগে ভরা চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হেনেটের। 'বলছিল নাকি? শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু তুমি বোধহয় তার সাথে একমত নও, তাই না, ইয়ামো?'

হেনেটকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ইয়ামো। খানিক পর মৃদু কণ্ঠে বললো সে, 'কি জানি।'

'ক্ষমতা যে এখন আমার হাতে সেটা তোমার মেনে নেয়া উচিত, ইয়ামো,' তীক্ষ্ণ, কিন্তু চাপা কণ্ঠে বললো হেনেট। 'তোমার জন্যে সেটা ভালোই হবে। এ-বাড়িতে আর আমরা···আর আমরা বিপদ দেখতে চাই না, চাই কি?'

'ঠিক বুঝলাম না,' বললো ইয়ামো। 'বলতে চাইছো, আমরা আর খুন-খারাবি চাই না?'

'খুন তো আরো হতেই হবে, ইয়ামো। হ্যাঁ, হতেই হবে···।'

শিউরে উঠলো ইয়ামো। হতভম্ব দেখালো তাকে। 'তারমানে, হেনেট? কি বলতে চাইছো তুমি? এরপর কে খুন হবে?'

'কেন ধরে নিচ্ছো আমি জানি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো হেনেট।

'ধরে নিচ্ছি এই জন্যে যে এ-বাড়িতে যাই ঘটুক না কেন, তুমি ঠিকই তা জানতে পারো,' বললো ইয়ামো। 'তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছিল, আলা খুন হবে—হলোও তাই। তুমি খুব চালাক, হেনেট। সবই তোমার জানা।'

'আচ্ছা, এতোদিনে তাহলে বুঝতে পেরেছো। আমি আর তাহলে কানী বুড়ি নই, নই তোমাদের কেনা বাঁদী। আমি তাহলে সব জানি।'

'কি বলতে চাও, হেনেট?'

হেনেটের গলার আওয়াজ বদলে গেল। ফিসফিস করে বললো সে, 'এখন আমি জানি, এ-বাড়িতে শুধু আমার হুকুমই খাটবে। আমাকে বাধা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। এরই মধ্যে আমার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে তোমার বাবা। তোমাকেও আমার ওপর নির্ভর করতে হবে, ইয়ামো। ঠিক কিনা?'

'আর কামিনীকে?'

চাপা স্বরে হাসলো হেনেট। তার মুখের রেখা আর ভাঁজগুলো কিলবিল করতে লাগলো। 'কামিনী? ওই মাগী থাকলে তো।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছো, এরপর কামিনী খুন হবে?' বিস্ফারিত হয়ে উঠলো ইয়ামোর চোখ জোড়া।

'তোমার কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলো হেনেট।

'তুমি কি বলো সেটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

'আমি হয়তো শুধু বোঝাতে চেয়েছি বিয়ে হয়ে যাবে কামিনীর, তারপর চলে যাবে।'

'কথা ঘোরাচ্ছো। আসলে কি বোঝাতে চেয়েছো জানতে চাই।'

গালে হাত দিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গি করলো হেনেট। 'তোমার দাদী-মা একবার বলেছিল, আমার জবান নাকি বিপজ্জনক। হয়তো ঠিকই বলেছিল। সে যাক। তুমি কি ভাবছো শুনতে চাই। আমার আশা কি পূরণ হবে? এ-বাড়ির কর্ত্রী হতে পারবো আমি?'

অনেকক্ষণ হেনেটের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর ক্লান্ত সুরে ইয়ামো বললো, 'হ্যাঁ। বিশেষ করে বাবা যখন তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি খুব চালাক, হেনেট। তুমি পারবে। তোমার ইচ্ছে মতোই চলতে হবে সবাইকে।'

ঘাড় ফেরালো ইয়ামো, দোরগোড়ায় দেখতে পেলো মোহনকে।'

'এই যে, ইয়ামো, তুমি এখানে। তোমার বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সমাধিপ্রাঙ্গণে যাবার সময় হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালো ইয়ামো। 'আসছি আমি।' বলে দরজার দিকে এগোলো সে, নিচু গলায় বললো, 'মোহন, আমার মনে হয় হেনেট পাগল হয়ে গেছে। শয়তান ভর করেছে ওর ওপর। মনে হচ্ছে যা যা ঘটেছে, ওই দায়ী।'

হঠাৎ কিছু না বলে একটু সময় নিলো মোহন, তারপর বললো, 'অদ্ভুত এক মেয়েলোক, ভীষণ পাজি, সন্দেহ নেই।'

গলা আরো খাদে নামালো ইয়ামো। 'মোহন, আমার মনে হয় কামিনীর বিপদ হবে।'

'সেকি!' আঁতকে উঠলো মোহন। 'হেনেট···?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র সে আভাস দিলো, এরপর কামিনীই···চলে যাবে।'

ইমহোটেপের কর্কশ গলা পাওয়া গেল, 'আমি কি সারাদিন অপেক্ষা করবো? এটা কি ধরনের আচরণ? আমি এ-বাড়ির কর্তা, কেউ সে-কথা মনে রাখবে না? আমি যে কি অশান্তিতে আছি কেউ যদি বুঝতো। হেনেট কোথায়? সে আমার দুঃখ বোঝে···।'

ভাঁড়ার ঘরে থেকে চাপা একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো। তার-পরই হেনেটের চিৎকার শোনা গেল, 'শুনলে, ইয়ামো? তোমার বাবা কি বললো শুনলে? এসো, শুনেছো কিনা বলে যাও আমাকে···।'

মোহনকে ছেড়ে ভাঁড়ার ঘরে ফিরে এলো ইয়ামো। তার চেহারা থমথম করছে। তাকে দেখে খিল খিল করে হাসলো হেনেট। 'এই তো, বাধ্য ইয়ামো। ডাকতেই চলে এসেছো। শোনো···।'

একটু পরই মোহন আর ইয়ামোকে নিয়ে সমাধিপ্রাঙ্গণের উদ্দেশে

রওনা হয়ে গেল ইমহোটেপ।

দিনটা যেন কামিনীর কাটতেই চায় না।

অস্থির হয়ে আছে ও, বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারান্দা হয়ে উঠন পেরিয়ে লেকের ধারে চলে যাচ্ছে, কিন্তু শান্ত হতে পারছে না, আবার ফিরে আসছে বাড়ির ভেতর। এভাবে দুপুর পর্যন্ত চললো।

দুপুরবেলা ফিরে এলো ইমহোটেপ। তাকে খেতে দেয়া হলো। খানিক পর বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে। তার সাথে কামিনীও।

বারান্দায় বসলো কামিনী, ভাঁজ করা জোড়া হাঁটুর ওপর হাত, মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাচ্ছে। ইমহোটেপের চেহারায় এখনো সেই অন্যমনস্ক, বিমূঢ় ভাব। কথা বলছে কম। খানিক পর পর বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে হেনেট কোথায় জানতে চাইলো ইমহোটেপ। কিন্তু ঠিক ওই সময় লিনেন নিয়ে এমবামারদের কাছে গেছে হেনেট।

বাবাকে কামিনী জিজ্ঞেস করলো বড়দা আর মোহনদা কোথায় গেছে সে জানে কিনা।

'মোহন মাঠে গেছে, শণের হিসেব নিতে। আর ইয়ামো গেছে ক্ষেতে···এখন তো ওকেই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। আহারে, আমার চোখের মাণিক আলা, আমার বুকের ধন সোবেক···আর তোদেরকে দেখতে পাবো না···।'

তাড়াতাড়ি বাবার মন অন্য দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলো কামিনী, 'দিন মজুরদের কাজের হিসেবটা তো কোহিও রাখতে পারে, তাহলে বড়দার কাজের চাপ অনেক কমে যায়··।'

'কোহি ? কোহি কে ? ওই নামে আমার কোনো ছেলে নেই।'

'কোহি, বাবা। লেখক কোহি। যার সাথে তুমি আমার বিয়ে ঠিক করেছো।'

মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ইমহোটেপ। 'তোর বিয়ে, কামিনী ? সে তো কাসিনের সাথে ঠিক করেছি আমি।' কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'উপায় ছিলো না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে। তোর দুর্ভাগ্যই বলবো, তোর দু'ভাই তোকে ফেলে বাইরে থেকে বোন বেছে নিলো। আশা করেছিলাম ইয়ামোর সাথে সংসার করবি তুই, কিন্তু তোর জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হলো না সে। তারপর ঠিক করলাম সোবেকের সাথে বিয়ে দেবো তোর, কিন্তু সে-ও গোঁ ধরে বসলো, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে তার। এখন ওরা দু'জনেই বিবাহিত, কাজেই তোকে আমি কাসিনের সাথে···।'

'বাবা!' ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো কামিনী।

কামিনীর চিৎকার শুনে থেমে গেল ইমহোটেপ। নিজের মাথা চুলকাতে শুরু করলো সে। তারপর বললো, 'ও, হ্যাঁ, কোহি। ভাঁটি-খানার কাজকর্ম দেখতে গেছে সে। যাই, দেখি কি করছে ওরা।' বিড়বিড় করতে করতে বারান্দা থেকে নেমে গেল ইমহোটেপ। 'আমি না থাকলে কোনো কাজই নিখুঁত হয় না···।'

কথাগুলো শুনতে পেয়ে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো কামিনী, বাবা আবার তার স্বভাব ফিরে পেয়েছে। কিছু মনে করতে পারছিল না, ওটা হয়তো সাময়িক একটা ব্যাপার, ভাবলো সে।

নিজের চারপাশে তাকালো কামিনী। বাড়ির ভেতর আর উঠনে আজকের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন যেন একটা অশুভ কিছু রয়েছে। বাচ্চাগুলো লেকের শেষ প্রান্তে খেলছে, তাদের সাথে কেতী

নেই।

কেতী···কোথায় সে?

এই সময় বারান্দায় বেরিয়ে এলো হেনেট। একচোখো বুড়ি দ্রুত নিজের চারদিকটা দেখে নিয়ে এগিয়ে এলো কামিনীর দিকে। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো কামিনী। কদর্য চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটে আছে। কোমল সুরে বললো সে, 'তোকে একা পাবার আশায় কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

'কেন, হেনেট?'

'তোর জন্যে একটা খবর আছে—মোহন পাঠিয়েছে।'

'কি বলেছে মোহনদা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো কামিনী।

'তোকে সমাধিপ্রাঙ্গণে যেতে বলেছে সে।'

'এখন?'

'না। সূর্য ডোবার একঘণ্টা আগে ওখানে থাকবি তুই। বলেছে, ওখানে গিয়ে তাকে যদি না দেখিস, ও না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোকে। খুব নাকি জরুরী একটা ব্যাপার।'

একটু থেমে চারদিকে আবার চোখ বুলালো হেনেট। 'কথাটা তোকে গোপনে বলতে বলেছে মোহন। তাই তোকে একা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এ-কথা আর কারো কানে যেন না যায়।' বারান্দা থেকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মনটা হঠাৎ ভালো লাগছে কামিনীর। সমাধিপ্রাঙ্গণে শান্তি আছে। ওখানে মোহনদার সাথে দেখা হবে তার। ওই একজনের সাথেই যা মন খুলে কথা বলা যায়।

যদিও, মনটা একটু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। আর কাউকে পেলো না মোহনদা, হেনেটকে বিশ্বাস করে খবরটা পাঠালো?

তারপর ভাবলো, হয়তো সত্যি আর কাউকে ধারে কাছে পায়নি, তাই হেনেটকে বিশ্বাস না করে তার উপায় ছিলো না। সে যাই হোক, খবরটা অবশ্য ঠিকই পৌছে দিয়েছে কানী বুড়ি।

বিপদের কথা মনে জাগতেই আপন মনে হেসে উঠলো কামিনী, বিড়বিড় করে বললো, 'হেনেটকে আমি ভয় পেতে যাবো কোন দুঃখে! কুঁজো বুড়ির চেয়ে আমার গায়ে অনেক বেশি জোর।'

গর্বিত ভঙ্গিতে সটান উঠে দাঁড়ালো কামিনী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। পাখির ডানার মতো হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো সে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো সতেজ একটা অনুভূতি।

কামিনীকে খবরটা দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলো হেনেট, এমবামাররা আরো লিনেন চেয়েছে। আপন মনে হাসছে বুড়ি, তার কদাকার চেহারায় নগ্ন উল্লাস। লিনেনের এলোমেলো স্তূপের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে, বিড়বিড় করে কথা বলছে, 'আরো, আরো অনেক লিনেন লাগবে। এখন আমিই এ-বাড়ির কর্ত্রী, কর্ত্রী হেনেট বলছে, ওলো আশায়েত, তোর পেটের আরো একটা বাচ্চাকে জড়াবার জন্যে লিনেন লাগবে। বল তো, কাকে এবার জড়ানো হবে? কার লাশ? হি হি। মাটির দুনিয়ায় থাকতে খুব আরাম করে গেছিস, এখন আমি আরাম করবো, তুই আকাশের দুনিয়া থেকে দেখবি আর জ্বলবি। কেমন মজা? এক এক করে তোর ছেলেমেয়েরা বিদায় হয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে সমস্ত ক্ষমতা চলে আসছে আমার হাতে। হি হি।'

লিনেনের স্তূপের পিছন থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে

এলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গেল হেনেট।

তিন মন ওজনের একটা স্তূপ পড়লো হেনেটের গায়ে। কুঁজো বুড়ি ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। আরো একটা ভারি স্তূপ পড়লো তার মুখে। স্তূপের ওপর পুরুষালি, মোটাসোটা দুটো হাত, চাপ দিচ্ছে। ছটফট করতে শুরু করলো হেনেট, হাত আর পা ছুঁড়ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো সে। তার মুখের ওপর থেকে এক চুল নড়লো না লিনেনের স্তূপ। দম বন্ধ হয়ে মারা গেল সে।

উনিশ

গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাস—সতেরো তারিখ

নির্জন পাহাড়ের ওপর, পাথুরে গুহামুখে একা বসে আছে কামিনী, অপেক্ষা করছে মোহনের জন্যে। নিচে বইছে নীলনদ, সেদিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবছে সে।

বাপের বাড়িতে ফিরে এসে এখানে যেদিন প্রথম বসেছিল সে, তারপর যেন কতো যুগ পেরিয়ে গেছে, অথচ মাত্র মাস কয়েক আগের ঘটনা। সেদিন তার মনে হয়েছিল, কিছুই বদলায়নি, সবই সেই

আগের মতো আছে। কিন্তু তাকে উল্টো কথা শুনিয়েছিল মোহনদা, বলেছিল, এমনকি কামিনীও আর আগের মতো নেই, যে কামিনী কাসিনের সাথে সংসার করতে গিয়েছিল। এরপর মোহন তাকে বলে, সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই বদলায়। কিছু পরিবর্তন বাইরে থেকে দেখে টের পাওয়া যায় না, সেগুলো এক ধরনের পচনের মতো।

এখন কামিনী বুঝতে পারে, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে কথাগুলো বলেছিল মোহনদা। সে বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল এই পরিবারে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তার চেষ্টা ছিলো কামিনী যেন সেজন্যে তৈরি থাকে।

নফরেত বাড়িতে এলো, সেই সাথে চোখ খুলে গেল কামিনীর।

হ্যাঁ, নফরেত আসার সাথে সাথে সব উলটপালট হয়ে যায়।

নফরেতই সাথে করে এতোগুলো মৃত্যু নিয়ে এলো···

নফরেত ভালো হোক বা মন্দ, তার আসার সাথে সাথেই যে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই অশুভ শক্তি এখনো পরিবারের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

না, কামিনী এখন আর বিশ্বাস করে না মৃত্যুগুলোর জন্যে নফরেতের আত্মা দায়ী।

হেনেটের কথা মনে পড়লো। কুটনী বুড়ি, সবার মন্দ খুঁজছে, এর কথা তাকে লাগাচ্ছে, কারো সুখে তার সহ্য হয় না। অনেক দিনের আশা, এ-বাড়ির সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে সে। বুড়ি হলে কি হবে, এখনো তার গায়ে অনেক জোর···

শিউরে উঠলো কামিনী। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে।

মোহনের জন্যে আর সে অপেক্ষা করতে পারে না। সূর্য ডুবু ডুবু,

সন্ধ্যে হয়ে এলে বাড়ি ফিরতে ভয় করবে। কিন্তু মোহনদা আসবে বলেও এলো না কেন? কথা দিয়ে কথা রাখেনি এমন তো কখনো হয় না।

চারদিকে ভালো করে একবার তাকালো কামিনী। কেউ নেই কোথাও। হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠলো। আসলে কি এখানে তার আসা উচিত হয়েছে, একা? হেনেট বললো আর চলে এলাম···

পাহাড়ী সরু পথ ধরে নামতে শুরু করলো কামিনী। দিগন্তরেখার নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সূর্য। চারদিকে নিস্তব্ধ পাহাড়। কি এমন জরুরী কাজে আটকা পড়লো মোহনদা? ও এলে দু'জন কতো গল্প করতো, সময়টা কিভাবে কেটে যেতো টের পেতো না।

এরকম সময় আর বেশি পাওয়া যাবে না। কিছুদিনের মধ্যে তার সাথে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কোহির···

আমি কি সত্যিই কোহিকে বিয়ে করবো?

ছি, এসব কি ভাবছি আমি! সব ঠিক হয়ে আছে, এখন আর অন্য কিছু চিন্তা করা উচিত নয়। কোহি দেখতে সুন্দর, সে আমাকে স্বাস্থ্যবান অনেক সন্তান দেবে। তাছাড়া, কোহি আমাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা বিয়ের পর আরো বাড়বে। সে-ও ভালোবাসবে কোহিকে।

এই সেই জায়গা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কামিনী। তার সারা শরীর কাঁপছে।

সরু পথ। একদিকে গভীর খাদ, আরেক দিকে পাহাড়ের পাথুরে গা। ঠিক এখান থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল নফরেত। পড়ে গিয়েছিল হিমানী। হিমানী হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়েছিল···কেন? কি শুনতে পেয়েছিল হিমানী? নিশ্চই কিছু শুনতে পেয়েছিল, তা না

হলে হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়েছিল কেন ?

পায়ের আওয়াজ ?

পায়ের আওয়াজ।···সে-ও যেন কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সরু পথ ধরে তার পিছু পিছু নেমে আসছে।

ভয়ে পাথর হয়ে গেল কামিনী। সত্যি পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে সে। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। নফরেতের অশান্ত আত্মাই তাহলে পিছু নিয়েছিল হিমানীর। আজ তারও পিছু নিয়েছে···,

কিন্তু আমি মরতে চাই না।

পিছন দিকে তাকালো না কামিনী। সরু পথ ধরে আবার এগোলো সে, হন হন করে নিচে নামতে শুরু করলো। কিন্তু পায়ের শব্দ পিছিয়ে পড়লো না। পরিষ্কার আওয়াজ পাচ্ছে কামিনী। তার পিছু নিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে শব্দটা।

হাঁটছে কামিনী। হাঁটতে হাঁটতেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার না তাকিয়ে পারলো না।

পরম স্বস্তির পরশ অনুভব করলো কামিনী। ভয়ের কিছু নেই উপলব্ধি করে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ঘুরলো। অশান্ত কারো আত্মা নয়, তারই বড় ভাই, ইয়ামো। সমাধিপ্রাঙ্গণের কোনো গুহায় ব্যস্ত ছিলো বোধহয়, হয়তো দেবতাদের নামে ভোগ দিচ্ছিলো, পাহাড়ের ওপর কামিনীর উপস্থিতি টের পায়নি।

বড়দার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো কামিনী, 'বড়দা, তাড়াতাড়ি এসো! একা আমার যা ভয় করছিল না!' হাসছে কামিনী।

হন হন করে হেঁটে আসছে ইয়ামো। তাকে উদ্দেশ্য করে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কামিনী, কথাগুলো গলায় আটকে গেল।

এই লোককে কামিনী চেনে না। এই লোক শান্তশিষ্ট, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, বড় ভাই নয়। ইয়ামোর চোখ জোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, দ্রুত আর ঘন ঘন শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে জিভের ডগা দিয়ে। তার হাত দুটো সামান্য একটু সামনের দিকে বাড়ানো, কনুইয়ের কাছে একটু বাঁকা করা। আঙুলগুলো ছড়ানো, সামান্য বেঁকে আছে।

কামিনীর দিকে তাকিয়ে আছে ইয়ামো, তার দৃষ্টিতে খুনের নেশা। এই দৃষ্টিই বলে দেয়, অনেকগুলো খুন করেছে এই লোক, আরো করবে। ইয়ামোর গোটা চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নিষ্ঠুর ভাব, নগ্ন উল্লাস।

বড়দা। বড়দাই। সেই শত্রু। ভদ্র, নম্র চেহারার আড়ালে লুকিয়ে ছিলো একজন খুনী।

বড়দা আজ আমাকে বেছে নিয়েছে। আজ আমি মারা যাবো। এখুনি আমাকে মেরে ফেলা হবে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে বড়দা, পড়বো ঠিক যেখানে নফরেত আর হিমানী পড়েছিল তার কাছাকাছি।

'বড়দা!' আবেদন জানালো কামিনী, শেষ একটা চেষ্টা। বলতে চাইলো, তোমাকে চিরকাল ভালোবেসে এসেছি, আমাকে তুমি মেরো না—কিন্তু আর কিছুই বলতে পারলো না সে।

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো ইয়ামোর গলা থেকে। পশুরা খুশি হলে যে-ধরনের আওয়াজ করে। তৃপ্তির হাসি। কোমল, অস্পষ্ট, ছোট্ট একটু হাসি।

'বড়দা, আমাকে মেরো না!' পিছিয়ে যেতে শুরু করলো কামিনী। তার চোখ জোড়া আতংকে বিস্ফারিত। জানে, বাঁচার কোনো উপায়

নেই।

ইয়ামোর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কামিনী পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে রেগে গেছে সে। এখন আর হেঁটে আসছে না, ছুটে আসছে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে কামিনী। দু'জনের মাঝখানে এখন অল্পই দূরত্ব, লাফ দিলেই ধরতে পারবে ইয়ামো।

আবার হাসি দেখা গেল ইয়ামোর মুখে। 'তুই বাঁচতি, কিন্তু কোহিকে কেন পছন্দ করলি?'

কামিনীর এলো চুল বাতাসে উড়ছে। গায়ের কাপড় বুক থেকে খসে পড়েছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অসহায়ভাবে নাড়ছে সে।

ইয়ামোর চোখে লোভ, কামিনীকে এতো খোলামেলা অবস্থায় আগে কখনো দেখেনি সে। 'ভাবলাম কোহিকে বিদায় করলে আমাকে তুই বিয়ে করবি। কিন্তু কোহিকে বিদায় করলে তুই যে আরেকজনকে পছন্দ করবি, সেটা বুঝতে দেরি হয়ে গেল একটু। কাজেই, কেন তোকে বাঁচিয়ে রাখি!'

কামিনী দাঁড়িয়ে পড়লো। নড়ার শক্তি নেই তার।

দাঁড়িয়ে পড়লো ইয়ামোও। ধীরে ধীরে বাঁকানো হাত দুটো তুললো সে।

গলায় ইয়ামোর হাত অনুভব করলো কামিনী।

ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলার আগে ইয়ামো তাকে গলা টিপে মারবে···

পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঠেকে গেছে কামিনীর। গলায় শক্ত হয়ে এঁটে বসছে মোটাসোটা, পুরুষালি হাত দুটো।

ইয়ামো হাঁপাচ্ছে, তার ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। আরো একটা আওয়াজ শুনলো কামিনী।

অস্পষ্ট একটা শব্দ, তীক্ষ্ণ, মিষ্টি সঙ্গীতের মতো···।

বাতাসে শিস কেটে কি যেন ছুটে এলো। স্থির হয়ে গেল ইয়ামোর হাত দুটো। টলছে সে। পরমুহূর্তে বিকট আর্তচিৎকার করে উঠে কামিনীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। কামিনী বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো—ইয়ামোর পিঠে পালক লাগানো একটা তীর গাঁথা রয়েছে। পথের কিনারা দিয়ে নিচে তাকালো সে।

ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোহন। ধনুকটা এখনো তার হাতে।

'বড়দা···বড়দা···!' এখনো বিড়বিড় করছে কামিনী, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি।

ক্ষুদে পাথুরে গুহার বাইরে বসে আছে সে, এখনো তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে মোহন। সরু পথ থেকে মোহন তাকে কিভাবে এখানে নিয়ে এসেছে, তার মনে নেই।

নরম গলায় মোহন বললো, 'হ্যাঁ, ইয়ামো। সেই প্রথম থেকে।'

'কিন্তু কিভাবে? কেন? কি করে তা সম্ভব—তাকেই তো বিষ খাওয়ানো হয়েছিল···প্রায় মারা যেতে বসেছিল সে!'

'না, মারা যাবার কোনো ঝুঁকি তার ছিলো না। কতোটা মদ খেলে বিপদ ঘটবে না, ইয়ামো ভালো করেই জানতো। ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে অল্পই খেয়েছে সে, যাতে সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। যতোটা অসুস্থ হয়েছিল, অসুস্থ হবার ভান করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি। সে জানতো নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখতে হলে এই কৌশলটা কাজে লাগাতে হবে তার।'

'কিন্তু আলাকে তো সে খুন করতে পারে না। তখন সে এতোই দুর্বল যে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতেই পারছিল না···।'

'ওটাও তার একটা ভান ছিলো। তোমার মনে নেই, গুরুদেব মারসু বলেছিলেন, বিষ বের করে নেয়ার পর দ্রুত শক্তি ফিরে পাবে সে? বাস্তবেও তাই পেয়েছিল।'

'কিন্তু কেন, মোহনদা? এটাই আমার মাথায় কোনো মতে ঢুকছে না—কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মোহন। 'তোমার মনে আছে, কামিনী, একবার আমি বলেছিলাম, পচন ভেতর থেকে ধরে?'

'হ্যাঁ, ফলের কথা বলেছিলে তুমি। বাইরে থেকে দেখতে কি সুন্দর, কিন্তু ভেতরে পচন ধরেছে, টের পাওয়া যায় না…।'

'তুমি একদিন বলেছিলে, নফরেত বিপদ হয়ে এসেছে। আসলে সেটা সত্যি ছিলো না। অশুভ শক্তি বাড়ির ভেতরই লুকিয়ে ছিলো, নফরেতের আসার আগে থেকেই। নফরেত আসায় সেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নফরেত একটা উপলক্ষ ছিলো মাত্র, সে আসার সাথে সাথে সবার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে।'

'জানি, জানি—আমি নিজেও ওদের বদলে যেতে দেখেছি। কিন্তু, এই পচন ধরে কেন, মোহনদা? কেন মানুষ হঠাৎ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে?'

কাঁধ ঝাঁকালো মোহন। 'কে বলবে! হতে পারে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। হয়তো সব মানুষের ভেতরই ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ, অভিমান লুকিয়ে থাকে, আর কেউ যদি দয়ালু না হয়, বুদ্ধিমান না হয়, তখন মনের এসব অশুভ শক্তি বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন আর কিছু করার থাকে না।'

'কিন্তু বড়দা তো চিরকাল একই রকম ছিলো, সে তো বদলায়নি…।

'হ্যাঁ, ইয়ামো বদলায়নি। অন্তত চোখে পড়ার মতো বদলায়নি।

সেজন্যেই তাকে আমার সন্দেহ হয়। চিরকাল বাপের বাধ্য ছিলো সে, যে যা বলতো শুনতো। তোমার বাবা তাকে বোকা বলে গাল পাড়তো, নিরবে সহ্য করতো সে। হিমানী তাকে ভেড়া বলে তাচ্ছিল্য করতো, ইয়ামো কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু তারমানে এই নয় যে ইয়ামোর মনে এসবের কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। সব সে চেপে রাখতো। ফলে তার মনে রাগ, ঘৃণা, আর আক্রোশের পাহাড় জমে ওঠে।

'এই সময়, ইয়ামো যখন আশা করছে জমিদারী আর ফসলের ভাগ পাবে সে, নফরেত এসে হাজির হলো। নফরেত এসেই ইয়ামোর আশায় ছাই ঢাললো। শুধু তাই নয়, ইয়ামোর পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করলো সে। সুন্দরী একটা মেয়ে, তার কাছে সে হেরে যাবে? এই চিন্তা উন্মাদ করে তুললো ইয়ামোকে।

'নফরেত তোমার তিন ভাইয়ের পৌরুষেই আঘাত করে। আলাকে বললো অকর্মার ধাড়ি, সোবেককে বললো সুন্দর গাধা, আর ইয়ামোকে বললো মুরদহীন পুরুষ। নফরেত আসার পরই হিমানী প্রকাশ্যে স্বামীকে গালাগালি দিতে শুরু করলো, সীমা ছাড়িয়ে গেল সে। সহ্য করতে না পেরে বিস্ফোরিত হলো এতোদিনের জমে থাকা ঘৃণা আর রাগ, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো ইয়ামো। পাহাড়ী পথে নফরেতের সাথে দেখা হলো তার, ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিলো তাকে।'

'কিন্তু নফরেতকে তো হিমানী ...'

'না, কামিনী, না। ওখানেই তুমি ভুল করেছো। পাহাড়ের নিচ থেকে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে হিমানী। এবার বুঝেছো তো?'

'কিন্তু বড়দা তো তোমার সাথে ক্ষেতে ছিলো ...'

'ছিলো, কিন্তু মাত্র গত এক ঘণ্টা ধরে। তুমি যদি নফরেতের গায়ে হাত দিতে তাহলে বুঝতে লাশ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সবাই ধরে নিলো, নফরেত কিছুক্ষণ আগে পড়ে গেছে। কিন্তু তা অসম্ভব। অন্তত দু'ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছিল সে। গোটা ব্যাপারটা দেখে ফেলে হিমানী। দেখার পর কি করবে বুঝতে না পেরে দিশেহারার মতো ছুটোছুটি করতে থাকে সে, এই সময় তোমাকে আসতে দেখে। তুমি যাতে লাশটা দেখতে না পাও···।'

'এসব তুমি কখন বুঝতে পারো, মোহন দা ?'

'নফরেত মারা যাবার ক'দিন পরই ইয়ামোকে সন্দেহ করতে শুরু করি আমি,' বললো মোহন। 'হিমানীর আচরণই আমাকে সন্দিহান করে তোলে। ওকে দেখেই বোঝা যেতো, কাকে যেন ভয় পাচ্ছে। ওর ওপর লক্ষ্য রাখলাম, বুঝলাম, ভয় পাচ্ছে ইয়ামোকে। স্বামীকে গালমন্দ করা তো দূরের কথা, তাকে খুশি করার জন্যে অস্থির। ইয়ামোকে শান্ত, নম্র, ভালোমানুষ বলে জানতো সে, সেই ইয়ামোকে খুন করতে দেখে তার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়। বেশির ভাগ দজ্জাল বউদের মতো, হিমানীও ছিলো ভীতু প্রকৃতির। সে তার এই নতুন স্বামীকে ভয় পেতে শুরু করলো। ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করলো। ইয়ামো বুঝলো, হিমানী তার জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে···।

'সেদিন হিমানী ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে কি দেখেছিল, তুমি নিজেও এখন বুঝতে পারছো। নফরেতের আত্মাকে নয়, হিমানী দেখেছিল ইয়ামোর চোখে খুনের নেশা। আজ তুমি ঠিক যা দেখেছো। ইয়ামোর চোখের দিকে তাকিয়ে হিমানী বুঝতে পেরেছিল, স্বামী তাকে আজ খুন করবে। সেই ভয়ে পিছুতে গিয়ে পড়ে যায় সে।

মৃত্যুর আগে নফরেতের নাম উচ্চারণ করে হিমানী আসলে বলতে চেয়েছিল নফরেতকে ইয়ামো খুন করেছে।

'হেনেটের অপ্রাসঙ্গিক একটা মন্তব্য থেকে সত্যটা আঁচ করতে পারে দাদী-মা। হেনেট অভিযোগ করে বলে, আমি তার দিকে তাকাই না, তাকাই তার পিছন দিকে, পিছনে যেন কেউ বা কিছু আছে। এরপর হিমানীর প্রসঙ্গে চলে যায় সে। দাদী-মার মনে হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দেয়। হিমানী কিভাবে মারা গেছে, আন্দাজ করতে শুরু করে সে। হিমানী পিছন দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু ইয়ামোর দিকে, নাকি ইয়ামোর পিছন দিকে? সবাই বলাবলি করছিল বটে, নফরেতের আত্মাকে দেখে ভয় পেয়ে পড়ে গেছে হিমানী, কিন্তু দাদী-মা বিকল্পটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। তার ধারণা হলো, হিমানী ইয়ামোর পিছন দিকে নয়, ইয়ামোর দিকেই তাকিয়েছিল। তার এই সন্দেহ সত্যি কিনা পরীক্ষা করার জন্যে সবাইকে ডেকে কিছু কথা বললো সে, মনে আছে তো? সবার মনে হয়েছিল দাদী-মা আবোল-তাবোল বকছে, কিন্তু ইয়ামো বাদে। শুধু ইয়ামোই বুঝেছিল, দাদী-মা তাকে সন্দেহ করছে। দাদী-মার কথা তাকে চমকে দেয়, এক পলকের জন্যে, কিন্তু সেটা ঠিক দেখতে পায় দাদী-মা, বুঝতে পারে তার সন্দেহ মিথ্যে নয়।

'কিন্তু সেই সাথে ইয়ামোও বুঝলো, দাদী-মা তাকে সন্দেহ করছে। আর একবার যখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তখন নিজের পক্ষে যে-সব দেয়াল তুলে রেখেছে সে, সেগুলোর কোনোটাই টিকবে না, ধ্বসে পড়বে। রাখাল ছেলেটার গল্প অবিশ্বাস করা হবে। ইয়ামো আরো বুঝলো...'

'রাখাল ছেলেটা...'

'তার মনিব ছিলো ইয়ামো, ইয়ামোকে দেবতার মতো ভক্তি করতো সে। ইয়ামোর নির্দেশ মতো বানানো গল্পটা আওড়ায়। তারপর মনিবের দেয়া সরবত খায় সরল বিশ্বাসে—জানতো না সরবতে বিষ মেশানো আছে।'

'কিন্তু মোহনদা, এ বিশ্বাস করা কঠিন বড়দা এসবের জন্যে দায়ী। নফরেতকে, হ্যাঁ, বুঝতে পারি। কিন্তু বাকি খুনগুলো কেন?'

'তোমাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো শক্ত, কামিনী। কি জানো, মনে যখন পাপ ঢোকে, ধীরে ধীরে গোটা মনটাই পাপে ভরে যায়। হয়তো সারাটা জীবন ধরেই ভয়ানক কিছু একটা করার ঝোঁক ছিলো ইয়ামোর মধ্যে, কিন্তু শুরু করার সাহসটুকু পায়নি সে। আমার মনে হয়, নফরেতকে খুন করার পর নিজের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা আবিষ্কার করে সে। হিমানীর আচরণ থেকে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে শুরু করে। যে হিমানী তাকে প্রতি কথায় গালমন্দ করতো, সেই হিমানীই তাকে যমের মতো ভয় পেতে শুরু করলো। ইয়ামো দেখলো, সোবেক আর আলা তার প্রতিদ্বন্দ্বী, কাজেই ওদেরকে সরাতে হবে। বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে একা থাকবে সে, বাবার একমাত্র সান্ত্বনা আর নির্ভরতা। হিমানীকে মারার পর খুন করার সত্যিকার আনন্দ বেড়ে গেল তার। সেই সাথে বাড়লো সাহস, সম্পত্তির প্রতি লোভ। নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল সে, সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেল।

'কিন্তু তোমাকে সে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি। আমার বিশ্বাস, তোমাকে সে ভালোবাসতো। কিন্তু হিমানীকে মারার পর তোমার প্রতি তার এই ভালোবাসা কদর্য রূপ নিতে শুরু করে। তোমার সাথে কোহির বিয়ে হোক, এটা সে চায়নি দুটো কারণে। এক, তোমাকে নিয়ে

নতুন স্বপ্ন দেখছিল সে, ভাবছিল সবাইকে সরিয়ে দেয়ার পর তোমাকে বিয়ে করবে। তুই, কোহির সাথে তোমার বিয়ে হলে তোমাদেরকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে। দাদী-মা তোমার সাথে কোহির বিয়েতে সম্ভবত এই জন্যে রাজি হয়েছিল যে এরপর যদি আঘাত হানা হয়, আঘাতটা তোমার ওপর না এসে আসবে কোহির ওপর, অন্তত সেই সম্ভাবনাই বেশি। তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে, এই কথাটা জোর দিয়ে বাবাকে জানায়নি ইয়ামো, তবে জানিয়েছিল। সম্ভবত পরিষ্কার করে কিছু বলেনি সে, আভাস দিয়েছিল। তোমার বাবার ইচ্ছে থাকলেও, ইয়ামোকে বিয়ে করার জন্যে তোমার ওপর চাপ দেয়নি সে। কারণ ইয়ামোও মারা যেতে পারে এই ভেবে বিকল্প পাত্র হিসেবে কোহিকেই তার পছন্দ হয়। দাদী-মার আরেকটা ধারণা ছিলো, কোহির সাথে তোমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ায় ইয়ামো তোমার ওপরও আঘাত হানতে পারে। সে জানতো, তোমার ওপর আমার নজর আছে, তোমার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করলে ইয়ামো আমার চোখে ধরা পড়ে যাবে। আমি জানতাম, সেই একই জায়গা থেকে তোমাকে যদি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার কোনো সুযোগ ইয়ামো পায়, সে সেটা ছাড়বে না।'

'কিন্তু খবর পাঠিয়ে তুমি এলে না কেন?' হঠাৎ জানতে চাইলো কামিনী। 'আমি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ...'

'আমি তো তোমাকে কোনো খবর পাঠাইনি!'

'কিন্তু তাহলে হেনেট...এসবের মধ্যে হেনেটের ভূমিকা এখনো আমার বোধগম্য হলো না।'

'আমার ধারণা আসল ঘটনা জানতে পেরেছে হেনেট,' চিন্তিত-ভাবে বললো মোহন। 'সে যে জানে, এটা সে আজ সকালে ইয়া-

মোকে বুঝতেও দিয়েছে। ইয়ামো এখানে তোমাকে আনাবার কাজে হেনেটকে ব্যবহার করে। কাজটা খুশি মনে করেছে হেনেট, কারণ তোমাকে সে ঘৃণা করে।'

'জানি।'

'হেনেট ভেবেছে এই জ্ঞান তাকে প্রচণ্ড ক্ষমতা এনে দেবে। কিন্তু ইয়ামো তাকে বেশিদিন বাঁচতে দিতো বলে আমার মনে হয় না। জানি না, হয়তো তোমাকে মারার জন্যে এখানে আসার আগে তাকেও··।'

শিউরে উঠলো কামিনী। 'বড়দা পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মোহনদা, চিরকাল সে ওরকম ছিলো না!'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বললো মোহন। 'তবু, সেই ঘটনাটা আজও আমি ভুলিনি। তোমাকে একদিন বলেওছিলাম। আমরা সবাই তখন ছোটো। ইয়ামো সোবেকের চেয়ে এক বছরের বড় হলেও, সোবেকই ছিলো মোটাসোটা, শক্তিশালী। কি এক কারণে ঝগড়া বেধে গেল দু'ভাইয়ে. সোবেক একটা পাথর তুলে নিয়ে ইয়ামোর মাথায় বারবার ঠুকতে লাগলো। তোমার মা ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিলো ওদেরকে। বললো, 'এ খুব ভয়ংকর'। আমার ধারণা, কামিনী, তোমার মা আসলে বলতে চেয়েছিলো, ইয়ামোর সাথে এ-ধরনের ব্যবহার করা ভয়ংকর। পরদিন সোবেক কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল স্মরণ করো। সবার ধারণা হলো, প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সোবেক। আসলে বিষাক্ত খাবার খেয়েছিল। ইয়ামোই তার খাবারে মিশিয়েছিল সেই বিষ···।'

কামিনী শিউরে উঠলো। 'যাকে যেভাবে চিনি কেউ তাহলে সে রকম নয়?'

মোহন হাসলো। 'অল্প দু'একজন। যেমন, কোহি। যেমন, আমি। আমরা দু'জনেই, কামিনী, তুমি যা বিশ্বাস করো, তাই। কোহি আর আমি…।'

শেষ শব্দটা অর্থপূর্ণভাবে উচ্চারণ করলো মোহন, এবং হঠাৎ করে কামিনী উপলব্ধি করলো এই মুহূর্তে তাকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মোহন আবার বললো, 'আমরা, কামিনী, দু'জনেই তোমাকে ভালোবাসি। এটা তোমাকে বুঝতে হবে।'

'অথচ…' ধীরে ধীরে, ফিসফিস করে বললো কামিনী, 'কোহির সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে জেনেও তুমি বাধা দাওনি, আভাসেও জানাওনি।'

'সেটা তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে, কামিনী। দাদী-মাও আমার এই বুদ্ধিটায় সায় দিয়েছিল। তোমার ব্যাপারে নির্লিপ্ত, নির্লোভ থাকতে হবে আমাকে, তবেই ইয়ামোর দৃষ্টি নিজের ওপর থেকে সরাতে পারবো, আর শুধু তখনই তোমার ওপর নজর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। তোমাকে বিয়ে করতে চাইলেই ইয়ামো আমাকে শত্রু বলে মনে করতো।' একটু থেমে আবেগভরা গলায় আবার বললো মোহন, 'তুমি তো জানোই, কামিনী, ইয়ামো আমার অনেক বছরের পুরানো বন্ধু ছিলো। তাকে আমি ভালোবাসতাম। তোমার বাবাকে বলে রাজি করাবার চেষ্টা করি ইয়ামোকে যাতে খানিকটা কর্তৃত্ব আর অংশ দেয়া হয়, কিন্তু ব্যর্থ হই। শেষ পর্যন্ত সে-ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মনে মনে জানতাম, নফরেতকে ইয়ামোই খুন করেছে, তবু, ঘটনাটা অবিশ্বাস করার চেষ্টা করি আমি। এমন কি ইয়ামো যা করেছে

ভালো করেছে, এক-আধবার তাও ভেবেছি। আমার অসুখী বন্ধু ইয়ামো, তাকে আমি সত্যি ভালোবাসতাম। তারপর মারা গেল হিমানী, আলা, এশা—বুঝলাম, ইয়ামোর মধ্যে ভালো যা কিছু ছিলো তার সবই উধাও হয়েছে। দেখো, ভাগ্যের কি পরিহাস, বন্ধুর হাতে প্রাণ দিতে হলো ইয়ামোকে। আমার সান্ত্বনা এইটুকুই যে ভুগতে হয়নি তাকে। প্রায় সাথে সাথে মারা গেছে সে।'

'মৃত্যু, শুধু মৃত্যু!'

'না, কামিনী। আজ তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াওনি, দাঁড়িয়ে আছো জীবনের মুখোমুখি। সেই জীবন কার সাথে তুমি ভাগ করে নেবে? আমার সাথে, নাকি কোহির সাথে?'

সোজা তাকালো কামিনী, উপত্যকার ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল রূপালি নদীর ওপর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুদর্শন, হাসি খুশি কোহির চেহারা।

খোশমেজাজী যুবক কোহি, শক্ত-সমর্থ। তার কথা ভাবতেই আজ আবার কামিনীর শরীরে নেচে উঠলো রক্ত, রোমাঞ্চিত হলো প্রতি অঙ্গ। সে শরীর দিয়ে অনুভব করে, কোহিকে তার দরকার। কোহিই পারে কাসিনের অভাব পূরণ করতে।

সে ভাবলো, কোহি আর আমি সুখী হতে পারবো। আমাদের ছেলেমেয়েরা হবে স্বাস্থ্যবান। কোহি আমাকে নৌকো করে নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কাসিনের সাথে যেমন সুখে দিন কাটাচ্ছিলাম, কোহির সাথেও সেভাবে সুখে দিন কাটাবো। এর বেশি কি দরকার আমার? আর কি আশা করতে পারি?

ধীরে ধীরে, খুবই মন্থর ভঙ্গিতে, মোহনের দিকে ফিরলো সে। তাকালো। ভাবটা যেন, নিঃশব্দে একটা প্রশ্ন করছে সে।

প্রশ্নটা কি, মোহন যেন বুঝতে পারলো। সে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'সেই ছোটোবেলা থেকে, তুমি যখন খালি গায়ে তোমাদের উঠনে খেলা করতে, তখন থেকে তোমাকে আমি ভালোবেসেছি, কামিনী। তোমার গম্ভীর ভাব-ভঙ্গি আমার ভালো লাগতো, ভালো লাগতো যে আত্মবিশ্বাস আর দাবি নিয়ে আমার কাছে এসে বলতে, খেলনাটা মেরামত করে দাও। তারপর, আট বছর পর, আবার তুমি ফিরে এলে। এখানে এসে, আমার পাশে বসলে আবার, আমি আবার পুরনো চিন্তায় ফিরে গেলাম। তোমার মন, কামিনী, ফুলের মতো কোমল—তাতে কোনো আঘাত লাগে তা আমি চাই না। তুমি অন্য রকম, তোমার পরিবারের আর কারো মতো নও। তোমার সুখেই আমার সুখ, এ-কথা আমি অন্তর থেকে বলছি। কোহিকে বিয়ে করে তুমি যদি সুখী হবে বলে মনে করো, আমি তাতে বাদ সাধবো না। কিন্তু বিয়ের পরও মনে রেখো, তোমার একজন বন্ধু আছে এখানে, আপদে-বিপদে, সুখে-দুখে তার সাহায্য চাইতে দ্বিধা করো না।'

'কিন্তু মোহনদা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…,' ঝট্ করে মোহনের দিকে ফিরলো কামিনী। 'তুমিই আমাকে বলে দাও, কি করা উচিত আমার।'

'তা হয় না, কামিনী,' বিষণ্ণ একটু হাসলো মোহন। 'তোমার জীবন নিয়ে তুমি কি করবে, আমি সেটা বলে দিতে পারি না। সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।'

হঠাৎ করে বুঝলো কামিনী, তার সামনে দুটো পথ আছে। একটা কঠিন, আরেকটা সহজ। মোহনদার সাথে সংসার করলে জীবন হবে সহজ সরল, কোনো জটিলতা থাকবে না। কোহির সাথে সংসার পাতলে জীবন হবে রোমাঞ্চকর, কিন্তু কিছু জটিলতা থাকবে। সুন্দরী

মেয়েদের প্রতি কোহি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তার মিষ্টি গানে আকৃষ্ট হতে পারে অনেক মেয়ে। কিন্তু মোহনদা কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মানুষ নয়। মোহনদার সান্নিধ্যের মধ্যে নিরাপত্তা আছে, আছে প্রশান্তি।

মোহনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশ্চর্য হয়ে ভাবলো কামিনী, আমি যে কি, কোনো দিন ভালো করে লক্ষ্যও করিনি মোহনদা দেখতে কেমন। লক্ষ্য করার আসলে কোনো দরকার পড়েনি···

ফিক্ করে হেসে ফেললো কামিনী। বললো, 'সেই ছোটোবেলা থেকে দেখছি তোমাকে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আমি যেন ভালো করে চিনি না—মানে কিছু কিছু ব্যাপারে তুমি কি ভাবো না ভাবো একদম কিচ্ছু জানি না।'

'কি জানতে চাও বলো?' মৃদু হাসলো মোহন, যেন বাচ্চা একটা মেয়েকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

'তোমার বয়স কতো, মোহনদা?'

'ইয়ামোর চেয়ে চার মাসের বড় আমি।'

'তোমার আয়-রোজগার?'

'লেখক হিসেবে তোমার বাপের কাছ থেকে যা পাই, অন্য কোথাও গিয়ে তার তিনগুণ পেতে পারি,' বললো মোহন। 'আর আমার বাবা জমিদার, আমি তার একমাত্র ছেলে।'

'তুমি বেড়াতে ভালোবাসো, মোহনদা?' কামিনীর চোখে কৌতুক আর আগ্রহ।

'চারভাগের এক ভাগ মিশর আমার দেখা আছে, বাকি তিন ভাগও দেখবো বলে আশা রাখি।'

'আচ্ছা, এতোদিন তুমি বিয়ে করোনি কেন বলো তো?'

সাথে সাথে জবাব দিলো মোহন, 'কোনো মেয়েকে ভালো লাগেনি, তাই। যাকে ভালো লেগেছে তাকে যদি না পাই, বিয়ে করবো না। কোনোদিন না।'

'ছেলেমেয়ে পছন্দ করো তুমি, মোহনদা?'

'ছোট্ট কামিনীর কথা স্মরণ করো,' হেসে উঠে বললো মোহন। 'তাকে আমি আদর করতাম না? তার খেলনা মেরামত করে দিতাম না? তাকে কোলে নিয়ে এই পাহাড়ে উঠিনি?'

'বিয়ে যদি হয়, ক'টা বাচ্চা চাইবে তুমি?'

'অনেক, অ-নে-ক, বাড়ি ভর্তি।'

'আমিও,' ফিসফিস করে বললো কামিনী, 'অনেক বাচ্চা চাই। স্বাস্থ্যবান, নাদুসনুদুস, মোটাসোটা বাচ্চা। আমার তানির সাথে খেলবে তারা। তোমার আর আমার বাচ্চা, আমার তানি—ওদেরকে আমরা···।

'মানুষ করবো,' কামিনীর কথাটা মোহনই শেষ করলো।

মোহনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো কামিনী, 'মোহন, আমাকে ধরো। তুমি আর আমি···।'

'শান্তিতে সংসার করবো।' কামিনীর হাতটা ধরলো মোহন। তার চেহারা উদ্ভাসিত, চোখে পরিতৃপ্তির হাসি।

[শেষ]